উৎসর্গ

কাশীর ছোটদি,—
শ্রীযুক্তা হরিবালা দেবী
ও কাশীর দিদিমা,—
শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবী-র
যুগলকরকমলে—

এই লেখকের :

চিত্র ও বিচিত্র
ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে
তারা তিন জন
নব বৃন্দাবন
অদ্য ও প্রত্যহ
জীবন রঙ্গ
হ-রে-ক-র-ক-ম-বা
এলেবেলে
অপাঠ্য
আসামী কারা
বসন্ত কেবিন
একটি অশ্রু, দুটি রাত্রি ও কয়েকটি গোলাপ
ননী গোপালের বিয়ে
ননী গোপালের বিয়ের পর
দ্বিতীয় প্রেম

একাশী বছরে পা দেবার আগে কাশীতে পদার্পণ করব না যারা বলে তারাই পাথরের অক্ষরে খোদিত মানুষের মহত্তম প্রেমের কবিতা তাজমহল দেখবার জন্যে পূর্ণিমার প্রতীক্ষা করে। এই সব লোকেদেরই ধারণা তীর্থ করবার বয়স, ধর্ম করবার বয়স, পরকালের কথা চিন্তা করবার বয়স যথেষ্ট বয়স না হওয়া পর্যন্ত বুঝতে হবে কারুর হয় না। এদেরই কেউ কেউ দাঁত পড়ে গেলে নিদারুণ ভক্ত হয় নিরামিষের; অহিংসাই যে পরম ধর্ম বুঝতে সক্ষম হয় অচিরাৎ। অনেক লোকের তো বটেই; আরও অনেক বেশী অনেক স্ত্রীলোকেরও এই ফাণি আইডিয়া কিছুতেই যাবার নয় যে, অল্প বয়স হচ্ছে শাড়ি, গাড়ি আর গয়নার; কিন্তু প্রৌঢ়ত্ব পৌঁছনর অব্যবহিত পরই অতঃপর সকলেরই পরকাল সম্পর্কে দরকার অবহিত হবার। এই মহৎ ইচ্ছার তলা দিয়ে যে পাঁকের ময়লার আর অস্বাস্থ্যের স্রোতস্বতী বয়ে যায় তা হচ্ছে যৌবনে ফুর্তি করার দাম দাও বয়স হলে পরলোকের চিন্তায় মন দিয়ে। অর্থাৎ কালোবাজার, ভেজাল অথবা অপকর্ম হোক যত গুরুভার তীর্থে তীর্থে তৈরী করো ধর্মশালা যাতে মরবার আগেই যুধিষ্ঠিরের পর দ্বিতীয় বার সশরীরে স্বর্গে যাবার পথ আটকাতে না পারে নিজের কিম্বা অপরের বড় অথবা ছোট সম্বন্ধী।

কিন্তু অধর্মেরই বয়স হয়; ধর্মের কোনও বয়স নেই। ইহকালের কথা না ভাবলেও চলে; পরকালের কথা না ভাবলেই মানুষ অচল। আগামীকালের কথা সে ভাবতে পারেনি গতকাল সেই কেবল তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে মানুষের স্বখাত সলিলে ডুবে মরার আণবিক অস্ত্র; দানবিক অহঙ্কার। নরলোকে যা করবে পরলোকে তার জবাব দিতে হবে একথা ভাবতে না পারলেই আর ইহকাল নেই; পরকালও গেছে। পরলোক বলে যদি কিছু নাও থাকে, ইহলোক বলেও তবে

যার কিছু থাকে না আর তারই নাম মানুষ। এবং এই একমাত্র বিশ্বাস ; এই একমাত্র ধর্ম ; এই সেই একমাত্র সত্য যা মানুষকে দানবের চেয়ে নরম এবং দেবতার চেয়ে কঠিন করে গড়েছে ; তাকে দিয়েছে মনুষ্যত্ব। আগামীকালও সূর্য উঠবে,—একথা আজ নিশ্চিত বলা তর্কের দৃষ্টিতে বেঠিক ; তবু এর চেয়ে সঠিক, এর চেয়ে সুনিশ্চিত প্রত্যয় আর কিছু মানুষের আছে ? যদি এ বিশ্বাসের সূর্য-মুখ মুহূর্তের জন্যে সংশয়ের মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে দেখা না দিত আবার দ্বিগুণ দীপ্তিতে তাহলে কে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারত বরিষণ মুখরিত শ্রাবণ-রাত্রে ? যদি মেঘই সত্য হতো আর সূর্য হতো অসত্য; যদি অবিশ্বাস না হতো অলীক আর প্রত্যয় সুদৃঢ় ; যদি মানুষের পায়ের তলায় কঠিন মৃত্তিকা মুহূর্তে না সরে যেত মাথার ওপর অভাব হলে নিরুপম নীলের ; যদি আজকের 'কাল'-টাই কেবল একমাত্র কাল হতো,—গত এবং আগামীকালের সঙ্গে তার যোগ হতো বিচ্ছিন্ন তাহলে হয় হত্যায় নয় আত্মহত্যায় উন্মত্ত হত বিশ্বলোক। অবিশ্বাসে নয় ; আশ্বাসে। প্রমাণে নয়; প্রত্যয়ে। মৃত্যুতে নয় মৃত্যুঞ্জয়েই জীবনের জয়। অবিশ্বাসে যা হতো বিষলোক, বিশ্বাসে তাই হয়েছে ত্রিভুবনের বিস্ময়লোক,— মানুষের আবাসভূমি এই বিশ্বলোক অবিশ্বাসে যা হতে পারত বিষলোক, বিশ্বাসে তাই হয়েছে চিরকালের ত্রিভুবনের বিস্ময় লোক।

উজীরবাদ ; পুঁজিবাদ ; গণবাদ ; সাম্যবাদ নয় ; বাদ দিতে দিতে বরবাদ কোর না মানুষকেই। বাদ দেবে কেন ? যোগ কর। কর্মযোগ ; জ্ঞানযোগ ; রাজযোগ ; ভক্তিযোগ। যোগ করো ; তবেই যোগ্য হবে। ইহকালের ধনুতে পরকালের যোগ কর শর ; মানবীয় তনুতে সংযোগ কর ঈশ্বর এবং উদ্‌যোগ করো বয়স থাকতে থাকতেই। সকাল থেকেই সলতে পাকাও সন্ধ্যাকালের আলো জ্বালাতে। 'নিত্যকালের উৎসবলোকে বিশ্বের দীপালিকা' তেল থাকতে থাকতেই দীপ্ত হও ; উদ্দীপ্ত করো।

খুব অল্পবয়সে হাত দেখে বলেছিলো এক জাতকের এক গণৎকার, জাতকের ঈর্ষাযোগ্য মৃত্যু হবে কাশীতে ; এবং মৃত্যুর পর সেই হেতু

'কূপে' মিলবে শিবলোকের ট্রেণে ; বার বার জন্মের অন্ধকূপে মরতে হবে না পচে। শুনে পরম নিশ্চিন্ত সেই জাতক অনুতাপহীন পাপের পর পাপ করতে করতে ভ্রূণহত্যার দায়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে মৃত্যুর বাসরে ডেকে পাঠাল সেই গণককে শেষ ইচ্ছা পূরণের সুযোগে ; গণক-ঠাকুর জাতকের মেসোমশাই ছিলেন সম্পর্কে। তাকে দেখে স্বাগত জানালো ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গানে উদ্যত সেই বজ্জাতক : মেসো, তুমিই আমার ফাঁসীর কারণ! তুমি বলেছিলে আমার মৃত্যু কাশীতে ;—সেই ভরসায় যা ইচ্ছে তাই করতে করতে যা ইচ্ছে ছিল না আমার কখনও তাই করে ফেলে এখন লটকাতে চলেছি ফাঁসীতে ; —তুমি কি এখনও আমার মৃত্যু কাশীতেই বলতে চাও ?

মেসো ঠাকুর বলেন : বাবা, ত্রিভুবন,—তোমার হাত ঠিকই দেখেছিলাম ; তোমার মৃত্যু কাশীতেই ছিলো। কিন্তু এত দুষ্কর্ম করলে বাপ আমার ইতিমধ্যে যে 'ক' এর মুখ ফাঁক হয়ে 'ফ' হয়ে যাওয়ায় কাশীর বদলে ফাঁসীতে মারা যেতে হচ্ছে তোমায়, আমি কি করব বলো ?

আমরাই বা কি করতে পারি তাদের জন্যে—যারা একাশী বছর বয়স হলে তবেই কাশী যায় মরতে। কাশীতে মৃত্যু হলেও তারা যে কাশীতে মারা যাবার আগেই, অনেক আগেই মারা যায় সর্দি, কাশি, বাত, পিত্ত, অম্লশূলে,—একথা বোঝায় কে ? এই কাশীতে যে মরতে চেয়েছে চিরকাল ; একবার মরে বেঁচে যেতে চিরকালের মতো সেই হচ্ছে হিন্দু ; কিন্তু কাশীতেই বেঁচে আছে যা কেবল—জগতের সব চেয়ে বড়ো, সব চেয়ে উদার, মানুষের সব চেয়ে মহৎ সেই ধর্মের নাম হিন্দুধর্ম।

এখনও পর্যন্ত বেঁচে আছে ; কিন্তু আর থাকবে না। হিন্দুধর্মের মৃত্যু হবে ; এবং তার শবের ওপর বসে যার উৎসব হবে তা হচ্ছে হিন্দীর অধর্ম। কাশীর চতুষ্পাঠীতে হিন্দুর ছেলে সংস্কৃত পড়বে না আর। বেনারসে বসে তার বদলে হাই স্কুলে, দশরথের চার ছেলের হিন্দী বলবে : দশরথ কি চৌবাচ্চা। হিন্দু বলতেই এখন আমরা

লজ্জা পাই। হিন্দী বলতে নয়। হিন্দুস্থান হিন্দীস্থান হবার আগেই, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহত মানুষ হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান কাশীর গান গাই ; একাশীর কোঠায় পা দেবার আগেই জয়গান করি এ কাশীর যেখানে ঃ

'আত্মার সাথে হ'বে আত্মার নবীন আত্মীয়তা,
মিলনীধর্মী মানুষ মিলিবে ; নহে এ স্বপ্নকথা।'

আত্মার সাথে আত্মার মিলন অবশ্য যেখানেই হোক ভারতবর্ষে আর তা হবার আশা তামাশা মাত্র ; কারণ সিকুলার ষ্টেট স্বাধীন ভারত মাত্র মুখে ; ভেতরে তার পিকুল্যার ষ্টেট। স্বাধীন ভারতে সেখানে হিন্দু বললেই জাত যায় ; হিন্দী বললেই বজ্জাত পায় অর্ধেক রাজত্ব, পায় রাজকন্যা সেখানে হিন্দুর আত্মা খাঁচা ছাড়া হবার আগেই রেখে যাই কাশীখণ্ড নয় ; কাশী অখণ্ড।

কাশীর ইতিবৃত্ত। কাশীর যৎকিঞ্চিৎ নয় ; কাশীর যথাসর্বস্ব। বরুণা থেকে অসি ; গঙ্গা যেখানে উত্তরবাহিনী সেই বারাণসী ; যৌবনের বরুণা থেকে জীবনের অসি পর্যন্ত মানুষের সমস্ত প্রশ্নের উত্তরবাহী যেখানে প্রাণগঙ্গা সেই পুণ্যভূমি কাশী,—পৃথিবীর প্রণাত গ্রহণ কর আজ।

কাশী কেবল বিশ্বনাথের নয় ; বিশ্বের যতেক অনাথ, দুনিয়ায় কোথাও যাদের জায়গা নেই তারাও স্থান পেয়েছে বিশ্বনাথের বিশ্ব-বহির্ভূত এই আবাসভূমিতে। কাশী কেবল ধর্মের নয়, অধর্মেরও। এখানে যত ধর্মের ষণ্ড তত অধর্মের পাষণ্ড ঃ এখানে যত সাধু তত অসাধু। যত পাণ্ডা তত দালাল। কাশীর অসংখ্য গলিতে পাপের সঙ্গে পুণ্যের অনাদিকাল থেকে আশ্চর্য গলাগলি নয় ভিন্ন হবার ; কিছুতেই নয় বিচ্ছিন্ন হবার। কিন্তু গঙ্গার ঘাট নয় ; নয় বিশ্বনাথের মন্দির। হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি নয়,নয় মণিকর্ণিকার মহাশ্মশান ! তৈলঙ্গের সাড়ে চার হাত বিশালকায় মূর্তি নয় ; নয় বেনারাস হিন্দু য়ুনিভার্সিটি। সারনাথের শান্ত পরিবেশ নয় ; নয় ক্যাণ্টনমেণ্টের মেক-আপ করা মুখ। কাশীর প্রাণের পরিচয় লক্ষকোটি মানুষের স্মরণাতীত কাল

থেকে পায়ে চলার এই গলিতেই শুধু সম্ভব। রূপকথার কাহিনীতে রাক্ষসের প্রাণ রক্ষিত হয় দুর্গম অরণ্যের দুর্লভ বৃক্ষকোটরে; সিন্ধুর অতলে আত্মগোপন করে আছে যে অদৃশ্য মাছ তারই পেটে থাকে রাক্ষসের মারণাস্ত্র; আর নয় জনশূন্য পাহাড়ের চূড়ায় বহু যুগের ওপার থেকে ক্বচিৎ উড়ে আসে যে নীলপাখী সুদীর্ঘ ব্যবধানে মাত্র একবার তারই বুকের পাঁজরে ধুকপুক করে দৈত্যের হৃৎপিণ্ড। কাশীর অপরূপ কথাও আর কোথাও নেই; তাও আছে, যদি কোথাও থাকে, কাশীর এই গলিতেই। গলির শেষ নেই; বিশ্বনাথের ভূমির বিস্ময়ও অশেষ।

বিশ্বনাথের গলিতেই নয় কাশীর চরম বিস্ময়। তার চেয়েও অন্ধকার, তার চেয়েও শীর্ণকায় এক গলিতে দেখেছি সেই পরমাশ্চর্যকে। তাঁকে দেখতেই আমার বার বার কাশী যাওয়া। বিশ্বনাথকে প্রণাম করলে অক্ষয় পুণ্য হয় কি না জানি না; গঙ্গার জলে একবার অবগাহন করলেই অঙ্গচ্যুত হয় কিনা পাপের স্পর্শ বলা শক্ত; কিন্তু কাশীর গলিতে যাঁকে দেখা মাত্রই পবিত্র হয় দেহ-মন তিনিই কাশীর দিদিমা। সত্তরের কাছে বয়স সারা কাশীর এই একমাত্র দিদিমার। ধনুকের মতো বেঁকে গেছে পিঠ, চোখ প্রায় অন্ধ। অর্থই যদি মানুষের একমাত্র সহায় হয় তাহলে নিদারুণ নিঃসহায় আমার এই কাশীর দিদিমা, প্রতিপত্তি যদি সাজ্মাতিক সম্বল হয় আজ মানুষের তাহলেও কাশীর দিদিমা নিঃসম্বল ছাড়া নন কিছু। তবু অর্থের ওপর নিশ্চয়ই আছে আরও কিছু নির্ভর, নাহলে কেন তবে নিশ্চিন্ত সন্ধ্যাকাশের মতো শান্ত প্রশান্ত সেই আনন? কেন তবে সেই দুই চোখে ধ্রুবতারার মতো দীপ্তি, হাসিতে কেন মানুষের প্রতি অর্থহীন বিশ্বাস বিচ্ছুরিত।

লোকে যখন বলে বুড়ো বয়সে অর্থ-সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় কারুর বেঁচে থাকার কোনও অর্থ হয় না, তখনই আমার সামনে এসে দাঁড়ান কাশীর দিদিমা। বলতে ইচ্ছে করে, দেখে আয় একবার আমার কাশীর দিদিমাকে। অর্থ, সম্বল, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা, লোকমান কত ছোট কত কেঁচো হয়ে যায় চরিত্রের, হৃদয়ের, ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্য্যের কাছে। যৌবনের গ্ল্যামার আর ম্যাক্সফ্যাক্টরের মেক-আপ; নাইলনের শাড়ি,

হ্যামিলটনের গয়না, লেটেষ্ট মডেল স্ট্রিমলাইণ্ড বাতাস-নিয়ন্ত্রিত গাড়ী কেমন লজ্জায় মুখ ঢাকে সেই কোমর পড়ে যাওয়া, কাশীর দরজায় উপস্থিত, দরিদ্র হৃতসর্বস্ব, নিঃসঙ্গ মানুষটার সামনে; তাদের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে অন্তঃসারশূন্য সমস্ত বাহ্যাড়ম্বর। লোকে যখন বলে যৌবনের মতো কাল নেই তখন আমার সামনে এসে দাঁড়ান কাশীর দিদিমা। সন্ধ্যেবেলার আকাশের পাটে বসা সূর্যের শান্ত রক্তিমাভা ছড়িয়ে গেছে সুগৌর আননে। মোহমুক্তির পরমাশ্চর্য উজ্জ্বল চোখের নীলমণি; আর সেই সঙ্গেই এক সঙ্গেই আবার ভুল করেছে সারা জীবনে, গিঁট পাকিয়ে ফেলেছে চলার গ্রন্থিতে, পায়ে পায়ে আটকে পড়ে গেছে পেছনে, ছিটকে গেছে সে দলছাড়া গোত্রছেঁড়া, নামহীন, পরিচয়হীন অন্ধকারের অতলে, সেই পতিত জীবনযাত্রীদের প্রতি সীমাহীন সহানুভূতিতে সজল দুচোখের কোণে চিকচিক করছে সব ভোলার সমস্ত ক্ষমা করার অপার করুণা।

যৌবন যে মানুষের একমাত্র সুসময় তার মতো হতভাগ্য আর কে? প্রথম দিনের সূর্য, প্রভাতের প্রথম সূর্য, মধ্যদিনের প্রজ্জ্বলন্ত দিবাকরে উত্তর নেই সত্তার প্রথম আবির্ভাবে সেই প্রশ্নের, কে তুমি? দিবসের শেষ সূর্যেও হয়ত তার জবাব নেই; কিন্তু সেখানে আছে।

‘আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য,—আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হোলো।
দেবলোক থেকে মানবলোকে
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

মানুষের যৌবন দেবতার বর; কিন্তু মানুষের দীর্ঘজীবন জীবন-দেবতার আশীর্বাদ।

সমাজে যারা অনর্থক বড় তাদের অকারণে আরও বড় করবার দুর্মানসে লোকে তো বটেই স্ত্রীলোকেও অশীতিপর বৃদ্ধাকে চিরতরুণ তৈরী করে। আমাদের ধারণায় তারুণ্যেরই কেবল গরিমা আছে; এমন ভাবার কারণ বার্দ্ধক্যের মহিমা আমরা জানি না তাই। আশীর ওপর যার বয়স তখনও যদি তাকে তরুণ বলতে হয় তাহলে তার চেয়ে তরুণ আর অবস্থা কার? আশীতেও যে প্রবীণ নয় দীর্ঘজীবন তার পক্ষে নয় আশীর্বাদ। যৌবনের আছে ভার; যৌবনের কেবল জ্বালা। বার্দ্ধক্যের আছে প্রশান্তি; বার্দ্ধক্যের রয়েছে নির্লিপ্ততা। যৌবনের কেবল রূপ; বার্দ্ধক্য অপরূপ। যৌবনের ভুল বার্দ্ধক্যে না পৌঁছতে পারলে ফুটে ওঠে না ফুল হয়ে; যে ফুলের চেয়ে অনেক বিউটিফুল আমার কাশীর দিদিমা। দিনের প্রান্তে পোঁছে তবেই পূর্ণের, সম্পূর্ণের পদপরশ পড়েছে যার ওপর তা কেবল অসাধারণ যৌবনের নয়; তা জীবনের ধন।

আরেক দল আছেন যাঁরা, এই প্রসঙ্গেই তাঁদের বক্তব্য উত্থাপন-যোগ্য, আবার বলেন একদম জানান না দিয়ে মরার মতো শান্তি আর নেই। ঘুমের মধ্যেই, অথবা শরীরটা একটু খারাপ লাগছে বলার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সটকে পড়াব মতো মধুর মৃত্যু হতে পারে না আর কিছুই। কথাটা অশীতিপরকে চিরতরুণ বলার মতোই নিছক অবিমৃষ্যকারিতা ছাড়া আর কি? এই কথা যখন কেউ বলে তখন আমার সামনে এসে দাঁড়ান, ধনুকের মতো বেঁকা পিঠ, প্রায় অন্ধ চোখ এবং সত্তর থেকে ততদূরে আশী থেকে যত কাছে, কাশীর দিদিমা। নির্বান্ধব দৈত্যপুরীতে, অর্থ, সামর্থ্য, সহায়, সম্বল, প্রতিপত্তিহীন লোকমানবিহীন সেই বৃদ্ধার জীবনের পথ, দিনের প্রান্তে এসে নিশীথের পানে গহনে হারাবার আগের উচ্চারণ করছে:

'ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
একূল হইতে নব জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।'

এ কেবল রবীন্দ্রনাথের কবিতা নয় ; মানব-জীবনের মর্মবাণী।

মানুষের মুখে এই কবিতা মুদ্রিত হয় না সহজে। জীবনে অনেক দুঃখ না পেলে, অনেক জীবনের দুঃখ এক জীবনে বহন করবার দুর্যোগ ঘনঘোর করে না এলে দিবসের শেষ সন্ধ্যায় কেউ যোগ্য হয় না সেই গৌরবের, সেই গর্বের ;—বীরের যে গৌরব, যে গর্ব তাকে মহৎ জীবনের দেয় অক্ষয় অধিকার। যৌবনের সুখ চাই, কিন্তু বয়স হলে অসুখ চাই না, একথা কেবল তারাই বলতে পারে সমুদ্রে ঝড় উঠলে যারা সব চেয়ে আগে পরিত্যাগ করে ফুটো জাহাজের অনিরাপদ আশ্রয় ; সকলের আগে। তারা পুরুষ নয় কোনওকালে, তারা চিরকাল কাপুরুষ। যে কেবল ভোগের আনন্দ জানলো, দুর্ভোগের উত্তেজনায় হল না রোমাঞ্চিত ; যে কেবল যোগের আসনে বসে মনে করলে ঈশ্বর আছেন শুধু ঠাকুরঘরে, দুর্যোগের দুঃশাসনে দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরে টান দিলে দুহাত তুলে যে না হলো পূর্ণ নির্ভর যতক্ষণ না দেখা দিল শঙ্খচক্রগদাপদ্মবিভূষণ ততক্ষণ ঈর্ষার যোগ্য নয় তার মানবজন্ম। সে হতভাগ্য জানে না, দুঃখের বরষায় চক্ষের জল না নামলে বক্ষের দরজায় থামে না বন্ধুর রথ।

তাই কাশী নয় কেবল ; কাশীর দিদিমার কাছে চলো। যৌবনে রাজার দুলালী ছিলেন তিনি ; দেখতে কেমন ছিলেন জানি না। তবে যত ডাকসাইটে রূপই তাঁর থাকুক সেদিন আজকের মতো এমন অপরূপ ছিলেন না জানি। শুনেছি বিরাট জমিদার রাতারাতি বিবাহ করে নিয়ে যান দিদিমাকে ; তাঁর বয়স তখন বারো। জমিদার নিজের বাড়ী গিয়ে বলেছিলেন স্বজনপরিবারকে ; এবার মৃগয়ায় বেরিয়ে কি এনেছি দেখো। দেখবারই মতো বটে ; হাঁ করে চেয়ে দেখবার মতো। মৃগের চেয়ে মানুষের চোখ কত বেশী কত সুন্দর মৃগনয়ন হতে পারে কাশীর দিদিমার প্রায় অন্ধ হয়ে আসা চোখেও আজও এই মুহূর্তেও তা পড়তে পারা যায় জীবনের অন্তিম প্রদোষ আলোকে যখন চোখ তোলেন তিনি নীরব জিজ্ঞাসায় কে এলি বাপ আমার ? বোস বাবা, ঠাণ্ডা হ ; হ্যারে ঘরে যে আজ দেবার মতো নেই কিছু—

বলতে ইচ্ছে করে জড়িয়ে ধরে সেই পড়ে যাওয়া কোমর :—তোমার ছাড়া আর কার আছে দিয়ে না ফুরোবার এমন সমুদ্র হৃদয়।

এই কাশীর দিদিমার আজ কিছুই নেই; আজ কেউ নেই। ছেলেরা বাইরে চাকরি করে। একমাত্র মেয়ের বাস সুদূর বোম্বাই শহরে; পতিগৃহে। একমাত্র ভাই সত্ত পরলোকগত। তবু যদি আশা দেবার কারণে কেউ বলে কখনও, দিদিমা, আপনাকে দেখবার মতো আরেকজন কেউ হলে ভালো হত, না? দিদিমা হাসেন; অন্তরের অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসে অদৃষ্টকে অস্বীকার করা মেঘমুক্ত দিনে আকাশের প্রসন্ন বন্ধুর হাসি : হলে ভালো; না হলে আরও ভালো।

নীলোৎপলনয়ন দেবীর পায়ে রেখেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র; নিঃস্বার্থ ছিলো না সেই প্রণাম কিন্তু; ছিলো সীতা উদ্ধারের সাহায্য প্রার্থনা। দেবী বলেছিলেন তথাস্তু। সীতা উদ্ধার হয়েও কিন্তু হয়নি রাজরমণী; মাটির তনয়া আর কারুর তো নয়; মাটির বুকেই ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁকে দেবী দুর্গা।

মহিষাসুর প্রার্থনা করেছিলো : ত্রিভুবনে দেব-দানব মানব কারুর কাছে তার হবে না হার;—সে প্রার্থনাও পূরণ হতে দেরী হয়নি; দেবীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল তার বিনাশের কারণে; মহিষের প্রিয়া হয়েছিলো দেবীর গলার হার।

মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে ৺চণ্ডীর স্তবে : রূপং দেহি; জয়ং দেহি। মহাচণ্ডী রূপ দিয়েছেন; জয়দান করেছেন; যশোদান করেছেন; শত্রুকে দিয়েছেন পরাজয়। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন মারণাস্ত্র; সে অস্ত্রে সে নিজের মৃত্যুর আয়োজনকেই শান দিয়েছে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু এ প্রার্থনা পৌঁছেচে কখনও মর্তলোক থেকে অমর্ত্যলোকে : হলে ভালো; না হলে আরও ভালো।

হলে ভালো; এ পর্যন্ত শোনা অথবা না শোনা দাতার ওপর

নির্ভর করে। কিন্তু না হলেও যার সমান ভালো তার মন্দ করে এমন কে আছে ত্রিভুবনে?

এই কাশীতে গেছি যতবার ততবার কাশীনাথের আগে; সর্বাগ্রে দৌড়েছি কাশীর দিদিমার কাছে। আর প্রত্যেকবার শুনেছি তাঁর মুখে তাঁর একটি মাত্র বলবার, বার বার বলে না ফুরোবার সেই অর্ধ-কালীর কাহিনী। কাশীর দিদিমারই বংশে একাদশ পুরুষ আগে এসেছিলেন অর্ধেক মানবী অর্ধেক ঈশ্বরী পরমাশ্চর্য এক নারী। তাঁর কথা বলতে কাশীর দিদিমার ক্লান্তি নেই। তাঁর কথা বলতে বলতেই কাশীর দিদিমা আর প্রায় অশীতিবরষের বৃদ্ধা থাকতেন না; অন্ধ ছুচোখ তাঁর জ্বলে উঠতে দেখেছি আলোয়। দেহের গঙ্গায় দেখেছি ছুকূল ছাপিয়ে ডাকতে জীবনের বন্যা। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছি রোমাঞ্চিত হতে। তাঁর নয় আমারও গায়ে কাঁটা দিয়েছে প্রত্যেকবার যতবার শুনেছি অর্ধ-কালীর কাহিনী। ঈশ্বর প্রসঙ্গ করলে মানুষের কি হয় পুঁথির পাতায় তো লেখা নেই কোথাও; ঈশ্বর প্রসঙ্গ করলে সংসারের সার ত্যাগ করে যারা সং সেজে আনন্দ পায় সেই বকোমধ্যে হংস হয় মানুষ; ঈশ্বর প্রসঙ্গ করলে বকোমধ্যে হংস হয়; ঈশ্বরসঙ্গ করলে হয় পরমহংস। ঈশ্বরসঙ্গ করেছেন ক্ষণকালের জন্যেও এমন ক্ষণজন্মার মুখে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ শুনে থাকে যদি কেউ তবে কেবল সে-ই অনুভবে আনতে সক্ষম হবে কাশীর দিদিমার কাছে অর্ধ-কালীর কাহিনী-শুনতে কেন এমন হয়; সূর্যের শেষ আলো মুখে এসে পড়লে কাশীর সেই অন্ধকার গলির একফালি আরও অন্ধকার ঘর আলো হয়ে যায় কখন্; কখন ভরে যায় রজনীগন্ধার সৌরভে; বয়ে যায় কখন্ সেই ঘরের ওপর দিয়ে সুরের সুরধুনী; আর কাশীর দিদিমার কণ্ঠে অর্ধকালী আবির্ভূত হন যখন, তখন মনে হয় ফিরে গেছি অন্ধকারে আশ্চর্য আলো করা আনন্দানন বাল্মীকির মুখে, সেখানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে রামায়ণগান সেই সংখ্যা গণনার অতীত এক না-প্রত্যূষ, না-প্রদোষে।

তিনশো বছর আগেকার কথা। ঢাকার মাণিকগঞ্জ মহকুমায়

মিতরা গ্রামের পদ্মনাভ বংশোদ্ভব শ্রীগোবিন্দরাম ভট্টাচার্যের পুত্র শ্রীরাঘবরাম ভট্টাচার্য তাঁর শিক্ষাগুরু মৈমনসিংহ জেলার মুক্তাগাছার প্রতিবেশী গ্রাম পণ্ডিতবাড়ীর সাধক দ্বিজদেবের টোল থেকে শিক্ষা সমাপনে প্রত্যাগমন করছেন নিজের গ্রামে নৌকায়। নদীর জল সন্ধ্যার অন্ধকারেও আলো হয়ে আছে; সহস্র পদ্মের গন্ধকে হার মানানো এ কোন্ আশ্চর্য সৌরভ আসছে নৌকার অন্ধবিবর থেকে? স্বগ্রামীন্‌রা অপেক্ষা করছে স্তব্ধ বিস্ময়ে সঙ্গে করে কী এনেছে রাঘবরাম? পুঁথির পাতায় তো এত আলো নেই; নৌকার দেহ তো নয় চন্দনকাঠের; তবে? রাঘবরামও নেমে আসতে পারছে না নৌকা ছেড়ে সহসা। রহস্যনিবিড় হয়ে এলো মিতরার বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী-তীরে রাঘবরাম আর তাঁর গ্রামবাসীদের ঘিরে। তারপর কোন্ সময়ে যে উঠে গেছে যবনিকা সেই পরমের চরমনাট্যের; নিজেই আবির্ভূত হয়েছেন রাঘবরামের পরমরমণী জয়তুর্গা; কেউ জানে না। এ কি অপরূপ আবির্ভাব? ঘোমটায় মুখ ঢাকা; যেন মেঘে ঢাকা পূর্ণশশী ফেটে পড়তে চাইছে আলোর ভার বইতে না পেরে! কিন্তু সেই অঙ্গের যেটুকু হয়েছে দৃশ্যমান তার বর্ণ নয় বর্ণনীয় বিষয়। অর্ধেক তার ঘনশ্যাম আর অপরার্ধ অপরিসীম গৌর। নৌকায় উঠে দাঁড়াতেই জয়তুর্গা যেন তুলে উঠল ত্রিভুবন; সিংহের ওপর যেন আরূঢ়া হলেন জগদ্ধাত্রী। রাঘবরামের মুখে নিঃসরণ হলো না একটি বাক্যও; গ্রামবাসীরাও নির্বাক। ছলাৎ ছলাৎ করে বয়ে যেতে গিয়ে কেবল মিতরা গ্রামের নামহীন নেই নদী, থেমে গেছে বুঝি মুহূর্তের জন্যে; তারপর বয়ে গেছে আবার দ্বিগুণ বেগে যেমন বয়ে চলেছে সে চিরকাল।

রাঘবরমণী জয়তুর্গা সাধক দ্বিজদেবের কন্যা। জয়তুর্গার আবির্ভাবের আগে দ্বিজদেব দীর্ঘকালব্যাপী বহু সাধনায় বহুতর আরাধনায় দেবী যোগমায়াকে ডেকেছিলেন দেখা দেবার জন্যে একবার। আবির্ভূত হয়েছিলেন দেবী যোগমায়া; বলেছিলেনঃ বর চাও। বর চেয়ে-ছিলেন সাধক দ্বিজদেব। অর্থ নয়; সামর্থ্য নয়, নয় তুচ্ছ লোকমান।

চেয়েছিলেন যোগমায়া আস্থন তাঁর ঘরে। অদৃশ্য থেকে নয়; অন্তরালে থেকে নয়। নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল যে ভুবনমনোমোহিনীরূপে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন দ্বিজদেবের গানের ওপারে সেই বিচিত্র রূপে আস্থন দ্বিজের কুটীরে।

দেবী যোগমায়া পূরণ করেছিলেন ভক্তের প্রার্থনা এই বলে ঃ তাই হবে তবে। আমি কলির চার হাজার সাত শত বর্ষ পর অর্ধ-কালী মূর্তিতে প্রমূর্ত হবো তোমারই ঘরে; আমার অঙ্গ একাংশ হবে কৃষ্ণ এবং অপরাংশ গৌরবর্ণ হবে। পদ্মনাভ বংশের বিশুদ্ধ-চেতা গোবিন্দ-চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘবরামের সঙ্গে আমার বিবাহ উদযাপিত হবে যথাসময়ে।

দেবী অন্তর্হিতা হবার আগেই তাঁর দৈববাণীর সমর্থনে জয়ধ্বনি করলেন দেবলোক। সিদ্ধকাম শুনতে পেলেন গান উঠেছে দিকে দিকে ঃ ওই মহামানব আসে। দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।

স্বপ্ন দেখলেন দ্বিজদেবের ভার্যাও; ত্রিনয়নে তাকিয়ে আছেন নগেন্দ্রবালা বিশ্ববিমোহিনী দৃষ্টিতে, নিমেষহারা যেমন তাকিয়ে থাকে মায়ের মুখের দিকে মায়ের কোলে শুয়ে শিশুকন্যা।

স্বপ্ন সত্য হলো। যথাসময়ে আবির্ভূতা হলেন জগজ্জননী সাধক দ্বিজদেবের ঘর আলো করে। বিচিত্ররূপিণীর নাম রাখলেন তাঁর বাপ-মা; জয়দুর্গা। অর্ধেক অঙ্গ যাঁর কালো আর অর্ধেক যাঁর আলো, সেই অপরূপ বালিকা যখন ছোট্ট হাত বাড়ালো নাগালের অনেক বাইরের ফুল পাড়তে তখন সঙ্গীজন দেখলো অবাক-বিস্ময়ে পুষ্পভারনম্র বৃক্ষ নত হলো যেন আরও; যেন প্রণত হয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলো জয়দুর্গার পায়ে।

যথাসময়ে দ্বিজদেবের টোলে নিজে এসে দেখা দিলেন দেবীনির্দিষ্ট বর স্বয়ং রাঘবরাম ছাত্র হয়ে। শিক্ষা সমাপন হলে গুরুদক্ষিণার সময় আসে। গুরুপ্রাণ শিষ্য রাঘবরাম নিবেদন করেন দ্বিজদেবকে ঃ কি দক্ষিণা, আদেশ করুন; দ্বিজদেব বলেন ঃ তোমাকেই চাই রাঘবরাম।

আমাকে ? হতবাক রাঘবরামের নিমেষহারা নয়ন জানতে চায় তার মতো অকিঞ্চিৎকরকে দিয়ে কি কাজ হবে ঈশ্বরের প্রতীক মর্ত্যলোকে, শ্রীগুরুর। তোমাকে চাই তোমার জন্যে নয় ; আমার একমাত্র কন্যা জয়দুর্গাকে দিতে চাই তোমার হাতে। না, না, তীব্র প্রতিবাদে মুখর হলেন শিষ্য শ্রীগুরুবাক্যের ; এ কখনও হয়নি ; এ কখনও হয় না, গুরুকন্যা ভগিনীতুল্যা, তাকে বিয়ে করতে পারবেন না রাঘব, স্বয়ং দ্বিজদেব আদেশ দিলেও। হয় ; নিশ্চয়ই হয় ! আগেও হয়েছে, এখনও হয়, পরেও হবে ! দ্বিজদেব নাছোড়বান্দা। অনেক তর্ক ; অনেকতর বিতর্ক ! শাস্ত্রের বিচার বিশ্লেষণ, নজীরের শেষে শেষ পর্যন্ত দ্বিজদেবই জয়ী হন। অবশ্য সেদিন রাঘবরামের তাই বোঝবারই কথা ; কারণ তিনি গুরুকন্যাকে বিবাহ করতে চাননি কিন্তু বিবাহ করতে বাধ্য হচ্ছেন, কাজেই তাঁর বিচারে সেদিন তাঁরই হার। কিন্তু জয়দুর্গাকে বিবাহ করায় জীবনযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছেন তিনি সেকথা উপলব্ধি করার সময় তখনও তাঁর হয়নি। এবং সময় না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে কিছুই হবার নয় ; দুর্গার আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত মহিষাসুরকেই মনে হয় সর্ব্বশক্তিমান। পুরাণের এই প্রমাণ পুরানো হলেও মিথ্যে প্রমাণ হয় না আজও। আজও জগৎ সংসারে যারা অন্যায় করে আরামে আছে সেই রাবণকে যে শেষ পর্যন্ত দুঃসময় হলে রামে মারবে, সময় হয়নি বলেই আমরা তাতে আস্থা রাখতে পারছি না।

জয়দুর্গা,—যাঁর অঙ্গে শ্যাম ও গৌরবর্ণের সমান সমারোহ সেই বিচিত্ররূপিণী যখন মৃদু হেসে নিজে এসে জীবনের সিংহদ্বার খুলে দেখা দিলেন তখন রাঘবরামের সংসার অন্ধকার করে এলো নিদারুণ সামাজিক সমস্যা। একে রাঘবরাম বিবাহ করবার সময়ে সময় পাননি স্বগ্রামীন কাউকে জানাবার ; তায় নতুন বউয়ের অপূর্ব রূপও কিছুটা বিরূপ করেছে তাদের। তারা নতুন বউয়ের হাতে প্রথমান্ন গ্রহণ করতে আপত্তি করল। অনেক অনুনয়ে, অনেক বিনয়ে এক সময়ে গ্রামের সমাজে শুকনো হৃদয় করুণাধারায় গললো ! তারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলো রাঘবরামের গৃহে 'নববধূ-ভাতে'-র অনুষ্ঠানে পাত পাড়বার।

বিধাতার মনে কি ছিলো কে জানে, দমকা হাওয়ায় উড়ে গেলো মাথার ঘোমটা অন্ন পরিবেষণরত নববধূ জয়দুর্গার। মাথা নীচু করে অন্ন মুখে তুলছেন সার সার নিমন্ত্রিতেরা ; সকলের অলক্ষ্যে জয়দুর্গার অঙ্গে আবির্ভূত হলো যোগমায়ার আরও দুই হস্ত। নিমেষে মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে চতুর্ভুজা হলেন আবার দ্বিভুজা ; যোগমায়া আবার জয়দুর্গা।

সকলের অন্নগ্রহণ সমাপ্ত হলে, চলে গেলে সবাই ঠাকুরঘরে ক্লান্ত জয়দুর্গা যখন একা, তখন ফিরে এসেছে একজন নিমন্ত্রিত ; সঙ্গে এনেছে এক জোড়া নয়, দু জোড়া শাঁখা! এসে বলেছে জয়দুর্গাকে সেই শাঁখা পরতে। দুটি শাঁখা দু হাতে পরে জয়দুর্গা জিজ্ঞেস করেছেন ; দু হাতের জন্যে চারখানা শাঁখা কেন?

কেন?—পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেছে ভক্ত : তুমি দ্বিভুজা নও যে মা : তুমি চতুর্ভুজা—

দেখে ফেলেছিস?

একবার দেখেছি মা ; আরেক বার দেখতে চাই। তুমি দাঁড়াও তোমার ভুবনমনোমোহিনী মূর্তিতে—ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ, সম্পূর্ণ করতে বিধাতার অভিলাষ, জয়দুর্গা দাঁড়ান চতুর্দিক আলো করে চার হাতে পরিধান করে চার শাঁখা। ভক্ত অনিমেষ লোচনে দেখে অর্ধশ্যাম অর্ধগৌর জয়দুর্গাকে নয় ; ৺অর্ধ-কালীকে।

মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে সে। রূপসম্বরণ করেন যোগমায়া। গ্রামের সকলের সমবেত চেষ্টাতেও কিন্তু মূর্ছা ভাঙ্গে না ভক্তের ; জয়দুর্গা হাসেন : এ মূর্ছা ভাঙ্গবার নয় যে, মর্ত্যবাসীর কানে গেছে যে অমর্ত্যলোকের মূর্ছনা!

দিনের অন্তিম আলো আকাশের আঙিনায় মিলিয়ে গেলে কাশীর দিদিমার কাছে অর্ধ-কালীর এই কাহিনী শুনতে শুনতে হোন আপনি যত সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত—আপনার মনে হবে আপনি কাশীর দিদিমার মুখে রূপকথা শুনছেন না ; শুনছেন মানবজীবনের অপরূপ কথা।

দুই

"The temple is lit by naked electric bulbs that hang from the ceiling and throw a harsh light on the sculpture, but where they do not penetrate render darkness more mysterious. The impression you take away with you, not withstanding that vast, noisy throng, or may be because of it, is of something secret and terrible."

—A Writer's Notebook [page : 290]

৺কালীঘাট থেকে ৺কাশী পর্যন্ত ; ৺মা কালী থেকে ৺বিশ্বনাথ পর্যন্ত তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে দেখতে যায় যারা তাদের অনেকের মুখে প্রায় শুনবেন ভারতবর্ষের হিন্দু মন্দির ভারি অন্ধকার ; ভারি অপরিষ্কার। এখানে পাণ্ডাদের আর যাত্রীদের ভীড়ে ভয়ঙ্কর অস্বস্তি হয় ; ভালো করে দেখা যায় না মূর্তির মুখ। পূজা করা যায় না প্রাণভরে ; নিভৃতে নির্ভয়ে করা যায় না মন্ত্রোচ্চারণ। পৃথিবীর দূরপ্রান্ত থেকে যারা আসে ভারতবর্ষের মহামানবের মন্দির প্রাঙ্গণে তারাও উদ্‌ভ্রান্ত হয় এই দেখে ; ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে ফিরে যায় নিজের দেশে। সেখানে গিয়ে বই লেখে ; সে বই পড়ে আবার আমরাই মূর্ছা যাই। লজ্জা পাবার চেষ্টা করি দেবদাসীর নৃত্যের কথা লেখা আছে দেখে। অথবা আমাদের মন্দির নয় কেন মুক্ত ভীড় আর অন্ধকার আর অপরিষ্কারের কলঙ্ক থেকে তাই নিয়ে দৈনিক পত্রের মতামতের জন্যে 'সম্পাদক দায়ী নন' কলামে খোলা চিঠি লিখে জন্মসার্থক করি। ভুল বলেছি। ৺কালীঘাট থেকে ৺কাশী ; ৺মাকালী থেকে ৺বিশ্বনাথ। কোথাও, কাউকেই দেখতে যায় না এরা ; দেখাতে যায়। নিজেদের জাহির করতে যায় জগতের সর্বত্র। কত তীর্থ ঘুরেছে তারই সচিত্র সচল বিজ্ঞাপন এরা। এদের

লেখা বইতেই পাবেন কেবল ৺কাশী কলিকাতা থেকে কতদূর ; এখানে ইতিহাস প্রসিদ্ধ কি কি দেখবার অথবা কেনবার আছে ; হোটেল, ধর্মশালা অথবা যাত্রীনিবাসের সংখ্যা কত ; ইত্যাদি। ওদের বইতেই পাবেন ৺কাশীর area কত মাইল-গজ-ফুট-ইঞ্চিতে। পাবেন না কেবল ৺কাশী ভারতে হিন্দুর কাছে কি এবং ৺কাশীর মন্দিরে আসা লোকে আর অগণিত মানুষের পায়ের ধুলায় অপরিচ্ছন্ন অপরিসরে যিনি স্মরণাতীত কাল থেকে অচল হয়ে আছেন সেই ৺বিশ্বনাথ হিন্দুধর্মের কে ?

মন্দিরের বাইরে থেকে যে চলে যাবে না ; প্রবেশ করতে পারবে কেবল মন্দিরের মধ্যে নয়,—মূর্তির অন্তরে কেবল সেই জানবে জানতে পারবে হিন্দুরা যায় আরাধনা করেতে যুগেযুগান্তরে সে মাটির পুতুল নয় ; প্রাণের প্রতিমা। পৌত্তলিক বলে যারা হিন্দুদের উপহাস করেছে তারা জানেনি যে সে মাটিকে হিন্দুরা মাটি করেনি কোনও দিন। 'মাটির' মূর্তি থেকেই হিন্দুর হৃদয়ে চিরকাল মূর্ত্ত হয়েছে 'মা'-টিই ; প্রমূর্ত্ত হয়েছেন তিনি। যার প্রাণে একবার গেছে এই বার্তা, যার প্রাণে একবার বেজেছে এই বাঁশী কেবল সেই জেনেছে যে মানুষের পায়ে মন্দির-প্রাঙ্গণ অপরিষ্কার হয় না ; পবিত্র হয়। হিন্দুর মন্দির য়ুরোপের আর্ট গেলারি নয় ; কনোস্যুয়ার অথবা ক্রিটিক ছাড়া সেখানে আর সকলের জন্যই অলিখিত নির্দেশ ঝুলছে ঃ নো এ্যাডমিট্যান্স। হিন্দুর মন্দির নয় আধুনিক ভারতের ড্রয়িং রুম যেখানে কার্পেটের ওপর চার ধারের সোফার মাঝখানে বেতের টেবিলের ওপর কাগজের ফুলে আর ঘরের কোণে এক দেওয়াল যেখানে আরেক দেওয়ালের ডিসটেম্পার্ড মুখে চুম্বন করছে সেখানে সযত্নে দাঁড় করিয়ে রাখা মাটির তৈরী ঘোড়া অথবা ভাঙ্গা কুঁজোয় ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল উদাহরণ উপস্থিত, কৃষ্টির আর আঁতেলেকতুয়াল দৃষ্টিতেই কেবলমাত্র।

৺বিশ্বনাথের মন্দির এর চেয়ে অনেক বড়ো। এখানে রাজা আর প্রজা ; জ্ঞানী এবং মূঢ় ; পাপী এবং পুণ্যাত্মার আসন

পাশাপাশি। এর অন্ধকারকে যারা শুধু বিদ্যুৎ-আলোর অভাব মনে করে তাদের চোখ আছে তবু দৃষ্টি নেই। কিন্তু এমন কেউ-যদি কোথাও থাকে যার বাইরের চোখ নেই কিন্তু ভিতরের দৃষ্টি আছে সে জানছে যে এই অন্ধকারের উৎসব হতে যে আলো অনন্তকাল ধরে নিত্য-উৎসারিত সেই দিব্যালোকে ৺বিশ্বনাথের অঙ্গ আলোকময়। অগণিত অসংখ্য মানুষের পায়ের ধূলোয়, জলে-কাদায় পাঁক যে দেখে মন্দিরপ্রাঙ্গণ অপরিষ্কার সে দুবেলা চোখ ধোয় তবু তার দৃষ্টি পরিষ্কার নয়। কিন্তু এমন কেউ যদি কোথাও থাকে যার বাইরের চোখ বোজা কিন্তু অন্তরের দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন সে এই অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতির সমুদ্র দেখতে পায়; এই পাঁকের মধ্যে পায় পদ্মগন্ধ। তার কণ্ঠে অবারিত হয় সুরের সুরধনী: এই জ্যোতি সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্মরাজে, তারই মধুপান করেছি ধন্য আমি তাই।

অচল ৺বিশ্বনাথের মন্দিরে অন্ধকারে আলো করে এমনই একদিন এসে দাঁড়িয়েছিল এই ৺কাশীতেই একজন, লোকে আদর করে আজও যাঁর উদ্দেশে দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে: সচল ৺বিশ্বনাথ। ৺বিশ্বনাথের মন্দিরে, উত্তরবাহিনী গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গে, কখনও তার সূর্যস্নাত তীরে, কখন বন্ধদ্বার প্রকোষ্ঠের অন্ধকারে, সুধা ও বিষ্ঠাকে, মেঘ ও রৌদ্রকে, শীত ও গ্রীষ্মকে, সুখ ও দুঃখকে, পরম পাওয়ার গভীর আনন্দ এবং চরম না পাওয়ার সুগভীর বেদনাকে তিনি সমজ্ঞান করেছিলেন। সুখে তিনি বিগত-স্পৃহ; দুখে তিনি নিরুদ্বিগ্ন। বীতরাগভয়ক্রোধ তিনি। তাঁর কথা না বললে আগে, সর্বাগ্রে স্মরণ না করলে ৺কাশীর কথা বলা হয় না।

এই ৺কাশীতেই ৺কালী মন্দিরে দাঁড়িয়ে এই সচল ৺বিশ্বনাথ একদিন প্রস্রাব করে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন ৺কালীর গায়ে। সঙ্গে ছিলেন আরেক মহৎ জীবনজিজ্ঞাসু। তিনি এরকম আশ্চর্য দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত। তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে জবাব লেখা হলো মাটিতে: গঙ্গোদকং। কিন্তু ৺কালীর গায়ে তাকে ছিটিয়ে দেওয়া

কেন ? তার উত্তর আরও বিস্ময়কর ; আরও বিশ্বাসের বাইরে ঃ পূজা।

প্রস্রাব যাঁর কাছে গঙ্গাজল ; মূত্র যাঁর পূজার মন্ত্রপূত বারি কেবল তাঁকে জানলেই ৺কাশীকে জানা হয়। তাঁর নাম জানলেই প্রণাম করা হয় ৺বিশ্বনাথকে। ৺কাশীতে মৃত্যু হলে কেন হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে শিবলোক প্রাপ্ত হয় মানুষ তার জন্যে যেতে হয় ৺কাশীতে নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যিনি ৺বিশ্বনাথ কেবল অন্ধের দৃষ্টিতেই অচল ; মোহান্ধের চোখেই সে মন্দির অন্ধকার ; মানুষের পায়ের ধূলায় সে প্রাঙ্গণ অপরিষ্কার। সুদীর্ঘ কালব্যাপী এই সচল ৺বিশ্বনাথ বসেছিলেন অচল ৺বিশ্বনাথের পায়ের কাছে। যেখান থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, মিলিয়ে গেছেন একদিন সেখানেই। মিলিয়ে যাবার আগেই নিজের দুঃসাধ্য সাধনা দিয়ে আর জ্যোতির্ময় আরাধনা দিয়ে মিলিয়ে দিয়ে গেছেন মানুষের প্রশ্নের উত্তর। কেন একজন দুঃখ পায় আর আরেকজন পায় সুখ। আবার এমন একজনও কেন থাকতে পারেন যিনি সুখে দুঃখ এবং দুঃখে অনুভব করতে পারেন সুখ। যিনি শীতকে উষ্ণ ; উত্তাপকে নির্বাণ ; রূপকে অপরূপ ; মূত্রকে মন্ত্রপূত বারি মনে করতে পেরেছিলেন ৺বিশ্বনাথের মন্দির প্রবেশ করবার আগে অনুপ্রবেশ করতে হবে তারই অলৌকিক জীবনের অন্তর্লোকে। অলৌকিক কিন্তু এতটুকু অলীক নয় যাঁর দিব্য ইতিহাস সেই ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নাম করে তাঁকে প্রনাম করে আরম্ভ করছি এই ৺কাশীরই কাণ্ড। এই ৺কাশীর কথা অমৃতসমান ; যে শোনাচ্ছে এবং যিনি শুনছেন, সেই দুয়ের ওপরই বর্ষিত হোক সেই একের আশীর্বাদ। সেই এক হয়েছিলেন একদিন এই ৺কাশীতে সেই ৺একজন,—সেই ত্রৈলঙ্গ স্বয়ং সহায় হোন। তাঁর কথা তিনিই বলুন যিনি মূককে বাচাল করেন, পঙ্গুকে দিয়ে করান পর্বতলঙ্ঘন। অয়ম্ আরম্ভ শুভায় ভবতু।

ঝড় উঠবার আগে যেমন কৃষ্ণবর্ণ আকাশ থমথম করতে থাকে

আতঙ্কে ; আশঙ্কায়, আশ্বিনের আকাশ যেমন নিরুপম নীলে আসন পাতে আসন্ন ৺মহাপূজার ; তেমনই মহামানবের সময় হ'লে আবির্ভাবের দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্যধুলির ঘাসে ঘাসে। অমর্ত্যলোক থেকে মর্ত্যলোকে আসেন এই মহামানবরা ; যুগে যুগে আসেন ভগবানের দূত। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীর যারা বিষিয়ে দিয়েছে বায়ু, নিভিয়ে দিয়েছে আকাশ উবুড় করা আলো তাদের দিকে তাকিয়ে ক্ষমাসুন্দর হাস্যে বলেছেন : ক্ষমা করো ; ভালোবাসো। বিদ্বেষ বিষ নাশো। সকল যুগের সব সাধকের ধারা ধেয়ানে মেলাতে চেয়েছেন যাঁরা তাঁরা এসেছেন কখনও রাজগৃহের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় ; কখনও দীন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে। কখনও অবহেলায় আর অবজ্ঞায় সকলের অগোচরে আরম্ভ হয় তাঁদের জ্যোতির্ময়ী তপস্যা। লোক উপহাস করে। উপহাসের উত্তরে হাসেন তাঁরা যেমন হেসেছেন ধনীর দীনতায় ; জ্ঞানীর মূঢ়তায় চিরকাল। আকাশ অন্ধকরা দুর্যোগের কালো মেঘে ঘেরে ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা। প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। তরুণ বালক উন্মাদ যন্ত্রণায় পাথরের পায়ে নিস্ফল মাথা কোটে ; কবির কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয় ; বাঁশি হয় সঙ্গীতহারা। অমাবস্যার অন্ধকার লুপ্ত করে গানের আর আলোর ত্রিভুবন, অশ্রুজলে শুধায় নিপীড়িত মানবাত্মা : যাহারা তোমার বিষিয়েছে বায়ু আর নিভিয়েছে আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করেছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?

সেই জিজ্ঞাসায় টলে ধ্যাননিমগ্ন ধূর্জটির আসন। অভয়ঙ্কর আনন সহসা হয় রুদ্র, দীপ্ত ভয়ঙ্কর। ধেয়ে আসে ঈষাণের পুঞ্জ মেঘ অন্ধ বেগে বাধাবন্ধহারা ; মেঘে মেঘে ডম্বরু বাজে নটরাজের, দধীচির অস্থি নামে অভিশপ্ত অসুরলোকের শিরে বজ্র হয়ে। ধূর্জটির আসন টলে আর দুলে ওঠে পৃথিবী ; গর্জে ওঠে আকাশ কলমন্দ্র-রোলে। প্রস্তুতি পূর্ণ হয় কুরুক্ষেত্র পর্বের ; সুদর্শন চক্রের দেখা মেলে আর শোনা যায় শঙ্খের মুখে : সম্ভবামি যুগে যুগে। দুর্জনের,

দুর্যোধনের বিনাশ ; আর ধর্মের, ধর্মরাজের প্রতিষ্ঠাকল্পে আবির্ভূত হচ্ছি আবার। গীতা, উপনিষদ, বেদ, পুরাণ, শাস্ত্র, পুঁথি, পাঁজি, উপদেশ, তর্ক, বিচার, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, টীকা, ব্যাকরণ, দর্শন, তত্ত্ব, তথ্য, স্মৃতি, কারুর শরণ নেওয়ার প্রয়োজন নেই আজ ; স্মরণ কর শুধু আমাকে। মামেকং শরণং ব্রজ। যিনি ব্রজ হয়ে দুর্জনের দুর্যোধনের বিনাশ করেন, তিনিই ব্রজরূপে রক্ষা করবেন ধর্মকে ; ধর্মরাজকে।

আবির্ভাব মুহূর্ত্তে যেমন রোমাঞ্চিত হয় মর্ত্যভূমি, এঁদের তিরোভাবের লগ্ন আসন্ন হলে তেমনই অবারিত হয় সমুখে শান্তি পারাবার। যাবার সময়ে এঁদের খসে পড়ে তারা। চলে গেলে আকাশে উজ্জ্বল হয় একটি নীলাঞ্জনরেখা।

শতাব্দীকাল কি তারও আগে দক্ষিণভারতে এসেছিলেন এমনই এক ভগবানের দূত। সংসারজীবনেই তাঁর নাম ছিলো শিবরাম। তাঁকে কেবল দীর্ঘকায় বললে ভুল হয় ঃ তিনি ছিলেন সুদীর্ঘকায়। সাধারণ মানুষ দৈর্ঘ্যে সাড়ে তিনহাত হয় ; মরে গেলে ওইসাড়ে তিন হাত জমিরই দরকার হয় তার ! কিন্তু জীবন যে মৃত্যুর চেয়ে ঢাঙা তাই প্রমাণ করবার জন্যেই যেন শিবরাম এক হাত অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর মর্ত্যলীলায়। এই শিবরামই উত্তরজীবনে ত্রৈলঙ্গস্বামী হলে,—বরাণসীর লোকেরা তাঁকে বলতো সাড়ে চারহাত সাধু। সুদীর্ঘাঙ্গনয়, সুদীর্ঘায়ুও বটে। কেবল কাশীধামেই তাঁর লীলা দেড়শত বৎসর ধরে অব্যাহত ছিলো। আয়ু নয়, মানুষের আয়ু এত হয় না। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর হয়েছিলো ; তার কারণ আয়ু নয় ; আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,—যা কেবল যোগী-তনুতেই সম্ভব।

সুদীর্ঘকাল ধরে লৌকিক দৃষ্টির সামনে অনেক অলৌকিক অঘটনের নায়ক এই পরমযোগী নিজের জীবন দিয়ে যে বাণী উচ্চারণ করেছেন তা সনাতন ভারতের বাণী। আমরা যাকে অলীক বলতে না পেরে বলি অলৌকিক আসলে তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পশুর

শক্তি দেহে ; মানুষের, মনে। এই মন দিয়ে সে এমন বস্তু নেই যাকে না মুহূর্তে তৈরী করতে পারে সর্ব্বসমক্ষে ; এই মন নিয়ে সে চোখের পলক পড়বার আগে সেই দূরধিগম্য স্থান যেখানে না উপস্থিত হতে পারে, এই মন দিয়ে সে এমন মন নেই যার খবর না সংগ্রহ করতে পারে ইচ্ছে করলেই। মানুষের মধ্যে এই শক্তি আছে ; কেবল তাকে যুগের পর যুগ কাজে না লাগানোর কারণেই, অবশ অঙ্গের মতোই, হয়েছে অকার্যকরী।

ত্রৈলঙ্গস্বামীর অনন্ত জীবনকর্ম থেকে মাত্র দুটি অধ্যায় উপস্থিত করছি এখানে ; এই দু'টি দৃষ্টান্তই উজ্জ্বল উদাহরণ, কেন ত্রৈলঙ্গকে না জানলে ৺বিশ্বনাথকে জানা অসম্ভব, সেই উক্তির। ত্রৈলঙ্গর আবির্ভাব অথবা এই দুই ঘটনার কিম্বা তাঁর তিরোধানের সময়-তারিখ উল্লেখ করছি না। কারণ ত্রৈলঙ্গদেবের অবস্থান সময়ের উর্দ্ধে, তাই। প্রথম ঘটনাটি ঘটে কাশীর গঙ্গায়।

ভারতবর্ষের প্রবল প্রতাপান্বিত এক ভূপতি সপার্ষদ বরুনা থেকে অসি গঙ্গা যেখানে উত্তরবাহিনী সেখানে নৌকাবিহার করছেন একদিন। আর দেখছেন ভীমকান্তি এক নরদেহ গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ; একখণ্ড বিশাল কালো শিলা যেন ভেসে যাচ্ছে আকাশের নীলনদীতে। দিনের আলো কাশীর গঙ্গায় তখন সবেমাত্র এসেছে। ঘাটে ঘাটে সন্ধ্যার জ্বালা দীপ নেভবার অপেক্ষায়। ঘাটের পর ঘাটের গায়ে দাঁড়ানো আকাশ-উদ্ধত বাতিগুলোর গায়ে সাদা কালোর ছায়া, নৌকয় ভরে গেছে গঙ্গার বুক। সেদিনকার কাশীর গঙ্গাবক্ষের বর্ণনায় বলছেন এক বিদেশী লেখক যার ভাষান্তর সম্ভব ; কিন্তু ভাবান্তর অসম্ভব :

"Benares...Then in the morning before the sun rises you drive through the city, the shops still and men under rugs lying asleep on the pavement ; a scattering of pepole are going down to the river, with brass bowls in their hands, for their prescribed

bath in the sacred water. You get on to a houseboat, manned by three men, and slowly row down by the ghats. It is chilly in the early morning. The ghats are unevenly peopled. One, I don't know why, is crowded. It is an extraordinary spectacle...

"It is a moving, a wonderfull thrilling spectacle ; the bustle, the noise the coming and going give a sense of seething vitality ; and those still figures of the men in contemplation by contrast seem more silent, more still, more aloof from human-intercourse."

এমনই এক মনোরম সকালে রাজার নৌকার দিকে ভেসে আসছিলেন জলবিহাররত ত্রৈলঙ্গস্বামী। নৌকার কাছ বরাবর হতে রাজতরণীতে যারা কাশীর লোক ছিলো তারা সাড়ে-চার হাত সাধুকে চিনতে পারলো ; রাজা সেই সিদ্ধযোগীকে সাদর আহ্বান জানালেন তাঁর নৌকায়। সানন্দচিত্তে, কখনও বালকবৎ, কখনও জড়বৎ, কখনও উন্মাদবৎ মুক্তপুরুষ উঠে এলেন জল ছেড়ে কাঠের ডাঙায়। আসন গ্রহণ করলেন কিন্তু কথা বললেন না নির্বাক সাধু। নিস্তব্ধ নৌকাকে নিয়ে বয়ে যেতে লাগলো শান্ত সুরধুনী। জবাকুসুম সঙ্কাশ সর্বপাপঘ্ন দিবাকর উদিত হলেন পূর্বদিগন্ত অপূর্ব আলোকে দীপ্ত করে। রাজার তরবারী চেয়ে নিলেন যোগী ; তারপর নিক্ষেপ করলেন গঙ্গাবক্ষে। চক্ষের নিমেষে সেই মহার্ঘ্য অস্ত্র নয় রাজ-অলঙ্কার অন্তর্হিত হলো উত্তরবাহিনীর অতলে। হায়! হায়! করে উঠলো পার্শ্বচর। সূর্যের রক্তিমাভা ছড়িয়ে গেলো রুষ্ট রাজ-নয়নে। তরবারি ব্যবহারের বস্তু ছিলো না ; ছিলো মর্যাদার প্রতীক। ইংরেজ সরকার দেশী রাজার প্রভুভক্তিতে সন্তোষের নিদর্শন দিয়েছিলো, তরবারি উপলক্ষ্য।

হীরকাঙ্গুরীয় ফেলে দিলে উত্তপ্ত হতেন না এতটুকুও। একটা

গেলেও দশটা আসতো। কিন্তু এ তরবারি আবার কে দিতে পারে তাঁকে!

৺কাশীর ঘাটে ভিড়লো কাঠের নৌকা। রাজা কি ভয়াবহ শাস্তি সাধুকে দেন তারই আসন্ন আশঙ্কায় সমস্ত জগৎ নিঃশ্বাসবায়ু সম্বরণ করে মহা আতঙ্ক জপ করছে যখন মৌনমন্তরে, তখন ত্রৈলঙ্গ জলের অতল থেকে দু'হাত দিয়ে তুলে আনলেন তরবারি; একখানা নয়; দুটি তরোয়াল। রাজার হাতে যমজ সেই অস্ত্র তুলে দিয়ে বললেন: 'বেছে নাও; কোনটা তোমার?' হতবুদ্ধি রাজা চিনে উঠতে পারলেন না সেই বস্তু; যা নিজের একান্ত গর্ব্বের একমাত্র বস্তু খোয়া গেছে বলে রণহুঙ্কার দিচ্ছিলেন তিনি তা ফেরৎ পেয়েও ফেরৎ পাচ্ছেন না। রাজা তাকালেন মহাযোগীর ধ্যানাচ্ছাদিত চোখে; মহাযোগী তাকালেন শান্তসমাহিত দৃষ্টিতে রাজার চোখে। সেই দৃষ্টি স্মরণ করিয়ে দিলো যে কত মিথ্যে মানুষের অহঙ্কার। যে মানুষ জন্ম-মুহূর্ত্তে বাছুরের মতো হাম্বারবে জানায়, হাম, হাম; অর্থাৎ সব হামারা হ্যায়। আর সবার বেলায় হায় হায় করে ওঠে বাছুরের অন্ত্রের মতো ধূনুরীর হাতে: তুঁহু! তুঁহু! সব তুমি; সব তুমারা হ্যায়।

রাজার ধন রাজাকে ফিরিয়ে দিয়ে ফিরে যান যোগী অতল জলের আহ্বানে। নিজের তরবারি নিজের নয় জেনে রাজা তাকে জলে নিক্ষেপ করেন কি না সেকথা আজও অলিখিত রয়ে গেছে ইতিহাসে।

দ্বিতীয় ঘটনাটিই আসলে অদ্বিতীয়। উলঙ্গ সাধুকে ধরে নিয়ে এসেছে আদালতে সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞায় মোসাহেবের দল। সাধুর হয়ে কয়েকজন বললেন সাধুর বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত; অতএব আচ্ছাদন এবং আচ্ছাদনের অভাব দুয়েই এঁর সমান অনাসক্তি। সাহেব জিজ্ঞেস করলেন: খাদ্যের বেলায়? উত্তর হলো: সুধা ও বিষ্ঠায় সমান আসক্ত অথবা সমান নিরাসক্ত; রুচিও আছে; অরুচিও আছে। বেশ,—সাহেব অদেশ করেন,—সাহেবের খাদ্য

যা হিন্দুর অখাদ্য তা-ই আজ খেয়ে দেখাতে হবে যোগীকে যে কিছুতেই কিছু এসে যায় না তাঁর।

সাধু কথা বললেন এতক্ষণে : তার আগে আমার খাদ্যও তোমাকে খেয়ে দেখাতে হবে যে তোমার খাদ্য যেমন আমি খেতে পারি, আমার খাদ্যও তুমি খাবার ক্ষমতা রাখো।

সাহেব বললেন : তথাস্তু। হিন্দুরা নিরামিশাষী, এই জেনেই হ্যাঁ দিয়েছিলেন সাহেব।

ত্রৈলঙ্গস্বামী মলত্যাগ করলেন হাতের তালুতে, তারপর তা গ্রহণ করলেন মুখবিবরে। গ্রহণ করলেন সেই পরমপ্রসন্নাননে যে আনন্দে মাতৃস্তনে মুখ দিয়ে উন্মুখ হয় সদ্যোজাত। সর্বচরাচর ব্যাপী যিনি অনলে আছেন অনিলে আছেন ; যিনি একই সঙ্গে চলিষ্ণু এবং যুগ যুগ ধরে অপেক্ষামান ; যিনি চৈতন্যের আশীর্বাদ চৈতন্যে জড়ত্বের অভিশাপ, যিনি একই সঙ্গে মূক এবং মুখর ; যিনি আদি যিনি অনাদি, যিনি অন্তে আছেন ; অনন্তে আছেন—যিনি একই অঙ্গে নররূপে এবং সিংহরূপে অপরূপ, আজ তিনিই বিষ্ঠায় বয়ে এনেছেন মধুগন্ধ। মধ্যে যাকে ধরেছেন তাকে সীমিত দৃষ্টি দেখছে মনুষ্য শরীরের আবর্জনা বলে ; তার থেকে নির্গত হচ্ছে নিদারুণ দুর্গন্ধ।

কিন্তু অসীমে যার দৃষ্টি অবারিত সে জেনেছে এ মল নয় ; পরিমল। এখানেও এই মুহূর্তে উপস্থিত তিনি যিনি অনুপস্থিত হলে সূর্যের দীপ্তি, পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতি, তারার আলো, অশ্বত্থের পাতা, কৌস্তুভের কান্তি, মহাকালের আবর্তন অপহৃত। এখানেও এই মুহূর্তে তাঁরই অবস্থান যিনি উপস্থিত থাকলে তবেই অগ্নিতে উত্তাপ, বায়ুতে বেগ, শরীরে প্রাণ, আকাশে সকালসন্ধ্যা হয়।

দক্ষিণ ভারতের এই মহাযোগীর কাছে গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর থেকে আরেক উদ্‌যোগী। গঙ্গার ঘাটে বসে আছেন ত্রৈলঙ্গ ; হিমালয়ের শিখরে যেন উমানাথ। রামকৃষ্ণ প্রশ্ন করেছেন আঙুলের

সাহায্যে ঈশ্বর এক না অনেক? অঙ্গুলী সংকেতে উত্তর এসেছে তার। মহৎ জীবন জিজ্ঞাসার মহত্তর উত্তর: যিনি এক তিনিই অনেক; অনেকের মধ্যে তিনি একাকার।

ত্রৈলঙ্গর এই দিব্যজীবন যুক্তিতর্ক বিচার বিশ্লেষণের বস্তু নয়। বিশ্বাসের বিষয়। ভগবান জ্ঞান দেন; বুদ্ধি দেন। বিশ্বাস দেন না! জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচার বিশ্লেষণে যা হয় না; বিশ্বাসে তাই হয়। বিশ্বাসে যা হয় তা বিশ্বাসের বাইরে। এই বিশ্বাস যে পায়নি সে পায়নি দিব্যজীবনের নাগাল। এবং এই বিশ্বাস তাঁর অহৈতুকি কৃপা। কৃপা ছাড়া এক পা এগুনোর উপায় নেই বিশ্বাসের পথে। কার ওপর ভর করবে এই নিঃসংশয় নির্মল বিশ্বাস তা নির্ভর করে কেবল তাঁর ওপর যাঁর করুণায় মূক হয় কথায় উন্মুক্ত; পঙ্গু পার হয় পাহাড়। সে কেন্ ধ্রুব বিশ্বাস যার কথা এখন বুঝবার ব্যাপার নয়; হৃদয়ে বাজবার বীণা। এমনই একটি বিশ্বাসের প্রজ্জ্বলন্ত মূর্ত্তি দেখা গেছে একবার সুদূর মিশরে।

মিশরে সেবার বৃষ্টি হয়নি। রৌদ্ররুক্ষ মরুভূমির সীমাহীন উর্ধ্বে আকাশের নীল শকুনির মিছিল; তার পাখার ছায়ায় দুর্ভিক্ষের কৃষ্ণ পতাকা উড্ডীন। জীবনের জয়যাত্রা ব্যাহত; মহাকালের চাকা অচল। রাস্তায় গরু-বাছুর ধুঁকছে। মাঠের শ্যামলিমা মুছে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। শস্যশ্যামলা হয়েছে বিশুষ্ক কঠিন। সব বুভুক্ষু সন্তানের রক্তিম চোখের মণিতে জ্বলছে ম্যয়·ভূঁখা হুঁ-র পদ্মরাগমণি। মায়েরা যাপন করছে বিনিদ্র রাত্রি আকাশের দিকে তাকিয়ে; কখন বৃষ্টি নামবে। আকাশের নীল বুক চিরে দেবতার অশ্রু কখন ফোঁটায় ফোঁটায় নামবে বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিনের বুকে ভরে দিতে করুণা-ধারায়। বধির আকাশের দেবতা! ধূলির কান্না পৌঁছয় না গিয়ে তাঁর কানে। তাঁর চোখে আনে না তৃষ্ণার বারি। ধূ-ধূ করে মরুভূমির কঠিন বুক। বিস্তীর্ণ জনপদ জুড়ে কেবল মরীচিকার আমন্ত্রণ; মৃত্যুর আলিঙ্গন।

দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি ভীত মানুষের মিছিল নীল নদীর তীরে

বৃষ্টির জন্যে বেরিয়েছে প্রার্থনা করতে রাত্রির অন্ধকারে। মিশরের আবালবৃদ্ধ বনিতার সঙ্ঘবদ্ধ প্রার্থনায় উচ্চারিত হয়ঃ নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জিত ছায়া সম্বৃত অম্বর হে গম্ভীর। বৃষ্টির গানে বৃষ্টিহীন রাত কাঁপতে থাকে। মাটি তৃষ্ণা যার বক্ষ জুড়ে সেই ধরিত্রীর আর্তনাদ ওঠে দিকে-দিগন্তরে জল দাও ; জল দাও। আকাশের বধির কর্ণে ব্যর্থ ধ্বনি ফিরে আসে প্রতিধ্বনির ব্যঙ্গে।

নিঃশব্দ সেই মিছিল চলেছে এগিয়ে। কারুর মুখে কথা নেই। হাওয়া বন্ধ ; মহাকালের রথের চাকাও অচল হয়ে গেছে বুঝি। একটি বালক এই মিছিলের সঙ্গে চলেছে ছাতা নিয়ে সঙ্গে। সমস্ত মিছিলে কেবল তারই হাতে ছাতা। একজন তাই দেখে বলতে ছাড়েনিঃ ছাতা কি হবেরে, পাগলা ? এতটুকু অপ্রতিভ না হয়ে উত্তর করেছে মিশরীয় সেই বালকঃ বাঃ তোমরাই তো বললে প্রার্থনার পর বৃষ্টি পড়বেই—?

অবোধ সেই মিশরীয় বালকের এই অসঙ্কোচ উত্তরে সেদিন নাইল নদীর বুকে নিঃসীম ছায়া পড়ে আছে যার সেই হৃদয়হীন আকাশের চোখে দু' ফোঁটা জল টলমল না করে পেরেছে ?

॥ তিন ॥

ভ্রমন কথাটার গোড়াতেই কেন ভ্রম শব্দটা বসানো কে জানে ; কিন্তু ঠিক শব্দটাই ঠিক জায়গায় বসেছে।

বাঙলায় যে সব ভ্রমণ কাহিনী বেরোয় এবং জীবনচরিত তার প্রথমটায় ভ্রম এবং দ্বিতীয়টায় বিভ্রম ছাড়া আর কিছু উৎপাদনের প্রচেষ্টা থাকে কদাচ। এর জন্যে, এই কাল্পনিক ভ্রমণের এবং অবান্তর জীবনের জন্যে বাঙালী লেখকদেরই কেবল দায়ী করে লাভ নেই ; পাঠকের দায়িত্বও কম নয়। ভুল বললাম। বাঙলা বইয়ের পাঠক আজও আসেনি ; বাঙলা বইয়ের পাঠক যারা আজও তারা সবাই আসলে পাঠিকা। সেই পাঠিকাদের মনোরঞ্জনের কারণেই দুধে ভ্রমের জল মেশানো। বাঙলা জীবনচরিতে জীবন ছাড়া আর সবই উপস্থিত। যারা বলে বাঙালী উপন্যাস লিখতে পারেনি একখানা আজও, তারা আজও একখানাও বাঙলা বিওগ্রাফি পড়েনি,—তাই এমন কথা বলে। জীবনচরিতের ক্ষেত্রে বাঙালী অনায়াসে ফ্যাক্টের পরিবর্তে ফিকসন চালায় এবং পাঠকরা তা গলাধঃকরণ করে উইদাউট শ্লাইট ফ্রিকশান। ভ্রমণের ক্ষেত্রেও যা দেখেছে সে তার চেয়ে অনেক বেশী যা দেখেনি, যা দেখা যায় না, যা দেখা যাবে না কোনওদিন তারই উচ্ছ্বসিত বর্ণনায় পাতার পর পাতা অপব্যয় না করা পর্যন্ত আর যাই হোক রমণীয় ভ্রমণকাহিনী হলো না। বাঙালী পাঠিকা তথা পাঠকদের কৃপায় যদি ভ্রমণকাহিনীকে বেষ্ট সেলার হতে হয় তাহলে মনের কথা চাই বেশি ভ্রমণের কথার চেয়ে ; সে কথায় যত মণ ভ্রম তত মনোযোগ পাঠকের থুড়ি,—পাঠিকার।

এইজন্যেই হিমালয়ের কথাতেই কেবল হিমাচল ভ্রমণের বই অচল। শুধু কুয়াশার কথায় হিমালয়ের কথা লিখলে সে বই পোকায় কাটে ; আধ্যাত্মিক কু-আশায় আবৃত করতে পারলে হিমালয় বৃত্তান্তের আপাদমস্তক, তখনই সে বই খদ্দেরে কাটে।

তখনই হিমালয়ের বইয়ের আদর হিমালয় থেকে নিরাপদ দূরে অবস্থিত কলকাতার বাঙালী আলয়ে। শুধু গাইড-চালিত হলে বাঙলা ট্রাভেলর চলে না ; প্রয়োজন হয় পথ দেখিয়ে দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ভৈরবী মিস-গাইডের। অথবা লেডি কেরাণীর সঙ্গে আনতে হয় রাজপুত্রের আনরোমান হলিডে-র আরব্যোপন্যাস ; ছড়াতে হয় হুইশপ্যারিং ক্যাম্পেন, সে পাঠক তো বটেই হিমালয়ে যাদের আজন্ম বাস, বেশির ভাগ সময়ে উপবাস এবং অপমৃত্যু তারাও জানতে চেয়েছে একে ? এ কেরাণীকে ? জানতে চাইবেনই তো ! তুষারমানব পর্যন্ত শোনা গেছে ; তুষারমানবীর কাহিনী বাঙলা হিমালয়কাণ্ড ছাড়া, এমন প্রকাণ্ড মিথ্যা আর কোথাও খুঁজে পাবে না তা জানি—সকল দেশের রাণী সে যে আমার লেডি কেরাণী।

এই গোলো এক ; এর ওপর আছে আবার আরেক। গোদের ওপর বিষফোড়া ; বোঝার ওপর শাকের আঁটি ; দেশে-বিদেশে চালু অলীকবাবুর গপপোর ওপর মেরুতীর্থ পর্যটকের অলৌকিক অধভূত অর্ধেক-ভুত আর অর্ধেক অদ্ভুত। বাঙালী যেমন যতক্ষণ না কেউ বাপ-চৌদ্দপুরুষের রেখে যাওয়া যথাসর্বস্ব উড়ে ফুঁকে দিয়ে নীল রক্ত লাল করছে, ততক্ষণ তার জীবনী পড়তে নারাজ ; তেমনই যে জায়গায় যেতে হলে রক্তবমি না হয় অন্তত একজনের ; কয়েকজনের যদি দুর্গন্ধযুক্ত এমন 'অতীত' না থাকে যা স্বীকার না করা পর্যন্ত মেরুতীর্থ-পরিক্রমার পুণ্য অনর্জিত থাকে ; যদি না এর ওপরেও বাকী সব কজনের মাথা খারাপ হয় তাহলে সে বই-এর আশা নেই পাঠিকার মন কাড়ার। পুস্তকপ্রিয়াদের পসন্দ নয় সে বই। যে বই বর্তমানে যত বিকৃত সে বই-ই বর্তমানে তত বিক্রীত।

কাশী হচ্ছে ভারতের সেই একমাত্র তীর্থকেন্দ্র যা এই দুই দুর্ভাগ্য সুখবঞ্চিত। কল্পনার বুরকায় ঢাকা নয় তার আপাদমস্তক। অসূর্যম্পশ্যা নয় ৺বিশ্বনাথধাম ; দিবালোকের মত স্পষ্ট ; বাঙালীর ওপর অবাঙালী সর্বভারতের পুঞ্জিত ক্রোধের চেয়েও সুস্পষ্ট। কাশীর

কোথাও ধোঁয়া নেই। পৌঁছবার কষ্ট নেই কাশীতে। কাশীর গলি হোক যত ঘোরালো; তার মন্দিরে হোক যত অল্প আলো; সেখানে ধুঁকতে ধুঁকতে কাউকে করতে হয় না রক্তবমন অতীত-দুষ্কার্যের রুশীয়-স্বীকৃতি না উচ্চারণ করা তক। অথবা সে গলিতে সম্ভাবনা নেই হঠাৎ-সাক্ষাতের, 'দেখা না দেখায় মেশা কোন বিহ্বলতার।' সেখানে যারা যায় তাঁরা হয় ধর্ম, নয় অধর্ম করতে যায়; সেখানে যারা ঘুরে বেড়ায় তারা হয় ধর্মের যণ্ড, নয়, যতেক অধর্মের দারুণ পাষণ্ড। কিন্তু ধর্মে অধর্মে, যণ্ডে পাষণ্ডে, বিশ্বনাথ এবং বিশ্বের যতেক অনাথ নিয়ে কুহেলিকামুক্ত কাশী ভারতের মধ্যে মহাভারত। এই মহাভারত কথা যিনি পরিবেশনে উদ্যত তিনি কাশীরাম দাস নন; অতএব তা অমৃতসমান নয়। যিনি শোনাচ্ছেন তিনি ধন্য হতে চান না; যিনি পড়বেন তাঁর পুণ্যবান না হলেও চলবে; কিন্তু পড়তে পড়তে চোখ কান খোলা না রাখলে চলবে না।

চলবে না যে তার কারণ কাশীকাণ্ড কেবল পড়বার নয়; দেখবারও। কাশীতে যাবার পথেই প্রয়োজন সজাগ দৃষ্টি অসতর্ক কানের। যদিও কাশীতে যেতে ঘোড়া অথবা উটের পিঠের দরকার নেই; যেমন দরকার নেই নৌকা, ষ্টিমার অথবা জাহাজের। উড়ো জাহাজের পিঠে অবশ্য চাপা যায়; পৌঁছনও যায় কয়েক ঘণ্টারও কম সময়ে; কিন্তু পৌঁছনও যায় না কোনও দিন সেই মানুষের কাছে যে মানুষ সমস্ত মন্দিরের চেয়ে বড়, গীর্জার চেয়ে অনেক উঁচু তীর্থস্থান। সকল কালে সকল দেশে সমস্ত দেবতার চেয়ে যে পবিত্র, প্রণম্য; সকল যুগের সাহিত্য আর ইতিহাসের সে অপরিবর্তনীয় একমাত্র উপাদান। সেই মানুষ যার মধ্যেই কেবল রাম আর কৃষ্ণ কখনও আলাদা আলাদা আধারে, কখনও একই সঙ্গে সভ্যতার চরম দুর্দিনের আঁধারে পরমাবির্ভূত স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই যে মানুষ দনুজবেশে কখনও দলিত; আবার দুর্গা বলতে যার কখনও কখনও নীলোৎপল দু চোখ বেয়ে ভক্তি অশ্রু উদ্বেলিত।

আমার এই কাশীর কথাও কল্পিত ভ্রমণকাহিনীর অকল্পিত

রূপকথা নয়; মানুষেরই অপরূপ কথা। সেই মানুষ যাদের বিশ্বাস,—কাশীতে মরলে শিবলোক-প্রাপ্ত হয়; আর ব্যাসকাশীতে মরলে পরাধীন ভারতে যে গর্দভ হতো; স্বাধীন ভারতে আজ সে বাঙালী হয়। কাশী উপলক্ষ্য মাত্র; সেই লক্ষ কোটি মানুষই আমার লক্ষ্য কেবল।

হেঁটে গেলেই সব চেয়ে ভালো হয়; করণ;
উড়ে যেতে চাও উড়ে যেতে পারো
মেসিন-পক্ষীরাজে;
যেতে চাও কাদা ছুড়ে যেতে পারো
মোটর যানে তা সাজে।
সস্তার হারে টুরে যেতে চাও
ট্রেনের টিকিট কাটো;
মানুষকে যদি কাছে পেতে চাও
সবার সঙ্গে হাঁটো।

আজকের গতির যুগে হেঁটে যাও মানেই হঠে যাও। অবশ্য এই দূরের গতির বাকী এখনও অনেক দূর; অনেক দুর্গতির বাকী তার। তবুও হেঁটে নয় কিছুতেই। কিন্তু হেঁটে নয় যেমন, তেমনই নয় উড়ো জাহাজে 'দেশে দেশে চলি উড়ে' বলতে আমার আপত্তি দারুণ; কারণ আমি কেবল বাঙালী নয়,—আমি নিদারুণ প্রভিন্সিয়াল মাইণ্ডেড। এবং বাঙালী মাত্রকেই নিজেকে 'ডেড' না মনে করতে হলে বাঙালী মাইণ্ডেড মনে করতেই হবে নিজেকে। উড়ে যাবার দরকার কেবল তারই যাওয়া আসা যার ব্যবসা; আসা যাওয়া যার নেশা সে কোন দুঃখে তাড়া করতে যাবে এত; অত তাড়াতাড়িতে বাড়াবাড়িতে যাবার তার দরকার কি। আস্তে আস্তে হাসতে-হাসতে ভাসতে ভাসতে যাবে সে। যেমন সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলিমের স্রোত যখন বাঁকা তখন যেমন উড়ে চলে, অনেক ওপর দিয়ে নীল নদীর জলে যেমন মরাল, তেমনই বলাকারা, মুখে নিয়ে সৃষ্টির প্রথম

বাণী ; হেথা নয় ; হেথা নয় ; অন্য কোথা ; অন্য কোনখানে। উড়ে যাওয়া হচ্ছে পরীক্ষার পড়া ; রবীন্দ্রনাথের কবিতাও যার ফলে নীরস টিউটারিয়েলে পর্যুদস্ত। জলে জাহাজে এবং ডাঙায় জাহাজে চেপে যাওয়া হচ্ছে ভাষাতত্ত্বের মত বিশুদ্ধ বিষয়ও রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে সকলের বিস্ময়।

তাই ট্রেনে চাপো। ফার্ষ্ট ক্লাসে অথবা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরায় নয় ; তৃতীয় শ্রেণীতে। গান্ধীর মতো নামে থার্ড, আসলে ফার্ষ্ট ক্লাসের চেয়েও আরামপ্রদয় নয়। যে গাড়িতে তোমার সঙ্গে আপামর জনসাধরণ চলেছে দুর্গন্ধযুক্ত ল্যাভাটরির লজ্জা, ছারপোকার দংশন, অন্ধকূপ হত্যার আশঙ্কার সহ যাত্রী হয়ে, স্বাধীন ভারতে যার জনগণ মন অধিনায়ক, ভাগ্য বিধাতা রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাস করেন অতি অল্প সপরিবারে অসংখ্য কামরাযুক্ত প্রাসাদে আর যার আবালবৃদ্ধ বনিতারা উপবাস করে অসংখ্য লোকে মিলে অতি স্বল্প স্থানে বাস করার দুর্ভাগ্যের স্বর্গে, এবং সে প্রাসাদে রাজপ্রাসাদের বাস আরও কতকাল যে অব্যাহত থাকবে বলা অসম্ভব,—কারণ রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই বলে গেছেন ঃ হে রাজেন্দ্র তব হাতে অন্তহীন কাল। স্বাধীন ভারতের ট্রেনে চাপো যার গায়ে অলিখিত নির্দেশ সর্বদাই ঝুলছে ; বত্রিশ জন বসিবেক ; চৌষট্টি জন দাঁড়াইবেক ; একশত আটাশ জন বেঁকিয়া দাঁড়াইবেক ; এবং দুই শত ছাপ্পান্ন জন ঝুলিবেক।

এই ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে চাপো যদি স্বাধীন ভারতে হতে চাও জীবনের সহযাত্রী।

এই তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতেই, কাশী যাবার পথে আমার সুদর্শন রায়ের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ। অদ্বিতীয় সুদর্শন রায়। কাশী বললেই যেমন 'কাশীর দিদিমার কথা মনে পড়ে তেমনই যার কথা সঙ্গে সঙ্গে না মনে পড়ে পারে না, তারই নাম সুদর্শন। ধর্মের সঙ্গে অধর্মের ; ষণ্ডের সঙ্গে পাষণ্ডের ; বিশ্বনাথের সঙ্গে বিশ্বের যতেক অনাথের যেখানে দেখা মেলে চোখ খুললেই ; সে চোখ না খুললেও মেলাই

দেখে মেলে এমন বৈপরীত্বের সেই কাশীর উত্তর মেরু হল যদি কাশীর দিদিমা ; তবে তার দক্ষিণতম প্রান্ত হচ্ছে সুদর্শন নিঃসংশয়ে। কিন্তু রাবণ ছাড়া একা রামে জমে না রামায়ণ ; কেবল যুধিষ্ঠিরে আধুনিক নিউ রিয়ালিসতিক ফ্যাসনে তোলা আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত বিরসতম অখাদ্য গল্পের নামে ইনহিউম্যান দলিল চিত্র হয় ; দুর্যোধনের বিনা যুদ্ধের সুচ্যগ্র মেদিনী না দেবার প্রতিজ্ঞা ছাড়া অসম্ভব হয় কুরুক্ষেত্রের নাটক। শুধু কাশীর দিদিমাতে কাশীকাণ্ডর প্রকাণ্ড ফাঁক থেকে যায়। মেঘ ছাড়া রোদ্রের ছায়াবিহীন আলোর, কালোহারা সাদার ; দ্বন্দ্বহীন স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনহীন জীবনের দলিল হয় ; জীবননাট্য হয় না। তাই সুদর্শন রায়কেও উপস্থিত করা চাই। কাশীর মাহাত্ম্য খর্ব করবার জন্যে নয় ; কাশীর কাব্যকে উপস্থিত মহাকাব্যে উত্তীর্ণ করবার কারণ ; কাশীর রূপকে অপরূপ কণ্ট্রাষ্ট দেবার অভিলাষে।

সুদর্শন রায় বলে যার কথা এখন বলতে যাচ্ছি ; সুদর্শন তার নাম নয়—'রায়' নয় তার পদবী। নাম আর পদবী বানানো বটে ; তবে যার কথা বলতে যাচ্ছি সে লোকটা সত্য। কাশীর দিদিমার মতোই জ্যান্ত তার চেয়েও জলজ্যান্ত এই মানুষের কথা বলতে বসে তার নাম, পদবী, ধাম বাধ্য হচ্ছি পালটে দিতে ; কারণ লোকটা বেঁচে আছে আজও। এবং আমার দৃষ্টিকোণ থেকে, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিলে ন্যায় না হলেও, বাঁচার ওপর যে কোনও ঘা দিলেই, তা আরও অন্যায় হয়। অবশ্য সুদর্শন রায় আজ কেবল বেঁচেই আছে তার স্বনামে। বেঁচে মরে আছে কোনও রকমে ; মরে বেঁচে যাবার আশায় ওই কাশীতেই। সুদর্শন রায় একদিন অবশ্য জীবিত ছিলো, প্রতি মুহূর্তে জীবিত। এই মরার, এই আধমরার দেশে ঘা মেরে বাঁচাবার মন্ত্র সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো সে ; ময়ূর যেমন মেঘ হলে পেখম তোলার নিয়ে আসে প্রেরণা জন্ম মুহূর্তেই, কর্ণর অঙ্গে যেমন ঝলমল করত সহজাত কবচকুণ্ডল ; সুদর্শন রায় এই ভেজাল নাম আর পদবীর আড়ালে যে মানুষটা বাস করত ; করত একদিন, আজ

আর করে না, সেই মানুষটা ঠোঁটের কোণে তেমনই ভুমিষ্ঠ হবার লগ্নেই সঙ্গে করে এনেছিল নির্ভেজাল হাসি।

সুদর্শনের হাসিকে কেবল হাসি বলে ছেড়ে দিলে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'-কে আরেক খানি বই মাত্র বলার অপরাধ হয়; অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয়, প্রথম হুজন বাঙালী গ্রাজুয়েটের অন্যতম, মাত্র এই হয়ে দাঁড়ায়। সুদর্শনের হাসি,—আমি তো ছেলে মানুষ, কাশীর এই মহাভারতে যদি স্বয়ং কাশীরাম লিখতেন তা হলেও শক্ত হতো তার যথার্থ বর্ণনা করা; কারণ তা বর্ণনার বিষয় নয়; শোনবার বিস্ময়। উচ্চকিত উচ্ছ্বসিত সেই হাসি যেন শিবের জটা থেকে মর্তাভিমুখে অবতরণরত প্রাণগঙ্গার কলমন্ত্র রোল। হুঃখের বরষায় তার সেই হাসির দমকে মেঘ কেটে বেরিয়ে পড়ে সূর্যের প্রসন্নানন; জলে ধোয়া আকাশের বুকে ঝকমক করে বর্ষার রৌদ্রের পদ্মরাগমণি।

কিন্তু তবুও তা হাসি নয়; কান্নার মুখোশ মাত্র। একদিন সেই হাসির মুখোস সরে গিয়ে উন্মুক্ত না হলে তার অশ্রুমুখ; জীবনের মুকুরে না হলে প্রতিবিম্বিত,—সুদর্শন রায়ের কথা, কাশীর কথা বলতে বসে, লেখা সবচেয়ে সিয়েরিয়াস কলমেও বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি হতো? নিছক অবিমৃষ্যকারিতা ছাড়া কি হতো আর তা। সুদর্শন নয় কেবল। গোটা মানবজীবনটাই হাসি-কান্নার মুখোস মাত্র। কান্নাকে চাপবার কারণে মানুষের হাসি এবং পরের পতনে অন্তরের হাসিকে কুমীর-ক্রন্দনে আবরণ দেওয়ারই ছদ্মনাম জীবন। লাইফ ইজ এ ব্রিফ ক্যাণ্ডেল নয়; লাইফ ইজ এ লং স্ক্যাণ্ডাল। হাসিকে কান্না এবং কান্নাকে হাসি করার চেয়ে স্ক্যাণ্ডালাস আর কি আছে। আয়ুর বাল্‌ব কত ক্যাণ্ডাল পাওয়ার,—এ প্রশ্ন সেক্সপীয়ার সঙ্গত; মানুষের আয়ুর বাল্‌ব কত স্ক্যাণ্ডালপাওয়ার তাই হওয়া উচিত কিন্তু আসলে জীবনসঙ্গত জিজ্ঞাসা।

সুদর্শন রায়ের সঙ্গে সেবার দেখা কাশী যাবার পথে নতুন করে আবার। সুদর্শন সেই সুদর্শনই আছে। সেই হাসি সেই বেপরোয়া

বোহেমিয়ান সুদর্শন রায়—যার মতে বাঁচার উদ্দেশ্য মাত্র দুটি। একটি মদ; অপরটি মেয়েমানুষ। কিন্তু সেখানেও, সেই চরম অধঃপতনের পথে প্রথম অগ্রসর সুদর্শন রায়কে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। কারণ কোনটাই তার লুকোবার চেষ্টা নেই। বাইরে বৈরাগ্যের বেশ পরে আত্মীয়-অনাত্মীয়-ঘরে লুকিয়ে নোংরামী করার প্রবৃত্তি নয় তার; দুশ্চরিত্রতার সমস্ত রকম রাস্তা জানা থাকলেও ঘর নষ্ট করার মন্ত্রে তার অরুচি ছিলো। পরস্ত্রী, কুমারী, কি বিধবার সঙ্গে প্রণয় অনেক দূরের কথা; পরিচয় পর্যন্ত সে এগুতো না। কেন জানতে চাইলে, বলত সুদর্শন রায়ের দোষ অগুণতি; গুণ একটি। সে দুশ্চরিত্র পুরুষ; কিন্তু কোনও অবস্থাতেই কাপুরুষ নয়। তার প্রচুর মদ্যপান এবং প্রচুরতর সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গ সমাজের অভিধানে যাদের সংজ্ঞা পতিতা, তাকে নিশ্চয়ই সমাজের সেই সব জীবদের পরিভাষায় সর্ব্বনেশে লোক বলে অভিহিত করেছিলো অথবা করবে চিরকাল যারা ড্রিঙ্ক করেও মাতাল হয় কদাচ; এবং যারা সময়ে সরে পড়তে জানে বলে বড় বড় ঘরের বড় বড় স্ক্যাণ্ডালের জনক হওয়া সত্ত্বেও মরে যাবার পর ওবিচুয়ারি পায় প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রের আধকলম জুড়ে যার মধ্যে মোটা লাইন দাগানো কথাগুলো হচ্ছেঃ স্বভাব এবং আদর্শচরিত্রের গুণে তিনি ছিলেন সকলের অনুকরণযোগ্য।

ওবিচুয়ারি ঠিকই লেখে। যে সমাজে একদিন সবাই অন্যায় ছাড়া আর কিছু করতেই ভয় পেত না,—সে সমাজ নয়; যে সমাজে আজ কারুরই অন্যায় ছাড়া আর কিছু করতেই ভয়; সেই সমাজে এই জাতীয়, এই বজ্জাতীয় জীবেরাই যে সকলের অনুকরণযোগ্য বিবেচিত হ'বে, তা আর বিচিত্র কি।

সুদর্শন রায় অবশ্য চিরকাল এ রকম ছিলো না। তার ঘর ছিলো; মনের মতো ছিলো ঘরণী; এবং রাজকন্যার মতো এক মেয়ে। প্রচুর বিত্ত সেদিনও ছিলো; আজও যেমন আছে। সুদর্শন ছিলো সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপূর্ব ক'লকাতার মধ্যমণি। তার বাড়ি

ছিলো কালচারের পীঠস্থান। বারো বছর ঘর করবার পর তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে একদিন চলে যায় মেয়ের মাষ্টারের সঙ্গে। কেন যায় তা অন্য কেউ জানেই না, সুদর্শনের আজও পর্যন্ত তা অজানা। এবং চলে যাবার আগের মুহূর্ত্ত পর্যন্ত তার স্ত্রী, যার নাম দিলাম এখানে আলেয়া, এমনও কোনও কারণ ঘটায়নি যা থেকে, নাকি কল্পনা করা যায় এত বড় দুর্ঘটনার ভগ্নাংশ পর্যন্ত। মেয়ের যে মাষ্টার সে যে কেবল অর্থেই দরিদ্র তা নয়; স্বাস্থ্যেও হৃতসর্বস্ব। তার মধ্যে আট বছরের মেয়ের মা কি দেখলো তা সেই জানে; চলে যাবার পর তবেই ঘরের আনাচ-কানাচ থেকে বেরুতে লাগলো চিঠির টুকরো; প্রেমের প্রমাণ। সেই টার্ণ নিলো সুদর্শন। মদ আর মেয়েমানুষ; মেয়েমানুষ আর মদ। ডুবে গেল সে অধঃপতনের অতলে। জেগে রইলো তখনও কেবল তার যৌবনের ভগ্নাবশেষ,—হাসির ডগাটুকু।

কাশী যাবার ট্রেনে হঠাৎ দেখা সুদর্শনের সঙ্গে কত বচ্ছর বাদে বলা অসম্ভব; অর্থাৎ ইটস এজেস সিনস আই লাষ্ট স হিম। ফাষ্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার সুদর্শন নিয়ে গেলো তৃতীয় শ্রেণী থেকে হতভাগ্য আমাকে প্রতি মুহূর্তের চেকারতাড়িত হবার রিসকের মধ্যে। থার্ড ক্লাস থেকে আমাকে টানাটানি করে নামিয়ে নেবার আগে কিছুক্ষণ তাকে থাকতে হয়েছিলো গান্ধীর ক্লাসে বাধ্য হয়ে। সেখানে তখন জোর তর্ক চলছিলো মানত করার মানে হয় কিনা। একজনের মতে এর প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় হাতে হাতে। আরেজনের অভিমতে, এ সবই অন্ধ-কুসংস্কার নয় কেবল; নিজের স্বার্থের জন্যে পাঁঠা মানত করা রীতিমত নিষ্ঠুর পৈশাচিকতা। অন্য আরেকজন তর্কের ধার দিয়ে গেলো না; সে সুরু করে দিলো এক গল্প। মুহূর্তে কলহে রূপান্তরিত হতে পারত যা তা নেমে এল সাগ্রহ উৎকর্ণতায়। সবাই ঘেঁষে বসলো; গল্পবলিয়ের কাছ ঘেঁষে।

মা কালীর কাছে গেছে মধ্যবিত্ত উকিল বাপ ছেলের চাকরির জন্যে; সওয়া পাঁচ আনার পূজো দিয়ে বলেছেঃ আমার অবস্থা

পাড়ার বটু ঘোষের চেয়ে অনেক খারাপ ; শুনেছি সে পাঁচসিকের পূজো দিয়েছে ; মানত করেছে ছেলের চাকরি হলে জোড়া পাঁঠা দেবে ; তার কথা শুনো না মা ; তার ছেলের চাকরি না হলেও চলবে। তার পাঁচসিকে পূজোর জায়গায় আমার সোয়া পাঁচ আনা পূজো দেওয়াতেই তো বুঝছ যে আমার কি অবস্থা এবং আমার ছেলের চাকরি হওয়া কত দরকার। মা কালী বলেন ঃ তা যদি বলো তো তোমার পাড়ারই আরেকজন এসেছিলো আজ সকালে তার ছেলের চাকরির জন্যে ; সে এক পয়সার পূজোও দেয়নি ; মানতও করেনি এক কানাকড়ির কোন কিছু। অবস্থা ভেবে চাকরি দিলে তো তার ছেলেকেই দিতে হয়। উকিল খচে যায় সাঙ্ঘাতিক ; এডজোর্ণমেণ্ট গ্রাণ্ট না করা জাজের ওপর রাগের মতোই মা কালীর মেজাজের ওপর সব নির্ভর করে জেনে বিমর্ষ হ'য়ে চলে যাবার আগে স্বগতোক্তি করে ঃ তাহলে তোমার যা ইচ্ছে তাই করো! শুনে মা কালী কিন্তু রাগ করেন না ; ভক্তের প্রতি অনুরাগের একগাল হাসি হেসে বলেন ঃ তাই তো করি ; তোরা যে কেন মাঝ থেকে মানত মেনে মরিস, সেইটেই শুধু স্বয়ং মা কালী হয়েও আজও বুঝতে পারি না।

মানতের বিপক্ষে যারা তাদের হাসির গমকে অথবা ষ্টেশনে পৌছবার কারণে মনে নেই ট্রেণ থামতেই এক ঝটকায় আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে তার কামরায় তোলে সুদর্শন। যত বাধা দিই তত বলে চেকার ধরলে টাকার জন্যে ভাবনা নেই ; তার জন্যে আছে সুদর্শন রায়। বুঝি সুদর্শন কিছু বলতে চায় ; এমন কিছু যা বলা যায় না হাটের মধ্যে ; তাই চুপ করে যাই।

কিন্তু সুদর্শন রায় প্রথম শ্রেণীর অভিজাত নিভৃতে যেকথা প্রথমেই বলে সেকথায় আর চুপ করে থাকা যায় না, চমকে উঠতে হয়। সুদর্শন আমার দু'হাত চেপে ধরে বলে ঃ ও গল্পে কান দিও না ; মানত সত্য বলে জেনো ; মানতে কাজ হয়—! থাকতে না পেরে উচ্চকণ্ঠে না বলে পারি না ঃ দাও টু ব্রুটাশ ? মুহূর্তে সেকথা

চাপা দিয়ে সুদর্শন এবার আরো চমকে দেয়ঃ জানো, আলেয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার?—কোথায়? আমার কণ্ঠে কৌতুহলের বান ডেকে যায়। কাশীতেই একদিন দেখা হয়ে যায় সুদর্শনের তার বারোবছরের বিবাহিত জীবনের বৃন্তচ্যুত বউয়ের সঙ্গে। যেভাবে দেখা হয় তা বানানো গল্পের খাতিরেও বিশ্বাস করা অসম্ভব হোত। কিন্তু জীবনের কাছে জীবন্ততম উপন্যাসও অলৌকিকত্বে কিছু নয়। তাই। সুদর্শন এসয়ুস্যাল কাশীতেও ধর্মস্থানের চেয়ে অধর্মস্থানের প্রতিই আকর্ষণ অনুভব করে বেশী। পতিতালয় থেকে পতিতালয়ে বাঈজীর সুর থেকে সুরে; সুরার পাত্র থেকে সুরার পাত্রে সুরবিহার এবং সুরাবিহার করে বেড়ায় সুদর্শন। সেই সময়ে দালাল একদিন নিয়ে যেতে চায় তাকে এমন এক পতিতার কাছে যে পতিতা হয়েও নয় সম্পূর্ণ অধঃপতিতা। তার ইন্দ্রের ঈর্ষাযোগ্য সান্নিধ্য যা নির্ভর করে অর্থের ওপর নয়; তার মেজাজের ওপর। কৌতুহলী হয়ে যায় সুদর্শন। সুদর্শনের কথা ও দালালের মুখে শুনে দাঁড়ায় এসে সেই 'নহে মাতা নহে বধূ' উর্বশী সুদর্শনের সম্মুখে।

সুদর্শনের মুখ দিয়ে বেরোয়ঃ আলেয়া?

আলেয়া শুধু বলেঃ তুমি?

চুপ করে যায় সুদর্শন। আলেয়ার কথা চাপা দিতে মানতের কথাই তুলি আবারঃ সুদর্শন,—মানতের কথা কি বলছিলে? বলতে বলতে থেমে গেলে কেন? সুদর্শন হাসে! থেমে যাইনি; সেকথায় আসবার জন্যেই আলেয়ার কথা পেড়েছিলাম। তুমি এতক্ষণ ভাবছিলে মাল খেয়ে কথার খেই হারিয়েছি,—তাই না? সুদর্শনের খোঁচা গায়ে না মেখে জিজ্ঞেস করি! মানত করেছ কখনও?

করেছি,—বলে সুদর্শন। কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে মানত করেছিলাম—

কিসের জন্যে?

আলোয়ার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দেবার প্রার্থনা জানাতে

গিয়েছিলাম বিশ্বনাথের কাছে; বিশ্বনাথ তাঁর কথা রেখেছিলেন; এখন ভাবি কথা রাখার চেয়ে কথা না রাখাই তাঁর ভালো ছিলো—

কি মানত করেছিলে?—একটু চুপ করে থেকে জানতে চাই আমি।

চোখের জল! জবাব করে সুদর্শন রায়।

মানে?

প্রতিজ্ঞা করি, জীবনে কোনও বেদনায়, কোনও আঘাতে, কোনও বিচ্ছেদে কোনও দিন চোখ দিয়ে বার করব না এক ফোঁটা চোখের জল!

বলেই হা-হা করে পাগলের মত অর্থহীন হাসে সুদর্শন।

আমার কাছে সে মুহূর্ত তার হাসি কিন্তু অর্থহীন মনে হয় না। শুধু সুদর্শনের নয়; তার হাসির মধ্যে দিয়ে সকল কালে সব মানুষের হাসির অর্থ কুড়িয়ে পাই আমি। চোখের জল ঢাকা ছাড়া মানুষের হাসির অর্থ নেই আর কিছু।

॥ চার ॥

ভ্রমণ-কথাটার গোড়াতেই চোখে-না-পড়া-অসম্ভব দুটি অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে যা তা হচ্ছে ভ্রম। শুধু কাশী-কাঞ্চি-গোদাবরী প্রত্যক্ষ করবার কারণেই নয়; মনের ভ্রম, মানসিক সর্বপ্রকার বিভ্রম দূর করবার কারণেও বটে,—দূরের ট্রেণে চাপা চাই। ট্রেণই স্বাধীন ভারতবর্ষে আজ সব চেয়ে বড় ট্রেণিং-এর জায়গা। ট্রেণে চাপলে অন্য আর কোন ভুল না ভাঙ্গুক একটা ভ্রম যে কাটেই এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আজও,—স্বাধীন ভারতে যারা মনে করে যে ভারত ঠিক স্বাধীন হয়নি,—তাদের ভ্রম দূর করবার জন্যেই অন্ততঃ দূরপাল্লার ভ্রমণে ট্রেণে চাপা দরকার অথবা ভারত সরকারের টাকায় ট্রেণে চাপানো দরকার তাদের সর্বাগ্রে। বাসে ট্রামে চাপলেও হয়; তবে ট্রেণে চাপলে সব চেয়ে বেশী, সব চেয়ে আগে যে জ্ঞান অতি অবশ্যই হয়,—তা হচ্ছে, আমরা স্বাধীন হয়েছি। এরোপ্লেনের কথা বলতে পারি নে; আমরা যারা প্লেনে আছি তাদের কথা বলছি। উড়োজাহাজ কেন, শুধু জাহাজের কথাও বলতে পারা সহজ নয় আমাদের মতো যারা আদার ব্যাপারী তাদের পক্ষে। সেই স্বাধীন ভারতে পাবলিক ম্যানের কৃপায় আমাদের মতো পাবলিক যাদের সর্বাঙ্গ লিক করছে সর্বদাই তাদের ঠুলিপরা আঁখিপদ্মেও প্রতিভাত হয় নির্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল এ বার্তা, ট্রেণে পা দেবার মুহূর্তেই সে স্বাধীনতা তো বটেই স্বাধীনতার চেয়ে একটু বেশিই আমরা পেয়েছি নেহরুরাজের কৃতিত্বে। স্বাধীনতা পেয়েছে ঘানা; স্বাধীনতা পাবে আলজিরিয়া। আমরা কেবল স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট হইনি। স্বা-ধী-ন-তা-র সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে আমরা যে অপূর্ব বস্তু আজ লাভ করতে চলেছি তার নাম: তা-ধি-ন-তা!

স্বাধীনতা নয়; তা-ধিন্-তা-ই প্রত্যক্ষ করছি সর্বত্র। রাজনীতি থেকে সুরু করে ভায়া অর্থনীতি,—নীতিহীন নীতির সর্বক্ষেত্রে

নীতিকে বরবাদ করে জয়যুক্ত করছি যাকে জীবনের সর্বত্র তা ওই তা-ধিন্-তা-ও নয়। তা আসলে হচ্ছে তা দিন,—তা! অর্থাৎ যে তা দিতে জানার ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কপালে যোলো অশ্বশক্তির বাতাস নিয়ন্ত্রিত লেটেষ্ট মডেল ষ্ট্রীমলাইণ্ড কার,—আর সবাকার কপালে ঠিক সময়ে ঠিক তা না দিতে জানার কারণে অশ্বডিম্ব। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বলছে তাই; বলছে,—তা ধিন-তা! বলছে, —তেরে-কেটে-তাক! অর্থাৎ তেড়ে ধর; তু' কাণ কেটে ফেল; আর তাক্ কর! ঠিকই বলছে। অসংখ্য শহীদের ত্যাগে আসে স্বাধীনতা আর তাগে থাকে, তাগ করে থাকে ঠিক সময়ে গদিতে গদা হাতে বসবার জন্যে শহীদ সুরাবর্দীরা! কি পূর্ব কি অপূর্ব ফাঁকিস্তান।

ইণ্ডিয়া ছাট ইস ভারতের আজ সবাই স্বাধীন। সবচেয়ে বেশি স্বাধীন, ট্রামে, বাসে, ট্রেণে। না। ট্যাক্সিতে। কলকাতার রাস্তায় সন্ধ্যেয়, রাতে, অথবা কখনও কখনও দিনের আলোতেও এমন 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর'-পোজে আজকাল লোককে যেতে দেখেছি। স্ত্রীলোক সঙ্গে যে সন্ধ্যে হয়, ইভনিং ইন প্যারী না ইভনিং ইন ক্যালকাটা, রমণীয় বেশী কে। ভারতীয় ছবির পর্দ্দায় চুম্বন-দৃশ্য দেখান যায় না; হিন্দী ছবিতে যা-ও বা দেখানো যায় বাঙলা ছবিতে তা-ও না। অতি অধুনা ছবির বিজ্ঞাপনেও নিষিদ্ধ হয়েছে কোনওরকম উত্তেজক ইলাষ্ট্রেশান। কিন্তু ট্যাক্সিতে জোড়ায় জোড়ায় সুখের পায়রাদের সান্ধ্যবিহার আর বন্ধ হবার নয়। আমরা স্বাধীন হয়েছি যে। ম্যাসাজ হোম বন্ধ; হোটেলেও মাঝে মাঝে রেড হয়; অতএব রেড রোডের নির্জন অন্ধকারে ট্যাক্সিতে অল্পপরিসর বিবরে বেপরোয়া হও। ট্যাক্সি চালায় যে সে এতে আপত্তি করে না। আপত্তি করলে ট্যাক্সি চলবে কিন্তু মিটার চলবে না দ্রুত! এই রকম খদ্দের তার লক্ষ্মী এবং সরস্বতী তুই-ই। লক্ষ্মী কারণ পয়সা বেশি দিতে তার আপত্তি অল্প অথবা একেবারেই নেই; সরস্বতী কারণ তার কৃপায় বেবি ট্যাক্সির চালক সাংসারিক অভিজ্ঞতায় বেবি নেই আর।

এই এক আশ্চর্য্য দেশ! ছবিতে বিসদৃশ কিছু ঘটনার আগেই সেন্সার [হিন্দি ছবি না হলে]! কিন্তু ট্যাক্সিতে তার আসল ছবি আরও বিসদৃশ হোক, বলবার নেই কেউ! সেন্সার কর আর যাই কর,—স্বাধীন ভারতে যারা শাসন করছে আর যারা শাসিত হচ্ছে তাদের কারুর মধ্যেই আর সেন্স নেই। হ্যাঁ, সত্যিই বলছি ; No Sense Sir!

কলকাতার রাস্তায় যারা গাড়ি চাপে কেবল তারাই নয়, যারা পথ চলে তারাও স্বাধীন এতদূর যে গাড়ির শিঙা ফুকলে অথবা নিজের জীবনের শিঙা ফোঁকবার অবস্থা হলেও তাদের প্রাণে ভয় নেই এতটুকু। এমনভাবে তারা রাস্তা হাঁটে আজকাল যে মনে হয় রাজা-মহারাজা কেউ ফুলবাগিচার সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছে। এক্সিডেণ্ট হলে আজকাল গাড়ি পোড়ানো এবং গাড়ির চালককে আধমরা করাই রীতি। কিন্তু কলকাতার রাস্তায় গাড়ির দুর্ঘটনায় যারা প্রতিদিন পড়ে তাদের মধ্যে কতজন গাড়ী চালাবার দোষে আর কতজন পথ চলতে না জানার অথবা জেনেও বাহাদুরী করবার কারণে সেকথা বলা প্রশান্ত মহলানবীশের পক্ষেও রীতিমত শক্ত।

মোড়ে মোড়ে, 'রাস্তা পেরুবার সময় দেখে পেরুন' লিখে কার কাজ হচ্ছে কলকাতায় জানেন? স্কুলের ছাত্রদের! দশটার সময় যে ক্লাস হবার কথা, সে ক্লাসের ছেলেরা স্কুলে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে এগারোটায়। প্রশ্ন করলে মাষ্টারের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছে পথ চলবার নিশানা ; School Ahead ; Go Slow!

বেনারাসের কথা বলতে বেনারস এক্সপ্রেসের এত বাজে কথা কেন বলছি এ নিয়ে মাথাব্যথিয়ে কোনও লাভ নেই। ধানভানতে শিবের গীত থেকেই সাহিত্য শিল্প সঙ্গীতের জন্ম। ধান ভানতে বসে কেবল ধানই ভানলে মানুষের সঙ্গে কলুর ঘানির বলদের কোনও তফাৎ থাকত না। বেনারসের কথা লিখতে বসে কেবল বেনারসের

কথাই লিখলে তা বিনা রসের গোল্লা হয়; রসগোল্লা হয় না কিছুতেই। দীর্ঘপরিশ্রম করে নাটক লিখে নিয়ে একজন গেছে সমালোচকের কাছে। সমালোচক রায় দিয়েছেন : Its all work and no play. তাই কাশীর ঈশ্বর শিবের গীত গাইতে বসে ধান ভানছি যে আমি তাতে বৈয়াকরণদের বিধান ভাঙ্গছি বটে কিন্তু সেই সঙ্গে স্মরণ করছি 'বাজে কথা'র রবীন্দ্রনাথকে। তিনি বলেছেন, 'বলার কথা না থাকলেও বলতে যেজন পারে, ওস্তাদ সে সেলাম করি তারে।'

বার্ধক্যের বারাণসীর কথা বলার হচ্ছে বেনারস; বলার কথা আমার তার আগে বেনারস এক্সপ্রেস।

কারণ বেনারস এক্সপ্রেসেই আমার দাত্থর সঙ্গে দেখা। দাত্থর চেহারাটি বেশ। নবকার্তিক। চুল পেকেছে কিন্তু পড়েনি। থার্ড ক্লাসে যাবার সাজ নয়; রীতিমত সৌখীন। সকলের সমান বয়সী দাত্থকে নিয়ে আমরা মেতে উঠলাম। দাত্থর ঠিক উল্টো দিকে বসা নাতির বয়সী এক ছোকরা লাইটার জ্বালাবার চেষ্টা করছে বারবার তুরন্ত ঝড়ের মধ্যে। বারবার ব্যর্থ হয়। রবার্ট ব্রুসের ছাত্র বলে নয়; মার্কিন ট্রাউজার [নাইয়ের ওপরে যার ট্রাউজার বলতে কিছু নাই] পরা, বাঁহাতের কন্থয়ের কাছে রিসটওয়াচ বাঁধা, মুখে ম্যারিক্যান সিগ্রেটের কল্যাণে তার ভারতীয় ঠ্যাং ভাঙে তবু মচকায় না। দাত্থ অনেক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলেন; আমরাও। ফস করে দাত্থ চেন টানবার জন্যে হাত বাড়াতেই আমরা হা-হা করে উঠেছি; হাহাকার করে উঠেছি : কারণ কি? পঞ্চাশ টাকা ফাইন বিনা কারণে চেন টানলে তা জানেন?—দাত্থ রিটর্ট করেন : কিন্তু চেন টানছি এমনই নয়; কারণ আছে? কি কারণ? দাত্থ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সেই ছোকরাকে বলে : ভাই তুমি খুব হাওয়ার মধ্যেও সিগারেট ধরাতে পার আমি জানি; কিন্তু এখন তার দরকার নেই! আমি চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে দিচ্ছি, তুমি লাইটারটা জ্বালিয়ে নাও?—আমাদের হাসি আসবার আগে, পকেট থেকে

দেশলাই বার করে কাঠি জ্বালিয়ে এগিয়ে দেন দাত্থ এই নাও এই আগুনে লাইটারটা জ্বালাও—? নাও, নাও, লজ্জা কোর না।

ইতোমধ্যে দাতুর পায়ের ওপর একজন দাঁড়িয়েই আছে। দাতু অনেকক্ষণ বাদে বলেন : নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই বুঝি। দণ্ডায়মান ব্যক্তির ভ্রূক্ষেপও নেই দাতুর কথায়। রাগেন দাতু এবারে : চোখে কি অন্ধ গুঁজেছ না কি? আস্ত একখানা পায়ের ওপর দাঁড়িয়েও টের পাচ্ছ না; তাতেও যখন নেমে দাঁড়ায় না সেই লোক : তখন দাতু আর না পেরে বলেন : কি হে শুনতে পাও না না কি কানে?

বোঝা যায় এতক্ষণে; শুনতে পায়ই না কানে; সত্যিই পায় না। তাই পরের পায়ের ওপর দাঁড়িয়েছে; নিরুপায়। কিন্তু শুনতে সে পায় না সেকথা কাউকে বুঝতে দিতে চায় না; তাই বলে দাতুর মুখের দিকে লক্ষ্য করে : .আমাকে কিছু বলছেন?

দাতু বলেন : আজ্ঞে হ্যাঁ; আপনাকেই বলছি—

এবারে ভদ্রলোক আশ্বস্ত হয় : আমি ভাবছি, বুঝি আমাকে কিছু বলছেন?

ভদ্রলোক দাঁড়িয়েই থাকেন অতঃপর দাতুর পায়ের ওপর। দাতু সরিয়ে নেন না পা।

কিন্তু এরপর দাতু যা করলেন তা বলার অতীত।

সারা গাড়ি যাতে অধুনা অনির্দিষ্ট নোটিশ সর্বদাই ঝুলছে : ৬৪ জন বসিবেক; ১২৮ জন দাঁড়াইবেক; ২৫৬ জন বেঁকিয়া দাঁড়াইবেক, এবং ৫১২ জন ঝুলিবেক, সেই গাড়ির এক প্রান্তে একজন বসেছিল; সে উঠল একেবারে অপর প্রান্তের বাথরুমে যাবার জন্যে। অর্থাৎ South Pole থেকে North Pole! ভীড় ঠেলে, দাতুর কাছ বরাবর পৌঁছতে দাতু পথ আটকালেন। সে যত এগুবে; দাতু ততই কাছা চেপে ধরে। কি ব্যাপার। ভদ্রলোক বলে : ছাড়ুন দাতু—। দাতু নাছোড়বান্দা; আমরা সবাই মিলে দাতুকে বলি : ওকে যেতে

দিন বাথরুমে। দাহু সমান জোরে বলেন! না; যেতে হবে না—। আমরা পুনপ্রশ্ন করি! কেন, যেতে হবে না কেন? কেন আবার,—দাহুর উত্তর তৈরীই আছে: কারণ, যেতে যেতে, বাথরুম পর্যন্ত পৌঁছতে বেনারস এসে যাবে যে ভাই।

হাসির হররা ওঠে। যেরকম হাসি বাঙলা ছবিতে সব চেয়ে করুণ দৃশ্যে উত্তম অভিনয় ছাড়া হাসা অসম্ভব!

কাশীতে যে-হোটেলে উঠব বলে ঠিক করেছিলাম সে-হোটেলের একজন পার্মানেণ্ট বোর্ডারের নামে পরিচয় পত্র দিয়েছিলো যে তার নাম ইয়ে মল্লিক। ইয়ে মল্লিক হচ্ছে রিডার্স ডিজেষ্টের ফিচারের ভাষায়: দ্য মোষ্ট আনফরগেটেবল ক্যারেক্টর আয়াভ এভার মেট। তার চিঠি নিয়ে কাশীর গ্র্যাণ্ড হোটেল যেটি সেটিতে ঢোকবার মুখে দেখি রাস্তার ওপর রকেই হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে বসে আছে একজন। চিঠি বার করে জিজ্ঞেস করি; এখানে জ্যোতিষ দত্ত রায় বলে কেউ থাকেন? চিঠির ওপর আবার চোখ নামাই; জ্বলজ্বল করছে সেখানে ইয়ে মল্লিকের হস্তাক্ষরে: জ্যোতিষ দত্ত রায়। জ্যোতিষ দত্ত রায় বলে এ হোটেলে কেউ থাকে না শুনে আশ্চর্য হই না যে তার কারণ ওই ইয়ে মল্লিক। আমি নয়; ইয়ে মল্লিককে যারাই চেনে তারাই আশ্চর্য হবে না কেউ। আর ইয়ে মল্লিককে কলকাতায় চেনে না কে? ক্রম টালা টু টালিগঞ্জ? বালি টু বালিগঞ্জ? চেনে অবশ্য ইয়ে মল্লিক বলে নয়; চেনে,—ইয়ে মামা। ইয়ে মামা য়ুনিভার্সাল মামা। তার ছেলে তাকে কি বলে ডাকে জানি না, আর সবাই ডাকে মামা বলেই; বেশির ভাগ ইয়ে মামা বলেই।

সেই ইয়ে মামা একা নয়; তার বাড়ির সবাই এক ব্যাপারে বিস্ময়ের ব্যাপার। কেউ নাম রাখতে পারে না কারুর। ইয়ে মামাদের বাড়ির সবাইকেই লোকে, এমন কি স্ত্রীলোকেও, এক কথায় ইয়ে মামার বাড়িকেই তারা ইয়ে মল্লিকদের বাড়ি বলে

অভিহিত করে থাকে। করার কারণ, কেউ নাম মনে না করতে পেরে, 'ইয়ে' দিয়েই কাজ সারে। তারই ফলে সেই বিখ্যাত বাড়ি। সেখানে জজ আছেন, উকিল, ডাক্তার, এমনকি ভারত-বিখ্যাত আবিষ্কারকও এবাড়িতে অতীতে এসেছেন একবার। নাম করবার মতো এই সব লোকেরাও কিন্তু অন্যের নাম করার বেলায় নাম ভুলে গিয়ে, 'ইয়ে' দিয়ে ইসারায় সারে সব। নিজেদের বাড়ির লোকেদের নামও মনে থাকে না এদের।

ইয়ে মল্লিকদের বাড়িতে নিম্নলিখিত সংলাপ প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘুর্ঘনা!

—এই যে ইয়ে, ইয়ের কিছু হলো?

—না, ইয়ের এখনও ইয়ে কিছু হয় নি—

—ইয়ের কাছে যে নিয়ে গিয়েছিলে ইয়েকে তা ইয়ে কি বলল?

—ইয়েকে পরীক্ষা করে ইয়ে বলল যে ইয়ের এখন ইয়ে হতে কি বলে গিয়ে বেশ কয়েক ইয়ে দেরী আছে!

এমন লোকদের একসঙ্গে বারোমাস যে বাড়িতে বাস তাকে লোকে ইয়ে মল্লিকদের বাড়ি বলবে, এ আর বিচিত্র কি!

ইয়ে মামার চিঠির ওপর চোখ বুলিয়ে বুঝি, নাম ভুল করেছে ইয়ে মামা। তখন ইয়ে মামার মুখে শোনা হোটেলের সেই স্থায়ী বাসিন্দার হুবহু বর্ণনা দিতে, রকে বসা হোটেলের সেই ভদ্রলোক বলেন: আপনি যাকে খুঁজছেন, তার নাম ক্ষিতীশচন্দ্র সেন; জ্যোতিষ দত্ত রায় নয়। কে পাঠিয়েছে আপনাকে চিঠি দিয়ে? ইয়ে মামা?

নীল আকাশ থেকে বাজ পড়লে অথবা জহরলালের মুখে: 'পাকিস্তান অন্যায় করেছে,' শুনলেও এতটা স্তম্ভিত হতাম না।

আমাকে বাক্যাহত অবস্থা থেকে উদ্ধারের আশায় আবার শক দেন রকে বসা ভদ্রলোক: ইয়ে মামা, কেউ হয় আপনার?

আজ্ঞে না, আমি বলি: এক পাড়ায় থাকি; মামাদের বন্ধু, তাই ইয়ে মামা বলে ডাকি—

আপনার নাতির এক গেলাসের হলেও, আওনি ইয়ে মামা বলেই ডাকতেন! এবং আমার বাবা বেঁচে থাকলেও ইয়ে বলে ডাকতে গিয়ে; ডাকতে পারতেন না; মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতই, —ইয়ে মামা—

রকে বসা হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা, ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করি : ইয়ে মামাকে কতদিন চেনেন আপনি ?

তা ইয়ে দীর্ঘকালের, জবাব আসে; কি রকম আলাপ তাহলে বলি শুনুন—

ভদ্রলোক বলেন; আমি শুনি।

ভদ্রলোক বলেন : কাশীর এই গ্র্যাণ্ড হোটেলে এসে উঠেছেন আপনার চুড়ো মামা সেবার। একদিন সকালে আপনাদের ইয়ে মামার ঘরে ঢোকবার আগে, সারপ্রাইজ দেবার জন্যে ইয়ে মামার ভাল নাম ধরে ডেকেছি। বিমলচন্দ্র মল্লিক আছেন ?—বলব কি মশাই,—ইয়ে মামা এসে ঘাড়ের ওপর বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে চুমু খেয়ে অস্থির।

কী ব্যাপার ?—আমি জিজ্ঞেস করি।

বাঁচিয়েছিস ভাই—ইয়ে মামা বলে।

কি রকম ?

এই ছাখ, বলে একটা ফর্ম দেখায় ইয়ে মামা;—খাটের ওপর পড়েছিল ফর্মটা। তুলে নিয়ে বলে—এখানে সই দিতে বলেছে; নিজের পুরো নাম—কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না, আজ তুই আমার ভালো নাম ধরে ডাকতে আমার মনে পড়ল; তুই বাঁচালি ভাই!

রকে বসা ভদ্রলোকের গল্পের নটেগাছ কিন্তু তখনও মুড়োয়নি। তিনি বলেন : এর পরেও আছে। ইয়ে মামা ফর্মে নাম সই করতে গিয়ে থেমে গেল আবার; ফর্ম থেকে চোখ তুলে আমাকে জিজ্ঞেস করল : এই ইয়ে, আমার ভালো নামটা কি যেন বললি রে—!

॥ পাঁচ ॥

কাশীতে পা দেবার আগে ট্রেনে আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল, আরেকটি দুর্ঘটনা,—যে কথাটা না বলে নিলে এখানে আর বলবার স্কোপ পাওয়া যাবে কি না বলা শক্ত। কাশীযাত্রার কাহিনী যেমন বিচিত্র কাশীযাত্রীর ভ্যারাইটিও তেমনই কম নয়। ধর্মের ষণ্ডের এবং অধর্মের পাষণ্ডের এই কাশীতে একই সঙ্গে এক গলিতে এমন গলাগলি করে বাস যে কাশীতে কেবল নিরামিষভোজীদেরই একচ্ছত্র অধিষ্ঠান এমন মনে করলে কাশীর প্রতি না হক কাশীযাত্রীদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনের দোষ হবে। কাশী কেবল ধার্মিকদের তীর্থ নয়; অধর্মের বিদ্যালয়ে যারা আজীবন সতীর্থ কাশী তাদেরও সমান আকর্ষণ ক্ষেত্র। কাশী বিশ্বনাথের; বিশ্বের যতেক অনাথের, কাশী ধর্মের ষণ্ডের এবং অধর্মের পাষণ্ডের। কাশী কেবল গলির নয়; বরুণা এবং অসির, পুণ্যের করুণা এবং কলঙ্কের মসির একই-সঙ্গে গলাগলির এই কাশী। আলোছায়ার; মেঘ ও রৌদ্রের; রাগ ও অনুরোগের; সাদা-কালোর; হাসি-কান্নার হীরাপান্নায় গাঁথা এই কাশী কেবল ভারতের নয়; মহাভারতের। যে মহা-ভারত একা পাপের অথবা পুণ্যের ক্ষেত্র নয়; কুরু-পাণ্ডবের দ্বন্দ্বে আলোড়িত মানবজীবনের মহৎ কুরুক্ষেত্র। যে মহাভারতে দুর্য্যোধনের পরাজয় আর যুধিষ্ঠিরের জয় কালের বিচারে তুল্যমূল্য। কাশী, আজকের এই মহাভারতের সঙ্গে স্মরণের এক প্রত্যুষ-প্রদোষের মহাভারতের, শেষ সেতু; অশেষ যোগসূত্র।

এবং কাশী যদি না হত তাই তাহলে কাশীকাণ্ড হত প্রকাণ্ড একটা মিথ্যা। বর্তমান কলম অন্ততঃ উদ্যত হত না এই কাশীর ইতিবৃত্ত গ্রন্থনে। কাশী ভাল এবং মন্দের; শুভ এবং অশুভের, সুন্দর এবং অসুন্দরের। কাশী জ্ঞানী এবং মূঢ়ের; রাজা এবং প্রজার; অন্নপূর্ণের এবং নিরন্নের। কাশীর যিনি অধীশ্বর তিনি শুধু শিব নন;

তিনি নটরাজ। তাঁর নৃত্যোন্মত্ত এবং দুপায়-এর দিকে যদি তাকাই তবে দেখব জীবন এবং মৃত্যু, আনন্দ এবং বেদনা, বিচ্ছেদ এবং মিলন অমৃত এবং হলাহল একই সঙ্গে, একই অঙ্গে এত অপরূপ যা বিশ্লেষণের বিষয় নয়; যা ব্যাখ্যার অতীত; যা মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝবার নয়; অন্তরের অন্তস্তলে বার বার বাজবার।

যার এক ঘাটের প্রাচুর্য্য অতিরিক্ত আর আরেক ঘাটের অবস্থা অতিরিক্ত তারই নাম কাশী।

এই কাশী এক প্রান্তে রৌদ্রালোকিত দ্বিপ্রহরেও অসংখ্য অন্ধগলিতে নিশীথ রাত্রির নিঃসীম অন্ধকার। অন্যপ্রান্তে উত্তর-অবাহিনী গঙ্গার দুতীরে দুবেলা অনাদি অন্তকাল থেকে জবাকুসুম-সঙ্কাশ কত কোটি কোটি দিবাকরের উদয়-অস্ত মহিমায় এই পুণ্যভূমি অনিমেষলোচন। জলের অতল থেকে এর ঘাটে ঘাটে উঠে গেছে আকাশ-উদ্ধত শির প্রসাদ আর মন্দিরচূড়া। শাঁখ কাসর ঘণ্টা ধূপধূনা চন্দন-চর্চিত এই কাশীতেই অনতিদূরে শ্রুত হচ্ছে শিল্পীর পায়ে সুরের আলাপ; অসুরের কানে তা বহন করে আনার বদলে সঙ্গীতের সুধা ধ্বনিত করছে কলুষ কামনার বিরামহীন নূপুরনিক্কণ। এই সেই কাশী যেখানে নিত্যকালের উৎসবলোকে বিশ্বর দীপালিকায় চলেছে অন্নকূটের উৎসব, আর তার একটু দূরেই পড়ে রয়েছে অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত কত ত্রৈলঙ্গ, কত বিজয়কৃষ্ণ, কত নিজের পরিচয় দিতে পারাঙ্‌মুখ মহাত্মার শব।

এই কাশী যাবার পথেই ট্রেনে আমার সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা—যার কথা যথাসময়ে আমার লেখা হয়নি। ভদ্রলোকের নামধাম কোনটাই জানিনে; জানলেও জানাতে পারতাম কি না বলা শক্ত। এবং হেরম্ব মৈত্র না হয়েও আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলতে বাধ্য হতামঃ জানি; কিন্তু বলব না। মিথ্যে বলতে পারিনে, এ কারণে নয়; কারণ, কারণে অকারণে কেবল মিথ্যেই এখনও বলতে পারি; আর কোনও কথাই বলব-বলব করেও বলে উঠতে পারিনে; কখনও আইনের ভয়ে কখনও লোকে, না কি স্ত্রী-

লোকে কি ভাববে সেই ভয়। আমি যে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। আমি যে বাঙালী। ভগবান আছেন কি না জানিনে; থাকলে, আমার একটি কথাই জানাবার আছে: বারান্তরে বাঙালী করে পাঠিও না; পাঠালে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক করে পাঠিও না।

মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোক আজ বিধাতার অভিশাপ ছাড়া আর কিছু নয়। আজ পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি বলে কিছু নেই; যা আছে তার নাম হওয়া উচিত আজনীতি। যদিও নীতির সঙ্গে আজ আর কি ব্যক্তির, কি জাতির, কি যুগের কিছু মাত্র যোগ নেই, তবুও একে বলছি যে আজনীতি; তার কারণ এ নীতির ইংরেজি মরাল নয়; পলিসি। একদিন আমাদের রাজনীতিতেও অনেষ্টি ইস দ্যা বেষ্ট পলিসি বলত; আজনীতি আজ বলে ডিসনেষ্টি ইস দ্যা বেষ্ট পলিসি। কেবল কংগ্রেস বলে যে তা নয়; দেশের যারা ডিসগ্রেস তারাও বলে; অর্থাৎ সেই লেফটিষ্ট পার্টি বলে যারা পরিচিত হতে চায় পশ্চিম নয় পশ্চাৎ বঙ্গে, এবং আসলে যারা সার্কাস পার্টির চেয়েও অধম; কেন না সার্কাস পার্টিতে দু'-একটা বাঘ-সিংহ এখনও থাকে কিন্তু রাজনৈতিক সার্কাস পার্টিতে পশ্চিমবঙ্গে যারা নেতা, অর্থাৎ অভিনেতা, তারা কেউ বাঘ-সিংহ নয়; কেবল ক্লাউন। বামপন্থী নয়; আমাদের যারা বামে তারা আসলে বামপন্থী। আমাদের লেফটিষ্টরা বিশ্বাসে নয়; এক্সিডেণ্টে লেফটিষ্ট। দুর্ঘটনায় ডান হাত কাটা গেলে যার, ল্যাটা হতে বাধ্য হয় তাদেরই মতো কংগ্রেসে ঢুকে গদিতে আসীন হয়েই গদা ঘুরোবার সুযোগ পায়নি যারা তারাই এদেশে লেফটিষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে নয়; সারা ভারতবর্ষের যারা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক তাদের সেই গল্পের পাতা জলে পড়ে কুমীর হয়েছে—নাম কংগ্রেস; ডাঙায় পড়ে হয়েছে বাঘ; নাম লেফটিষ্ট; আধখানা জলে এবং আধখানা ডাঙায় পড়লে কি হতো তারই উত্তর দেবার জন্যে নির্বাচনের মুখে দেখা দেবে স্বতন্ত্র পার্টি; পেঁয়াজের খোসা ছাড়ালে, কম্বলের লোম বাছলে, ভারতবর্ষ নামে এক গাঁয়ের ঠক বাছলে যা থাকে মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের ইতিবৃত্ত

থেকে প্রত্যাহার, প্রতিমুহূর্তের 'জ্বালা' বাদ দিলে, বরবাদ করলে তার চেয়ে খুব বেশি থাকে কি ? না। আজকের ভারতবর্ষে বাঙালী হয়ে জন্মানোই একটা অপরাধ ; তারপর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক হয়ে আসাটা গোদের ওপর বিষফোড়া ; বোঝার ওপর শাকের আঁটি ; অথবা তার চেয়ে একটু বেশাই,—ভারতবর্ষের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যপীড়িত প্রদেশ, এই বাঙলার জনসাধারণের স্কন্ধে একগাদা। [কম্পোজিটরের কাছে নিবেদন, 'দার' জায়গায় 'ধা' করবেন না যেন ; করলে বর্ত্তমান লেখকই বিপদে পড়বেন ; কেন না 'দা'র জায়গায় 'ধা' পড়লে, যা দাঁড়ায় এরা সত্যিই তাই ; উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দেবার ক্ষেত্রে এদের লালফিতাও হঠাৎ শম্বুগতি ত্যাগ করে ; তাই] মন্ত্রীর ওপর আবার গাদা গাদা উপমন্ত্রীর সঙ্গেই বোধ করি তার একমাত্র তুলনা চলে।

লক্ষ্য করবেন, শুধু বাঙালীর কথা বলছি না ; মধ্যবিত্ত বাঙালী 'ভদ্রলোক'-এর কথা বলছি। শুধু বাঙালী বললে 'ভেগ' কথা বলা হয়। কারণ স্যার অমুকও বাঙালী ; আবার মাসিক পাঁচ হাজারী চাকরে ভুলেও যে বাড়িতেও একটা বাঙলা কথা বলে না, কাঁটাচামচে ছাড়া খায় না, যাদের ছেলেমেয়েরা বাবাকে ড্যাডি, মাকে মামমি ছাড়া ডাকে না ; ঠাকুরের বদলে বাবুর্চি ; চাকরের পরিবর্তে বয় ; জলযোগের জয়গায় ব্রেকফাষ্ট মধ্যাহ্নাহারের বিকল্পে লাঞ্চ এবং নৈশাহারের নামে ডিনারই যাদের রেওয়াজ, আদমসুমারীতে তারাও বাঙালী ছাড়া আর কোন [বজ,] জাত বলুন ? আবার আপনি তিনি আমি, আমরাও বাঙালী, আমরা যারা বিত্তহীন এর লজ্জা ঢাকবার জন্যে নিজেদেরকে বলি মধ্যবিত্ত ; আমরা যারা, আজ বাঙলা মাসের কত তারিখ জিজ্ঞেসা করলে বলি, জানুয়ারী এত তারাও তো, 'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়' তাদেরই বংশধর।

বড়লোক এবং একেবারে নীচতলার লোক এদের কারুর কথাই নয় ; কারণ এদের কাউকেই ভদ্রলোক সাজতে হয় না। তাই

এদের একদলের জ্বালা বলতে বুঝি, জালার মতো ভুঁড়ি নিয়ে সহজে চলতে ফিরতে না পারার জ্বালা; আর আরেকদলের কার্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক ছাড়াই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের জ্বালা ভুলতে সন্ধ্যেবেলায় তাড়ির জালার পাশে গিয়ে তাড়াতাড়ি বসতে না পাওয়া। এরা সব কালে সব দেশে সব প্রদেশে,—এক; এদের কথা নয়। এদের কথা বলবার জন্যে আমাদের দেশেও কংগ্রেস আছে; কম্যুনিষ্ট আছে। যাদের কথা বলবার জন্যে কেউ নেই, আমি সেই মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের কথা বলছিলাম। তাদের জ্বালাই রিয়্যাল জ্বালা; দাঁড়কাকের ময়ূর সাজতে যাওয়ার যেমন জ্বালা। বিত্তহীন হয়েও মধ্যবিত্ত সাজার কাটা ঘায়ে, ভদ্রলোক হবার নুনের ছিটের মর্মান্তিক জ্বালা।

বড়লোকের বিয়েবাড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণের ক্রটিই নয় শুধু; নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে, আমাদের অবস্থার অতিরিক্ত মূল্যের প্রেজেণ্টেশান বাগিয়ে নিয়ে এককাপ কফি আর একমুঠো কাজু বাদামের বড়লোকী কার্পণ্য পর্যন্ত আমরা মার্জনা করি। কারণ আমরা যে মধ্যবিত্ত, আর ওঁরা যে বড়লোক। সর্বহারাদের বস্তির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন একবার দয়া করে। তাদের ছেলেমেয়ে দুই-ই আছে। কিন্তু অন্নপ্রাশন, উপনয়ন নেই। বিবাহ আছে, কিন্তু পণের টাকা অথবা লোক খাওয়াতে উদ্বাহবন্ধনের উদ্বন্ধনে পরিণত হবার কোনও রেকর্ড নেই। মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের দিকে অর্থাৎ নিজের দিকে তাকান অতঃপর। ভিখারীর চেয়েও দুরবস্থা [না কি, জায়গায়, একটি জায়গায়,—দুরাবস্থা, ব্যাকরণ অসঙ্গত হয়েও জীবনসঙ্গত হবার কারণে বিদ্যাসাগর-বারণ সত্ত্বেও আর্য প্রয়োগ] যে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের তার অবস্থা বর্ণনার অতীত। ভিখারীর আছে তবু তার চাইতে লজ্জা নেই; মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নেই, তবু দিতে না পারার আছে দুস্তর লজ্জা।

মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের নেই কি? ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশন

থেকে আরম্ভ করে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত একগাদা পয়সার [ধার করে ; বাঁধা দিয়ে ; ভিক্ষে এবং চুরি হলেও] শ্রাদ্ধ করা, কারণ এসবই তার পরিবারের মতো, জীবনে একবার তো, বার বার নয়, অতএব। বার বার মরা, শ্রাদ্ধ যে একবারই এ তো অভ্রান্ত বেদবাক্য ; এসন্দেহ যার সে নয় মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোক। এর ওপর আছে। ছেলেমেয়েকে পড়িয়ে শুনিয়ে, বিবাহ দিয়ে ছেলেমেয়ের বাপ করে আবার মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোক না তৈরী করা পর্যন্ত যার রেহাই নেই, কেবল সেই তো আদি ও অকৃত্রিম বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। অধুনা আবার তার ছেলেমেয়েদের কিণ্ডারগার্টেনে না পড়ালে, যেখানে, মাইনে মাসে বিশ, সিণ্ডেরেলা প্লের জন্যে ড্রেস বাবদ অতিরিক্ত পঞ্চাশ, ছ্মাস, বড়জোর তিন মাস অন্তর, তেইশখানা খাতা। ছেচল্লিশখানা বই, এবং পড়া শেষে বাঙলা না শেখার কারণে বাঙালী ছেলেমেয়ের বুড়ো বয়সে আবার বাঙলা শেখানোর জন্যে প্রাইভেট ট্যুটার মারফৎ কেঁচে গণ্ডুষ।

বাঙালীর অধঃপতনের এই চিত্র যখনই আমার আঁখিপদ্মে প্রতিভাত হয় তখন অতীত বাঙালীর প্রাতঃস্মরণীয় কীর্তির কথা মনে পড়ে না। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, স্যার আশুতোষ। কারুর কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের কথা অবশ্য মনে পড়ে ; মনে পড়ে, তিনি সাত কোটি সন্তানকে একদা বাঙালী না করে মানুষ করতে চেয়েছিলেন, আজ বেঁচে থাকলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর কথা প্রত্যাহার করে বলতেন : মানুষ না করে তাদের আবার বাঙালী করে দাও। মানুষ হতে গিয়ে সাত কোটি আড়াই কোটিতে এসে ঠেকেছে ; অবিলম্বে আবার বাঙালী হতে না পারলে আড়াই কোটি দূরের কথা ; কটিদেশে কাপড় পর্যন্ত আর থাকবে কি না বলা শক্ত।

কাশীর কথা উঠলে আমার যেমন ত্রৈলঙ্গ, শ্যামাচরণ, অথবা গোপীনাথ কবিরাজের কথা অতি অবশ্যই মনে জাগে বটে কিন্তু তার আগে, অনেক আগেই যার কথা মনে না হয়ে পারে না, তিনি অখ্যাত অবজ্ঞাত কাশীর দিদিমা। তেমনি আজকের অধঃপতিত বাঙালীর

কানে নবজাগরণের বাণী উচ্চারণ করবার কালে যাঁদের জয়ধ্বনি করি তাঁরা নিশ্চয়ই রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং সব শেষে উল্লেখ করলেও সর্বপ্রথম, সর্বপ্রধান বাঙালী রবীন্দ্রনাথ ; কিন্তু তাঁদেরও, অর্থাৎ এই সব প্রাতঃ স্মরণীয় পূর্বসূরীদেরও পূর্বে যার কথা, যার জয়ধ্বনি আমার জিহ্বায় সর্বাগ্রে ডানা ঝাপটায় সে একজন কুখ্যাত সুজ্ঞাত গুণ্ডা। তার নাম বেয়াকুফ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক আগে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সেকালে বিধানসভায় এবং উত্তমকুমার ছবির পর্দায় হাজির ছিলেন না ; ন্যু এম্পায়ারের শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে নব্যনাট্যান্দোলন, নাটকের বদলে আলোক-আভা-সম্পাত অথবা স্বাধীনতার দাম মাত্র আট পয়সা হয়নি তখনও ; সেই যে কালে একটি অক্ষরও না জেনে এদেশে কাগজের সম্পাদক কিংবা চিরস্থায়ী সহকারী সম্পাদক হওয়া চালু হয়নি অথবা যখন লোকে চুরি করলে জেল খাটত, কিন্তু তখন জেল খাটলে চুরি করার অক্ষয় অধিকার অর্জন করত না ; একুশ বছর বয়স হলেই ভোট দিতে পারার একুশে আইন যেদিন চালু হয়নি ভারতবর্ষে ; অথবা হিন্দু স্ত্রীর বিবাহ যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন [?] দেশে জীবনে একবারই হত,—বার বার হতে পারত না সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে বেয়াকুফের নাম আজকের দিনে কোনও রাজনৈতিক নেতার চেয়ে কম কুখ্যাত ছিল না।

ধর্মতলায় অধর্মের হেডকোয়ার্টার ছিল বুদ্ধিমান বেয়াকুফের। কলেজ স্কোয়ারের আশেপাশেই যেমন লেখক-প্রকাশক-পাঠকদের প্রাণকেন্দ্র, কারণ এদেশে ওই তিনপ্রকার লোকেরই [স্ত্রীলোকের কথা বলছি না ; আমার ঘাড়ে একটাই মাথা] প্রায়ই কলেজের সঙ্গে কোনও রকম যোগ ছিল না ; এখন নেই, ভবিষ্যতে থাকবে কিনা বলা শক্ত ; তেমনই অধর্ম করবার জন্যে ধর্মতলার চেয়ে উপযুক্ততর নামের রাস্তা, যেখানে গলির নাম ইংরেজী ষ্ট্রীট, ষ্ট্রীটের বিকল্প এভেন্যু, পাঁচতলা বাড়ীর নাম স্কাইস্ক্র্যাপার, মেসের লেটারহেডে ম্যানসন, এক ছটাক ওপেন স্পেসের পরিচয় পার্ক, বেকারের ক্রিডেন্সিয়াল ফ্রিলান্স

জার্ণালিষ্ট। পুরস্কারের অথবা পেনসনের প্রত্যাশায় সরকারের পদলেহনকারীর নাম সাহিত্যিক ; এবং নোটলেখা, খাতা না দেখে নম্বর দেওয়া, অন্য কলেজে পার্টটাইমএটেণ্ডেন্সএবংপ্রইভেট ট্যুসানের কারণে ইউ-জি-সি গ্রাণ্টপ্রাপ্ত কালেজে আসলে লেকচারার কিন্তু কমান্ এরারের মহিমায় অধ্যপকের বিজ্ঞাপন যেমন এডুকেশানিষ্ঠ বলে, সেই এই কলকাতায় সেদিনও ছিলো না ; আজও নেই।

সেই সে কলকাতার কুখ্যাত গুণ্ডা বেয়াকুফের কাছে গেছেন সেদিনকার এক সওদাগরী অফিসের বড়বাবু। ডেলী প্যাসেঞ্জার সেই ভদ্রলোক বড়বাবু হবার পর ইণ্টার ক্লাস ছেড়ে সেকেণ্ড ক্লাসে পা দিয়েই বিপদে পড়েছিলেন। প্রায়ই সাহেবরা সেদিন সেকেণ্ড ক্লাসে বাঙালী কালাচামড়াদের আশা করত না ; যদি দৈবাৎ কেউ তাদের সহযাত্রী হত তো তাদের তামাশা করত। নির্দোষ তামাশা নয় ; থুতু, পা তোলা, কখনও কখনও গায়ে হাত তোলাও ছিলো, এই বিনে পয়সার তামাশা দেখতে কখনও কখনও ভীড় করত যারা, স্বজাতির হেনস্থায় সব চেয়ে সুখী সে [বজ]-জাতের নাম বাঙালী, তাদের ফাউ ; অর্থাৎ অতিরিক্ত আইটেম। আমাদের কাহিনীর নায়িকা [!] ভীরু বড়বাবু যে গাড়ীতেই উঠতেন, বিশেষ দুজন সাহেব খুঁজে খুঁজে সেই কামরায় উঠে রোজ রোজ সেই একই পালার পুনরাবৃত্তিতে উগ্রত হত নিঃসঙ্কোচে। বড়বাবু টাইম পালটেও সুবিধে করতে না পেরে এলেন ধর্মতলায় বিখ্যাত বেয়াকুফের কছে।

বেয়াকুফের এই বিখ্যাত আড্ডা সেদিন কলকাতা শহরে কারুর অজানা ছিল না ; সম্ভবতঃ পুলিশের ছাড়া। পুলিশের ছাড়া এইজন্যে বলছি যে আজকের কলকাতাতেও তাহলে লালবাজার সত্ত্বেও কেন তবে কালোবাজারের জয়যাত্রা অব্যাহত। কালোবাজারের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কারণ কালোবাজার প্রকাশ্য বাজার নয় বলেই সব সময় হয়ত লালবাজারের পক্ষে তার গায়ে হাত দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রকাশ্যে যেসব বেআইনী বাজার বসে তার সম্পর্কে আমরা জানি ; কিন্তু লালবাজার নিশ্চয় জানে না। উজ্জ্বল উদাহরণ

কলকাতাময় ছড়িয়ে। খুব সম্প্রতি লেডি চ্যাটার্লীর লাভার শ্লীল বলে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশ তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে, আপনারা জানেন। কিন্তু সেই সব নিষিদ্ধ পুস্তক যা প্রকাশ্যেই অশ্লীল তা হলে কি করে সুরেন বাঁড়ুজ্জে রোড ধরে কর্পোরেশনে বাড়ীর লাল ভংগে প্রকাশ্যে দিনের পর দিন 'বিক্বত' হয়? এই সব ষ্টলে সেক্সপীয়ারের বই বিক্রীত হবার জন্যে গাদা করা থাকে; কিন্তু বিক্বত ·হবার জন্যে যারা এখানে আসে তাদের দেখেই দোকানদার ফিসফিস করে বলে: সেক্স বুক চাই বাবু? যে কেউ কোনও দিন সন্ধ্যায় এখানে গিয়ে এক মিনিট অথবা এক মিনিটও নয়, দাঁড়ালেই জানতে পারেন? কিন্তু পুলিশ নিশ্চয়ই জানে না; জেনেও পুলিশ কিছু বলবে না অথবা জানি কিন্তু বলব না—বলার মত কিছু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যাক্তি নন পুলিশও।

ছায়াছবির অশ্লীল পোষ্টার নিয়ে হৈ-হৈ-এর শেষ নেই অথচ এই কলকাতার প্রকাশ্য দিবালোকে, সন্ধ্যার অন্ধকারে, নির্জন রাস্তায়, ভীড়াক্রান্ত আলোকোজ্জ্বল রাজপথেই কখনও বা, ট্যাক্সিতে সে অবস্থায় যেতে-আসতে দেখা যাচ্ছে নরনারীকে, তা কি অশ্লীল পোষ্টারের চেয়ে কম জীবন্ত? ম্যাসাজ হোম বন্ধ হয়েছে, কিন্তু সেই ম্যাসাজ হোমের এবং কখনও কখনও রীতিমত ভদ্র হোমেরও মেয়েদের এসে দাঁড়ানো বন্ধ হয়নি ল্যাম্পপোষ্টের তলায় সন্ধ্যা হতে। এরা সব পতিত নয়; অথচ ভদ্রজীবন থেকেও বিচ্যুত,—এদের দেখে আমার কেন জানি না অবধারিত রবীন্দ্রনাথ মনে পড়ে। 'ঘরেও নহে, পারেও নহে, যেজন আছে মাঝখানে, কে দেয় নেয় সন্ধ্যেবেলায় তারে?'—এদের কথা আপনারা জানেন, আমরা জানি, কিন্তু আরক্ষবাহিনী নিশ্চয়ই জানে না।

এ ছাড়া আরও যা জানি তা আপনারাও জানেন; কিন্তু আপনারাও বলেন না; আমরাও, না। কখনও কখনও কেউ কেউ বইতে লেখেন গল্পের ছলে; কিন্তু তার আগে, গোদা টাইপে; এ কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে বাস্তব জগতের কারুর সঙ্গে এতটুকু মিল

নেই ; যদি থাকে তবে বুঝতে হবে তা একান্তই অনিচ্ছাকৃত,—লিখে দিতে ভোলেন কদাচ।

দেখে শুনে আমার মনে হয়েছে, অর্থের নয়, প্রতিবাদের অভাবই আমাদের সব অনর্থের মূল ; এবং আমাদের, মধ্যবিত্তদের নির্মূল হবার কারণও হবে ওই, অর্থের নয়, প্রতিবাদের অভাবেই। রবীন্দ্রাথের, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তারা উভয়েই বিধাতার রুদ্ররোষে সমান ভাবে জ্বলে যায়,—এই জীবনে এখনও কবিতা হয়ে আছে বলেই যে আমরা ভয় পাই প্রতিবাদ করতে তা নয় ; আসলে আমরা ভয় পাই, তার কারণ আমাদেরও এই আলেকজাণ্ডার উবাচ, 'সত্যিই কি আশ্চর্য্য এই দেশে' পুলিশকে যদি কোনও তথ্য দেবার দুঃসাহস করেন তাহালে আসামীর আগে আপনার সাজা হয়ে যাবে। পুলিশ তৎক্ষণাৎ বলবে, আপনি কি করে জানলেন যে এমন হয়। আপনি নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছেন। ব্যস ! হয়ে গেল আপনার ! বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা ; পুলিশে বাগে পেলে সে-আঠার বাঁধন খুলবে কে ?

গোটা ভারতবর্ষেই তো আজ আসামীদের সাজাই আজকে সব চেয়ে কম হয় অথবা একেবারেই হয় না। তাই সেকথা থাক ; তার বদলে এখন বেয়াকুফের কথা হচ্ছিল, তার কথাই হোক !

বেয়কুফের আড্ডার সামনেটা হোটেল ; পেছনটায় তার আসল কারবার। সেখানে হোটেলের মেন্যুর মতো কার্ডে ছাপা রয়েছে তার রেট খদ্দেরের জন্যে ঃ পুরোখুন—হাজারটাকা ; আধমরা ঃ পাঁচশো ; সামান্য শিক্ষা ঃ একশো। সেকেণ্ড ক্লাসের ডেলি প্যাসেঞ্জার বড়বাবু সামান্য শিক্ষাই দিতে চাচ্ছিলেন সাহেবদের ; বেয়াকুফের নির্দেশ মতো একশো টাকায় নোট একখানা এবং একখানা সেকেণ্ড ক্লাস টিকিটের দাম গুঁজে দিলেন।

পরের দিন ট্রেণ ছাড়বার মুহূর্তে লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়ে উদয় হয় কলকাতার কুখ্যাত বেয়াকুফ, বড়বাবু এবং সাহেবদের সাকেণ্ডে ক্লাস কামরায়। সাহেবরা আরও অবাঞ্ছিত আগন্তককে দেখে বিস্মিত

হয় কিন্তু বুঝতে দেরী হয় না তাদের যে এ নিরীহ ভদ্রলোক নয় ; দুর্দান্ত সন্তান। চুপ করে যায় সাহেবরা। কিন্তু একটু বাদে চুপ করে আর থাকা যায় কতক্ষণ ? এতদিনের অভ্যাস। অতএব সাহেবরা এসয়ূস্থাল বুলি করতে আরম্ভ করে, বেয়াকুফকে বাদ দিয়ে বড় বাবুকেই। থুতু দেয় ; পা তুলে দেয় বড়বাবুর বুকে। বেয়াকুফ আঙ্গুল ইসারা করে বড়বাবুকেও সাহেবদের বুকে পা তুলে দিতে বলে। বড়-বাবু পারবেন কেন ? ছাপোষা বাঙ্গালী ; দুর্দান্ত সাহেবের বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকে পা তোলার মত পা কোথায় তার। কথা বড়বাবু শুনছে না দেখে বেয়াকুফ গেঞ্জির তলায় রাখা ছোরা দেখায় ; অর্থাৎ কথা না শুনলে সে এবার বড়বাবুকেই ফাঁসাবে। বড়বাবু চোখ দুটো বুজিয়ে ফেলে, দুর্গানাম জপতে জপতে সাহেবের বুকে তুলে দেয় পা !

সাহেবরা প্রথমটা এত শক্‌ড্ হয় যে বুঝতেই পারে না কি হয়েছে,—তারপর সম্বিৎ ফিরে পেতেই গর্জন করে ওঠে ঃ হোয়াট ? ডার্টি নেটিভস ? কাওয়ার্ড বেঙ্গলীস ?

বেঙ্গলীস বলতেই উঠে পড়ে বেয়াকুফ ; ঝাঁপিয়ে পড়ে সাহেবের বুকের ওপর ; চীৎকার করে বলে বেয়াকুফ ; হোয়াট ? বেঙ্গলীস ? প্লুর‍্যাল জেণ্ডার ? [অর্থাৎ একজন বাঙালী না বলে তুমি প্লুর‍্যাল নাম্বার বললে কেন] চীৎকার করে বেয়াকুফ, আর সমানে হাত চালায়। সাহেবদের মুখ ফাটিয়ে নেমে যায় বেয়াকুফ, সেই কলকাতার কুখ্যাত গুণ্ডা, ট্রেণ পরের ষ্টেশানে পুরো হল্ট করবার আগেই।

সাহেবরা শুধু গোঙ্গায় ; বড়বাবু নামবার আগে জুতোর ঠোক্কর দিয়ে সরিয়ে দিয়ে যায় ষাঁড়ের ডালনা খাওয়া চলচ্ছক্তিরহিত চতুষ্পদকে [দুই সাহেবের দু পা প্লাস দু পা ইকোয়াল টু ওয়ান চতুষ্পদ]।

বেয়াকুফ গুণ্ডা শিক্ষিত ছিলো না ; কিন্তু তার gender sense ছিলো ঠিকই ! আমাদের শিক্ষা হয়েছে কিন্তু gender sense হয়নি আজও।

এই আমার এক দুরারোগ্য দোষ। এই,—এক কথা বলতে, একের কথা বলতে-বলতে আরেকের কথায় কলমের যখন-তখন নাক গলানো। দোষ আমার নয়; দোষ আদি ও অকৃত্রিম বাঙালীত্বর। শীল থেকে শীলে, ব্রজেন শীল থেকে পঞ্চশীল, গিরিশ ঘোষ থেকে দ্বারিক ঘোষ যেতে আমাদের মুহূর্তের তর সয় না। বলতে সুরু করেছিলাম অসমাপ্ত ট্রেণ-পর্বের যে-ভদ্রলোকের কথা তিনি মধ্যবর্তী বয়স অতিক্রান্ত মধ্যবিত্ত বাঙালীই। ট্রেণে তাঁর সঙ্গে চলেছিলো আর যারা তারা সবাই কাশীতে বাঈজী পাওয়া যেত একদা কেমন এবং এখন কেমন যেন তাদের আর দেখতে পাওয়া যায় না যে, তাই নিয়ে আলোচনায় উন্মত্ত হয়েছিল। ভদ্রলোক শুনতে শুনতে আর শুনতে পারলেন না। বললেন, লোকে কাশী যায় ধর্ম করতে না অধর্ম করতে বলা শক্ত। আলোচনারত যুবকেরা তার কথায় কর্ণপাত করে না দেখে রাগে ফেটে পড়লেন: বাঈজীর অভাব নেই ভারতবর্ষে; তার জন্যে কাশীকে কলঙ্কিত করবার অর্থ কি? যুবকদের যে দলপতি সে বলল: আমার কথাও তাই; এদেরকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে মেয়েমানুষ, সেই সব মেয়েমানুষ যারা দেহের ব্যবসা করে তারা ক্যালকাটা টু কাশী, অবিকল এক। তার জন্যে কাশীতে গিয়েও কেবল ডালকামুণ্ডিতে 'মুণ্ড' মণ্ডনের অর্থ, একমাত্র অকর্মণ্য অতিরিক্ত অর্থ ছাড়া আর কি হতে পারে!

কিন্তু যুবকদের যূথপতি যতই বলুক মোগলদের হাতে পড়ে তাকেও শেষ পর্যন্ত খানা খেতেই হলো কাশীতে। অর্থাৎ সদলবলে যেতে হলো ডালকামুণ্ডির ভুবনবিখ্যাত পতিতা-পাড়ায়। সেখানে মধ্যরাত্র পর্যন্ত বাঈজীসঙ্গে কাটিয়ে যখন বেরুচ্ছে তারা তখন কে একজন বললে নতুন এক মেয়েমানুষ এসেছে ডালকামুণ্ডিতে যার নাম ডালিয়া,—যাকে একবার দেখে না এলে কাশীতে আসার মানে হলেও ডালকামুণ্ডিতে আসার মানে হয় না কোনও। পীড়াপীড়িতে রাজি না হয়ে উপায় থাকে না অসুর-দলপতি বৃত্রের। সেই মধ্যরাত্রে এদোর ওদোর করতে করতে ডালিয়ার ঘরের ঠিকানায় ঠুক ঠুক করতে দেখা গেল

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ; অর্থাৎ লোক আছে। অত্যন্ত উত্তেজক ছবি দেখতে এসে উদগ্র দর্শকের 'হাউসফুল' বোর্ড ঝুলতে দেখে মনের যে অবস্থা হয় তারই মতো অথবা তার চেয়েও হতোদ্যম যুবকেরা যখন চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে ক্ষুণ্ণতর মনে তখন খুট করে আওয়াজ হয়ে দরজা খুলে গেল। সবাই মিলে হুড়মুড় করে ডালিয়ার ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো এক লাফে। কেবল দলপতি সেই 'কাপ্তান' নয় ; বাইরে দাঁড়িয়ে রইল সে তখনও।

বাইরে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ্য করছিলো একজনকে। সেই একজন,—সেই মুহূর্তে ডালিয়ার ঘর থেকে যে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সন্তর্পণে আপাদমস্তক চাদরে আবৃত করে বেরিয়ে যাচ্ছিল ডিঙি ডিঙি মেরে মেরে যাতে ডালকামুণ্ডির অপবিত্র মাটির অশুচি তাকে স্পর্শ না করে, সে ছাড়া আর কেউ নয়। মুখটা দলপতির ভারি চেনা। তবুও তাকে থামিয়ে লজ্জা দিলো না কাপ্তান। ট্রেণে মরাল-লেকচার দেওয়া সেই মধ্যবয়স অতিক্রান্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী,—'কাশীতে যায় যারা তারা ডালকা-মুণ্ডিতে যায় কেন', তার অর্থ খুঁজে পেলেন কি না জিজ্ঞেস করবার ভারি ইচ্ছে করছিলো বটে কাপ্তানের, তবুও চেপে গেল সে। চেপে গেলো কারণ, কেন বলা শক্ত, তবুও তার সে মুহূর্তে মনে না হয়ে পারেনি সে ভদ্রলোকও তাকে চিনতে পেরেছেন। একটু পরে দলপতি গুণগুণ করে একটি গানের সুর, যা নাকি পলায়নরত ভদ্রলোকের গাইলে ঠিক হত, নিজেই ভাঁজতে ভাঁজতে ঢুকলো গিয়ে ডালকা-মুণ্ডিতে নবাগত তারকা ; ডালিয়ার ঘরে। গানটা রবীন্দ্রনাথের সেই ঃ এ পথে আমি যে গেছি বার বার…!

এই কাশীর এক দিক ; কিন্তু তার আর এক দিকও আছে। সেই একদিন যেমন কাশীর এক দিকের ছবি পেয়েছি তেমনই তার আর 'এক' দিকের ছবির জন্যে চলুন যাই আর 'এক' দিন-এর কাছে।

সেই আর-'এক'দিন-এ সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সম্মুখে গিয়ে

নত হয়ে, প্রণতঃ হয়ে দণ্ডায়মান হই আসুন। শিবের জটামুক্ত জাহ্নবী যেখানে উত্তরবাহিনী সেই কাশীর গঙ্গার তখন কর্মক্লান্ত দিনের অবসানে অবগাহন-উদ্যত হয়েছে সর্বপাপঘ্ন সহস্রাংশু জবাকুসুমসঙ্কাশ দিবাকর। দিনের আলো অন্তর্হিত হয়নি আর এসে উপস্থিত হয়নি তখনও তারাদের ফুলতোলা আকাশের আঙিনায় রমণীয় রাত্রি। পরমাশ্চর্য সেই প্রদোষালোকে গঙ্গার তীরে বসে আছেন মর্ত্যভূমিতে অমর্ত্যভূমির আভা ;—ত্রৈলঙ্গস্বামী। ধ্যাননিরত ধূর্জটি শিষ্যরা অবলোকন করছে সেই হিমালয়শিখরে করুণার তুষার গলে গলে পড়ছে। এমন সঙ্গীজনসমভিব্যাহারে দেখা দিয়েছেন অদূরে ধুতি-চাদর-পরা ছড়ি হাতে বাঙালী এক বাবু। এসে দাঁড়াতেই ধ্যানভঙ্গ হয় ধূর্জটির। হিমালয়ের আনন থেকে সূর্য্যলোকে অপহৃত হয় তুষারশুভ্র আবরণ। ত্রৈলঙ্গ উঠে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন বাঙালী আগন্তককে। একজনের অঙ্গে কাটিবাস ; আরেকজনের সর্বাঙ্গে সম্পন্ন সংসারীর ভেক। আলিঙ্গনান্তে একটি কথারও বিনিময় হয় না। দুজনে দুজনের কাছ থেকে বিদায় নেন নীরবে।

আগন্তক বিদায় নেবার পর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শিষ্যদের বিস্ময়ের কারণ, ত্রৈলঙ্গ কাউকে এমন আপ্যায়ন করেন না। ত্রৈলঙ্গ অপনোদন করেন বিস্ময়ের ছায়া শিষ্যদৃষ্টির অরণ্য থেকে : কাঠের লেঙটি পরে যোগীরা যাঁর অন্ত পান না অনন্তকাল ধরে, চটি-চাদর-ধুতি-পাঞ্জাবীপরা এই গৃহস্থ সংসারে বাস করেই সন্ধান পেয়েছেন সেই 'সার'-এর।

কাশীর আর 'এক'দিন আর 'এক' 'দিক' এই আগন্তক-এর নাম : শ্যামচরণ লাহিড়ী।

॥ ছয় ॥

নন্দাদেবী পাহাড়ের ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে সেদিন। অবসান আসন্ন হয়েছে নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল এক দিনের। চলে যাবার, সরে যাবার মুহূর্তে জ্বলে উঠছেন সর্বপাপঘ্ন, জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাদ্যুতি দিবাকর দ্বিগুণতর দীপ্তিতে কলকল্লোলিনী মহাসমুদ্রের অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে চির-নিরুত্তর দেবতাত্মা হিমালয় অক্লান্ত প্রহরীর মত অদূরে দণ্ডায়মান 'সেই অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচলে' এসে পড়েছে বেলাশেষের আলো; সে আলো জ্বলজ্বল করছে ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির প্রসন্নাননে; সে আলোয় ছলছল করছে 'ভুবন-মনোমোহিনী' এই ভারতবর্ষের 'অনিলবিকম্পিত' অরণ্যের 'শ্যামল অঞ্চলে'। সে আলোয় টলমল করছে 'নীলসিন্ধুজলের' সুনীল; সেই আলো যার আশীর্বাদ মাথায় করে রাত্রির অতল অন্ধকার থেকে উত্তীর্ণ হচ্ছে নদী—নবপ্রভাতের অকুল আলোতে।

এই অপরূপকে দুটি নয়ন মেলে দেখছে সেদিন এক তরুণ বাঙালী। উনবিংশ শতাব্দীতে সামরিক পূর্তবিভাগের সঙ্গে যুক্ত সে, তখনও জানে না দাসত্ব থেকে প্রভুত্বে, 'সামান্য' থেকে 'অসামান্যে' উত্তীর্ণ হবার কি 'অনন্তমুহূর্ত' আসন্ন হয়েছে সেই এক পরমাশ্চর্য প্রদোষে। মেঘে মেঘে রঙের কুসুম তুলে অস্তাচলে ঢুলে পড়ার সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত এক তরুণ সত্তা কোন অনির্বচনীয়ের আভাস পাচ্ছে কে জানে! প্রতি রোমকূপে এ কিসের রোমাঞ্চ; বুকের মধ্যে কেন শিবের ডমরুধ্বনি; কানে বাজে কার বীণা; নাসিকায় আসে গন্ধ মাতালকরা কিসের পারিজাত-বাস; জিহ্বায় ক্ষরিত হতে থাকে অমৃত নিস্যন্দ; সুধায় ভরে যায় সমস্ত বসুধারা।

হঠাৎ কেঁপে ওঠে তার অন্তরাত্মা, অরণ্যাত্মা দুর্গম পর্বত-কন্দর কেঁপে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। তার নাম ধরে কে ডাকে এই অজানা, এই অচেনা দ্রোণগিরির নির্জন অন্ধকারে। এ কার কণ্ঠস্বর?

ভীষণ চেনা; তবু অচেনা। জন্মজন্মান্তরের জানা; তবু অজানা। এ আহ্বানের কেবল আওয়াজ নেই; আলোও আছে। এ কেবল জিজ্ঞাসা নয়; জবাব। মৃত্যুরোগের শয্যাপার্শ্বে জীবন-আরোগ্যের বুঝি এই ডাক তার। এই দুরন্ত ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় আছে কার? এই ডাকে যে জেগে ওঠে তামসনিদ্রার লজ্জাকর আরাম থেকে আত্মবিস্মৃত কুম্ভকর্ণ। এই ডাকে যে পঙ্গু দুপায়ে হঠাৎ জেগে ওঠে উত্তুঙ্গ গিরি-অতিক্রমের উদ্দাম উপায়ঃ এই ডাকে যে চির-মূক হয় অতিব-মুখর।

তবু কিংকর্তব্যবিমূঢ় তরুণ-অধরে কিছুতেই সাড়া জাগে না; উত্তর দিতে অসমর্থ হয় সে দিনের আলো মিলিয়ে যাওয়া আকাশের আঁচল দেখা দেওয়া চুমকির দলের একটি নক্ষত্র যদি এসে পড়ত তার হাতের মুঠোয় সে মুহূর্তে তবুও দ্রোণগিরির নিঃসঙ্গ অন্ধকার থেকে তার নাম ধরে উঠে আসা এই ডাকে সে যেমন অবাক হয়েছে এমন হতবাক হয়েছে। চলমান মুহূর্তের দল দাঁড়ায় না; নদীর জল বয়ে যায় যেমন বয়ে গেছে সে চিরকাল তরতর করে; অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে অরণ্যে-পর্বতে। বনে বনে গান ওঠে শুধু; 'ওপারে মুখর হলো কেকা ঐ, এপারে নীরব কেন কুহু হায়?'

আহ্বানের কেকা ধ্বনি যদি বা জাগে, সমর্পণের কুহু তবু কেন প্রতিধ্বনি করে না, কে জানে? আবার উচ্চারিত হয় আহ্বান। শ্যামাচরণ? অতল অন্ধকার থেকে অকূল আসে সে ডাকঃ আকাশে বাতাসে অরণ্যে পর্বতে, তরুণ সেই পূর্ত-কর্মচারীর অন্তরের অন্তস্তল স্পর্শ করে সে আহ্বানঃ শ্যামাচরণ। তবু চরণ স্থাণুর মত অচল হয়ে থাকে; এক পাও এগোয় না। এমন সময় আহ্বানের খেয়া বেয়ে এসে দাঁড়ান স্বয়ং আহ্বানকর্তা। বিস্ময়-বিস্ফারিত দুটি তরুণ চোখ তাকিয়ে দেখে সময়ের চেয়ে বয়সে পর্বতের চেয়ে মহিমায়, নদীর চেয়ে স্বচ্ছতায় বড় জটার অরণ্যে আবৃত তবু জ্যোতির্ময়, এক আনন পৃথিবীতে এই প্রথম সুশীতল বারির আধার অচল কূপ নিজে থেকে হেঁটে আসে তৃষ্ণার্তের কাছে।

সন্ন্যাসীর আননে ছড়িয়ে পড়ে প্রসন্নতা হাস্যের দীপ্তি; শ্যামাচরণ আ গয়া? হ্যাঁ। নিরুত্তর তরুণ আননে পড়তে পারেন অনায়াসে সময়ের সুবার্তা, তিনি সময়ের চেয়েও যিনি প্রাচীন, হ্যাঁ। নদী এসে পড়েছে সিন্ধুমুখে; রাত্রির তিমির উপস্থিত উষার সম্মুখে; শ্যামাচরণে এসে পড়েছে, রক্তজবা।

তবু ঘোর কাটে নি স্বপ্নাচ্ছন্ন তরুণ চোখে, তাই সন্ন্যাসী অঙ্গুলিনির্দেশ আকর্ষণ করেন তরুণদৃষ্টির পূর্ত-কর্মচারী শ্যামাচরণ দেখে; পর্বতগুহার অন্ধকারে ব্যাঘ্রাসন, দণ্ড আর কমণ্ডলু। দৃষ্টি আকর্ষণ করবার বিস্মৃত অতীতকে আকর্ষণের অভিপ্রায়ে সন্ন্যাসীকণ্ঠে উচ্চারিত হয়; শ্যামাচরণ, এসবই যে তোমারই গতজন্মের ফেলে রেখে যাওয়া সাধনসঙ্গী,—দেখো তো চিনতে পার কিনা না? দেখো তো মনে পড়ে কি না, এইখানে বিগতজীবনে তুমি তপস্যা নিরত ছিলে!

শ্যামাচরণ ফিরে যেতে চেষ্টা করেন বিগতজীবনের নানা রঙের দিনগুলোতে কিন্তু কিছুতেই পারেন না গত জন্মের অতীতকে কথা কওয়াতে। বার বার ধাক্কা দেন স্মৃতির বন্ধ দ্বারে; সিংহদ্বার তবু উন্মুক্ত হল কই? শ্যামাচরণকে হঠাৎ ছুঁয়ে দেন সন্ন্যাসী। বিবেকানন্দকে যেমন একদিন ছুঁয়ে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অহল্যার পাষাণে যেমন পদস্পর্শ করেছিলেন শ্রীরাম। তেমনই দ্রোণগিরির জনমানবহীন অন্ধকারে রূপকে স্পর্শ করে অপরূপ মুহূর্তে যা ছিলো বিগত জন্মের বিস্মৃতির শব মাত্র সেখানে জেগে ওঠে একের পর এক পূর্বাপর স্মৃতির উৎসব। মনে পড়ে। হ্যাঁ। মনে পড়ে যায় সব পূর্তবিভাগের তরুণ বাঙালী সেই কর্মচারীর। মনে পড়ে, দ্রোণগিরির এই গুহায় বসে ঠিক এর আগের জন্মে অনন্তের আরাধনা শেষ হবার আগেই তাঁর দেহান্ত ঘটে। মনে পড়ে, এই ব্যাঘ্রাসন, এই দণ্ড, এই কমণ্ডলু, এই সবই তার গত জন্মের ফেলে রেখে যাওয়া সাধনসহচর। আর মনে পড়ে, যিনি আজ আহ্বান করে এনেছেন এখানে অতি প্রবীণ অথচ অতি নবীন

সন্ন্যাসীই ছিলেন তাঁর গত জন্মের গুরু। মনে পড়া মাত্র বোঝেন এতকাল ধরে এই সব রক্ষা করে তারই অপেক্ষায় বসেছিলেন বাবাজি মহারাজ। এখন সময় হয়েছে ; অসামাপ্ত আরাধনা সমাপ্ত করবার সুসময় হয়েছে সন্নিকট। তাই জীবন তৃষ্ণার্ত করে নিজেই পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়িয়েছে জীবনতৃষ্ণার ক্ষান্তি মুক্তির জীবন্তকূপ, যাঁর পরিচয়ের পরিমাপ হয় না দেশে কালে, সেই বাবাজি মহারাজ।

নত হলেন শ্যামাচরণ। আর তাঁরই সঙ্গে সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে প্রণত হলো যেন প্রাচীন অরণ্য-পর্বত।

আমি জানি। আমি জানি। এ কাহিনী পড়তে পড়তেই সংশয়ের ছায়া পড়বে সতর্ক দৃষ্টিতে। তাঁরা বলবেন এ বিশ্বাসের অযোগ্য ; অলীক। যাঁরা অতদূর বলতে চাইবেন না স্বভাবের গুণে, তাঁরাও বললেন, এ বিশ্বাসের বাইরে ; অলৌকিক। না। এ অভিজ্ঞতা অলীকও নয় ; অলৌকিকও নয়। সেই বিখ্যাত উক্তির পুনরুক্তি করে যাঁরা বলবেন ; দেয়ার আ' মো' থিংগস ইন হেভেন এণ্ড আর্থ, হ্যান আ' এভা' ড্রেমট অফ ইন ইয়া' ফিলসফি, অথবা এ হচ্ছে সেইরকম অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, তাদের উদ্দেশ্যে বলি : না ; এ বুদ্ধি, বিদ্যা, অথবা বিশ্বাসের অতীত ব্যাপার নয়। এর চেয়ে লৌকিক এর চেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা বরং বর্ণনা করা শক্ত।

আমার কথা বিশ্বাস করতে বলি না। বিবেকানন্দর কথা বলি :

'অবিশ্বাস করা অন্যায় ; নিজের বিচারশক্তি ও যুক্তি খাটাইতে হইবে ; কার্য্যে করিয়া দেখিতে হইবে যে শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা সত্য কি না। জড়বিজ্ঞান শিখিতে হইলে যেভাবে শিক্ষা কর, ঠিক সেই প্রাণালীতেই এই ধর্ম-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে।' [রাজযোগ]

এবং প্রমাণ দিতে গিয়ে বলছেন :

'উদাহরণস্বরূপ দেখ কয়েক মাস সাধনের পর দেখিবে যে তুমি অপরের মনোভাব বুঝিতে পারিতেছ, সেগুলি তোমার নিকট ছবির আকারে আসিবে ; অতি দূরে কোন শব্দ বা কথাবার্ত্তা হইতেছে, মন একাগ্র করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলেই হয়ত উহা শুনিতে পাইবে। প্রথমে অবশ্য এ সকল ব্যাপার অতি অল্প অল্পই দেখিতে পাইবে। কিন্তু তাহাতেই তোমার বিশ্বাস, বল ও আশা বাড়িবে। মনে কর, যেন তুমি নাসিকাগ্রে চিত্তসংযম করিলে, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যেই তুমি দিব্য সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে পাইবে ; তাহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের মন কখন কখন বস্তুর বাস্তব সংস্পর্শে না আসিয়াও তাহা অনুভব করিতে পারে।' [রাজযোগ]

বিবেকানন্দ বলেছেন বলেই একথা 'সত্য' নয় ; সত্য বলেই 'একথা' বিবেকানন্দ বলেছেন।

বিবেকানন্দের কথায় অন্ধবিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। আপনার আমার দৈনন্দিন জীবন থেকেই খুঁজে পাওয়া যাবে হাজার হাজার দৃষ্টান্ত যা থেকে প্রমাণিত হবে, আমরা যাকে অলৌকিক মনে করি তা আরেকজনের কাছে সম্পূর্ণ লৌকিক। আজকের দিনেও এমন লোক আপনার, আমার সকলেরই জানা, বেঁচে আছেন যাঁরা তাঁদের ছাত্রজীবনে ভবানীপুর থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজ, হাওড়া থেকে শেয়ালদার কোনও কলেজে দুবেলা হেঁটে এসেছেন পড়তে, এবং পড়া শেষ হলে, বাড়ি ফিরে গেছেন হেঁটে। আগে আমরাও এতদূর হাঁটা নিজেরা কল্পনা না করলেও, অনেকেই একদা পারতেন এবং এখনও কেউ কেউ পারেন। একথা অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমাদের পরের ডিজেনারেশান [জেনারেশন কথাটা ব্যবহার করতে পারলাম না ; ক্ষমা করবেন। আমরা যারা বাঙালী তাদের আগে 'জেনারেশান' হতো ; এখন 'ডি-জেনারেশান', হচ্ছে।] যখন পাশের বাড়ি যেতে অথবা নিজের বাড়ির এঘর ওঘর করতেও পায়ের বদলে যান্ত্রিক উপায়ে কাজ সারবে তখন হেঁটে ভবানীপুর থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজ, অথবা হাওড়া থেকে রোজ শেয়ালদার কলেজে যাওয়া

আসার বিবরণ শুনলে কি বলবে না যে সে বৃত্তান্ত হয় অলীক নয় অলৌকিক ?

বলবে কি না আপনারাই বলুন ?

এ প্রশ্ন অথবা সন্দেহ যাদের মনে জাগবে না তাদের মনে আরেকটি জিজ্ঞাসা মাছের মত মাঝেমাঝেই মাথা তুলতে পারে। সেটি হচ্ছে,—কাশীর কথা বলতে বসে শ্যামাচরণের কথা কেন ? এ সন্দেহের ফণা যদি কেউ তোলে তাহলে আমার এ ছাড়া যে উত্তর নেই তা হলো ঃ বার্দ্ধক্যে বারাণসী, এহেন ব্যক্তি যদি কেউ থাকে, তার জন্য বিরচিত নয়; অর্থাৎ এর জন্য সেই স্ত্রী বা পুরুষের 'কাপ অফ টি' নয় কিছুতেই। কাশী মানে আমার কাছে কেবল কয়েকটি ঘাট, অসংখ্য মন্দির নয়। এই ঘাটে, এই মন্দিরে যাঁরা দেহকে করেছিলেন দেহাতীতে দেউল, তাঁদের আবির্ভাব ছাড়া কাশীর সব হতো শব মাত্র; তাঁরা এসেছিলেন বলেই কাশী হতে পেরেছে বিশ্বের, বিশ্বনাথের আবির্ভাব উৎসব। এঁদের জীবনেই জ্যান্ত হয়েছেন তিনি; মাটি থেকে হয়েছেন 'মা'-টি। আরোও একটি কারণে এঁদের কথা বলি। আমার কাছে নেপোলিঁও অথবা নেহেরু কেউই কর্মী নয়; আমার কাছে কর্মী মানে রবীন্দ্রনাথ ; কবি মানে রামকৃষ্ণ।

নেপোলিঁও সম্পর্কে অতিকথার মাহাত্ম্য চালু হয়েছে যে তিনি মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমোতেন; তাও ঘোড়ার পিঠে। এই শুনে নেপোলিঁও সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানাতে যাদের চোখে ঘুম নেই, আমি তাদের একজন নই। ওই মহাশয় ভদ্রলোক যদি আর কয়েক ঘণ্টা বেশী ঘুমোতেন ; ঘোড়ার পিঠে নয়,—শয্যার বুকে তাহলে এমন কিছু ক্ষতি হ'তো কার ? তা না করে, 'রণং দেহি'-র স্বপ্নে চোখের ঘুম উবে যাওয়ায় মস্কোর পথে কয়েক হাজার লোককে তুষার সমাধি দেবার প্রচেষ্টায় তিনি যা করে গেছেন তার ক্ষতিপূরণ সম্ভবতঃ আজও হয়নি।

আর এই স্বাধীনভারতের Jobহরলাল। পালশীর প্রান্তরে অস্তমিত ভারতের দিবাকরকে মণিপুরের প্রান্তে আবার উদিত করবার জন্যে উদ্যত নেতাজী ভারতে পদার্পণ করলে 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই', এই নিধিরাম সর্দার লাঠি নিয়ে না লড়া পর্যন্ত এঁর ঘুম ছিল না। আজ বেরুবাড়ি পাকিস্তানের হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত এঁর ঘুম নেই। ইনি সব সময়ই কাজ করেন ; কারণ আরাম হারাম হায় ! আরাম হারাম হলে সব সময় কাজ-কাজ,—কামের এই ব্যারাম তবে 'হারামজাদা' হায় !

কর্মী হচ্ছেন কেবল তাঁরাই যাঁরা জীবনকর্মী। যেমন শ্যামাচরণ লাহিড়ী।

রবীন্দ্রনাথকে যেমন বর্ষার কবি, উপনিষদের কবি, ইত্যাদি নানারকম নামে লেবেলায়িত করার হাস্যকর চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ জন্মাবার শতবর্ষ পরেও বন্ধ হবার নয় তেমনই জীবনকর্মীকে হঠযোগী রাজযোগী, কর্মযোগী, ইত্যাদি ভূষণে ঘোষণা করবার প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হবার নয়। কিন্তু এঁদের যোগ, সে হঠ, রাজ, কর্ম অথবা ভক্তি যাই হোক এঁদের যোগ সেই ; 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো'—বিশ্বযোগ, বিস্ময়যোগ ছাড়া কিছু নয়। জাগরণে এবং নিদ্রায় এঁদেরই কেবল বিশ্রাম নেই। মানুষকে নিরন্তর 'মান' এবং 'হুঁস' দেবার যোগ চলছে এঁদের ; মানবত্বকে বিশ্বমানবত্বে উত্তীর্ণ করবার উদ্‌যোগ।

মহাভারতের গাণ্ডীবে ছিলো শর ; স্বাধীন ভারতে মাইকে কেবল কণ্ঠস্বর। এরা বিয়োগ করে বেশী ; যোগ করে কম। এরা অকাজ করে বেশী ; কাজ করে কম। যোগ করে, কাজ করেন কেবল তিনিই,—যাঁর শর এবং স্বর,—সবই ঈশ্বর। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত গীতা স্পষ্টতই বলেছেন ঈশ্বর-বিস্মৃত ভালো কাজ মন্দ ছাড়া কিছু করে না !

সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বর খুঁজতে বেরোয় যারা তারা ঈশ্বরকে পায় না অনেকেই ; খুঁজে পায়,—কেবল সার দেবার নাম করে ছাই

মেখে সং সেজে গৃহস্থকে অভয় দেবার পরিবর্তে ভয় দেখিয়ে কিছু বাগাবার উপায়। শ্যামাচরণ লাহিড়ী সংসারে থেকেই খুঁজে পেয়েছিলেন সার। কাশীতে যেতে হয়নি এমন যোগী ভারতে আসেনি প্রায়ই। কিন্তু তাঁদের সকলের 'ভাব' কাশীশ্বরের সঙ্গে হলেও, তাঁদের সকলের আবির্ভাব কাশীতে নয়। কিন্তু শ্যামাচরণের দৈহিক আবির্ভাবও কাশীতে ; জীবনের অনেকটাই—বারো মাস বাসও কাশীতে ; এবং কাশীতেই একদা ঘটেছিলো তাঁর তিরোভাব।

তাই কাশীর সঙ্গে সব চেয়ে নিবিড় যোগ 'ক্রিয়াযোগ'-এর কবি শ্যামাচরণের।

কুরু এবং পাণ্ডব-গুরু দ্রোণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন একলব্যকে তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গুরুদক্ষিণা হিসেবে কেটে নিয়ে,—মহাবীর অর্জ্জুনকে কণ্টক-মুক্ত করবার কারণে। দ্রোণগুরুর নির্জন অন্ধকারে শ্যামাচরণের গুরু কিন্তু অপেক্ষা করেছিলেন জন্মান্তর পর্যন্ত। শ্যামাচরণকে একলব্য করবেন বলে নয় ; তাঁকে একলভ্য করবেন বলে। সেই এক যিনি লভ্য হলে সব লোকসান লাভ হয়ে দাঁড়ায় ; বাসনার শব দাহ হয়ে জেগে ওঠে শবাসনার উৎসব।

বাবাজি মহারাজ যখন শ্যামাচরণের বিগতজন্মের সাধনসঙ্গী দণ্ড, কমণ্ডলু ইত্যাদি আগলে অপেক্ষা করছিলেন দ্রোণগিরির নিঃসঙ্গ পর্বতকন্দরে, তখন শ্যামাচরণের থাকার কথা পাঁচশো মাইলেরও বেশী দূরে। কারণ শ্যামাচরণের কর্মস্থল দানাপুর থেকে তিনি বদলী হয়ে আসেন রাণীক্ষেত এবং রাণীক্ষেত থেকে কয়েক মাইল দূর দ্রোণগিরিতে আসা এই 'বদলীর' অর্ডার না হলে যা অসম্ভব হত, বাবাজি মহারাজের ইচ্ছাশক্তিতেই সম্ভব হয়েছে। নাহলে শ্যামাচণের পরিবর্তে আসলে সে-সময়ে আসার কথা ছিলো আরেক জনের এবং দ্রোণগিরিতে শ্যামাচণের দীক্ষা সমাপ্ত হওয়া মাত্রই আবার তাঁর কর্মস্থলে যে শ্যামাচরণকে ফিরে যেতেই হবে তা' বাবজি মহারাজের বলে দিতে দেরী হয়নি।

কয়েক দিনের মধ্যে দীক্ষিত শ্যামাচরণকে ফিরে আসতে হয় তাঁর কর্মস্থল দানাপুরে।

কর্মস্থলে শ্যামাচরণের কর্তা বড়সাহেব শ্যামাচরণকে ডাকতেন 'চিদানন্দ বাবু' বলে। এই নামে ডাকবার কারণ শ্যামাচরণের মধ্যে আত্মসমাহিত একটি অনন্যভাবে বিদেশী এবং অন্যধর্মী বড়সাহেবের চোখ এড়ায় নি। তাঁর অধীনে সাধারণ কর্মে নিযুক্ত শ্যামাচরণ যে কত অসধারণ, তার পরিচয়ও শ্যামাচরণ দীক্ষিত হয়ে ফেরার কয়েক দিনের মধ্যেই পেলেন। সে ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে লিখবার মত। কিন্তু সেই ঘটনার আগেই শ্যামাচরণ যে এ জগতের কর্মী হয়েও আরেক জগতের 'কবি' তা অনুভব করতে সাহেবের ভুল হয়নি। শ্যামাচরণকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন।

এবারে যোগী শ্যামাচরণের সঙ্গে পাঠকের বর্ণপরিচয় করানোর কারণে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত ঘটনাটি উল্লেখ করি। দানাপুরে যোগী মহারাজের কর্মস্থানের অধিকর্তা সাদা চামড়া বড়সাহেব একদিন বিষণ্ণচিত্তে বসে আছেন তাঁর ঘরে। সাহেবের স্ত্রী বিলাতে গুরুতর পীড়িত, তাঁর কোনও খবর না পেয়ে দানাপুরে শ্যামাচরণের বড়সাহেব বড় উদ্বিগ্ন। লাহিড়ী শ্যামাচরণ সাহেবকে আশ্বাস দিলেন মেমসাহেবের খবর তিনি এনে দিচ্ছেন একটু বাদেই। সাহেব মুখে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু মনে মনে নিশ্চয়ই হাসলেন। লাহিড়ী বাবুকে তিনি 'চিদানন্দ বাবু' বলেন,—একথা ঠিক লাহিড়ীবাবুকে তাঁর আত্মসমাহিত একটি অনন্যভাবের জন্যে শ্রদ্ধা করেন একথাও ঠিক। এমন কি ভারতীয় কেউ কেউ 'অলৌকিক' কিছু-কিছু শক্তির অধিকারী,—এও ঠিক। তবু শ্যামাচরণ লাহিড়ী নিশ্চয়ই কিছু তাঁদের একজন নয়, যে বলতে পারে হাজার-হাজার মাইল দূরের একজনের অসুখের অবস্থার সঠিক বিবরণ। মনে মনে আস্থা স্থাপন করতে না পারলেও মুখে অনাস্থার ভাব প্রকাশ করলেন না বড়সাহেব।

অফিসের মধ্যে একটি নির্জন প্রকোষ্ঠে সদ্যদীক্ষিত শ্যামাচরণ তাঁর গুরু বাবাজি মহারাজকে স্মরণ করলেন। ধ্যানভঙ্গের পর সাহেবকে

বললেন : 'ভয় নেই ; মেমসাহেব সুস্থ হয়ে উঠে শীগ্‌গির চিঠি দিচ্ছেন সাহেবকে।' মাত্র এইটুকু বলবার জন্যে ক্রিয়াবান-কবি শ্যামাচরণ শরণ নেননি অনাদিপুরুষ তাঁর গুরু বাবাজি মহারাজের। মেমসাহেব যে ভাষায় চিঠি দিচ্ছেন সেই অদৃষ্টপূর্ব পত্রের প্রতিটি অক্ষর ; প্রতিটি কমা, সেমিকোলন, ফুলষ্টপ পর্যন্ত অবিকল আবৃত্তি করে গেলেন সাহেবের কাছে।

কয়েক দিন পর, সাহেব সেই 'চিঠি' পেয়ে যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্ময়াপন্ন ত হলেন ; কিন্তু বিস্ময় শেষ হবার পরও, অশেষ বিস্ময়ের কিছু বাকী ছিল তখনও।

কয়েক দিন বাদে মেমসাহেব নিজেই এলেন দানাপুরে সাহেবের সঙ্গে মিলিত হতে। সাহেব একদিন মেমসাহেবকে নিয়ে এলেন সটান অফিসের মধ্যেই, সকলের সঙ্গে তাদের boss-এর যিনি বস্‌,—তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। শ্যামাচরণের কাছে এসে থেমে গেলেন মেমসাহেব। বলে উঠলেন : 'বিলাতে আমার অসুখের সময়ে এঁকেই আমি একদিন আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াতে দেখেছিলাম।' এর পর আর মেলাবার প্রয়োজন ছিল না ; তবু দেখা গেল হিসেব করে ঠিক যে তারিখে যে সময়ে শ্যামাচরণ ধ্যানে খবর এনে দেবার জন্যে গুরুর শরণ নিয়েছিলেন, ঠিক সেই সময়ের সেই তারিখের কথাই বলছেন মেমসাহেব।

মেমসাহেবের বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে শ্যামাচরণ শুধু হাসেন।

এ হাসি কেবল বহুবিজ্ঞাপিত দাঁতের মাজনের কল্যাণে মুক্তোর মতো দাঁতে হাসা যায় না। এ হাসি হাসতে পারে,—আত্মার পরমাশ্চর্য আলো এসে পড়ায় হেসে উঠে দলের পর দল মেলে যাঁর জীবন-শতদল,—শুধু সে-ই !

দানাপুরে এসে পৌঁছবার আগেই, দ্রোণগিরিতে দীক্ষার পর, মোরাদাবাদে শ্যামাচরণ আরেকটি আমাদের অনভ্যস্ত ও অবিশ্বাসীর দৃষ্টিকোণ থেকে অলৌকিক ঘটনা ঘটান। মোরাদাবাদে সেবাড়ীতে

তিনি দু-একদিন থাকবার জন্যে ওঠেন, সেবাড়ীতেই একদিন কয়েকজন মন্তব্য করলেন যে আজকের ভারতে সত্যিকারের সাধু একজনও নেই। বাবাজি মহারাজের কাছে দিব্যজীবনের পাবকবাণীর স্পর্শে প্রদীপ্ত প্রানের শিখা শ্যামাচরণ প্রতিবাদ না করে পারলেন না। তিনি রাণীক্ষেতে বাবাজি মহারাজের সঙ্গে সেই পরমাশ্চর্য সাক্ষাতের এবং দীক্ষার চরমাশ্চর্য অভিজ্ঞতার জীবন্ত বর্ণনা দিলেন। তবুও অবিশ্বাসীদের পাষাণে বিশ্বাসের প্রাণসঞ্চার হল না। শ্যামাচরণ লাহিড়ী অতঃপর ভারতীয় যোগাভ্যাসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে প্রস্তুত হলেন। বললেন, স্মরণ করা মাত্র তাঁর গুরু বাবাজি মহারাজ এখন সশরীরে উপস্থিত হবেন মুহূর্তের মধ্যে!

শ্যামাচরণকে বাবাজি কথা দিয়েছিলেন তেমন প্রয়োজন হলে শ্যামাচরণ স্মরণ করামাত্র তাঁর দীক্ষাগুরু তাঁকে দেখা দেবেন। বন্ধ-ঘরের মধ্যে মাটিতে আসীন শ্যামাচরণের আহ্বানে মর্তশরীরে আবির্ভূত হলেন দ্রোণগিরির অমর্ত্যআভা স্বয়ং বাবাজি মহারাজ। কয়েকজনের সখের কৌতুহল মোটাবার কারণে গুরুকে আহ্বান করায় শ্যামাচরণের ওপর বাবাজি খুসী হতে পারলেন না; তবে দেখা না দিয়ে তাঁর উপায় ছিল কই? তিনি যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ।

অবিশ্বাসীর দলের প্রত্যেকের প্রতি রোমকূপে রোমাঞ্চের শিহরণ; শ্যামাচরণ যে ঘরে বসে ডেকেছিলেন দ্রোণগিরির গুরুকে সেই বন্ধ ঘরের দরজা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সাধুদের সততায় সন্দিহানদের মনের দরজাও খুলে গেল। সন্দেহের অন্ধকারে এসে পড়ল সত্যের অরুণালোক। সবাই এসে একে শুধু দেখে গেল যে তাই নয়; স্পর্শ করে গেল দর্শন-স্পর্শনের অতীত যোগী মহারাজ শ্যামাচরণের গুরু বাবাজি মহারাজকে।

অন্তর্ধান করবার আগে শ্যামাচরণের কাছে এবারে তাঁর গুরু তাঁকে আর স্মরণ করতে বারণ করে বলে গেলেন, প্রয়োজন হলে বাবাজি মহারাজ অতঃপর নিজেই উদয় হবেন।

এবং এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই সে প্রয়োজন হলো।

লাহিড়ী মশায় সেদিন দৈনন্দিন ভ্রমণে বহির্গত হয়ে দেখলেন, পথের ধারে গঞ্জিকাপানোন্মত্ত এক সাধু। দেখে তাঁর মন ধিক্কারে ভরে গেল। এই ধরণের সাধুদের এই অসাধু আচরণই যে প্রকৃত সাধুকেও সাধারণের চোখে অসাধু প্রতিপন্ন করে তা উপলব্ধি করে এদের প্রতি বিরাগ আরও বৃদ্ধি পেল। চলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন শ্যামাচরণ। যেতে পারলেন না আর। যা দেখলেন তা তাঁর বুদ্ধির অগোচর। মনে হল দুঃস্বপ্ন দেখছেন। চোখ মুছে দুহাতে আবার দেখলেন। না। ঠিকই দেখছেন তিনি ; ভুল নয়। সেই গেঁজেল সাধুর পাশে বসে শ্যামাচরণের গুরু স্বয়ং বাবাজি মহারাজ তার লোটাটা দুহাতে মেজে ঝকঝকে করে তুলছেন।

সর্বজীবে যিনি জীবনদেবতার ছায়া দেখতে পান তিনিই যোগী, —শ্যামাচরণ তাঁর গুরুর কাছে এই শিক্ষাই পেলেন।

এই শিক্ষার মধ্যে আমাদের মধ্যে আরেকটি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত আছে। এখন তার কথা বলি। আমরা যাদের ভণ্ডতপস্বী বলি সত্যিকারের তপস্বী তাকেও ঘৃণা করেন না। গীতা যেমন বলেছেন যে আমাদের বিচারে যেগুলি সৎকর্ম সেগুলি ঈশ্বর-বিস্মৃত হয়ে করলে যেমন অসৎ কর্ম ছাড়া আর কিছু নয় তেমনই মহাজ্ঞানী মহাজনেরা বলে গেছেন ধর্মের ভাণ করাও শেষ পর্যন্ত 'ধর্ম' করায়। ভণ্ডতপস্বীর জীবনেও ভাণ করতে করতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় যার সব কখনও কখনও। হংস মধ্যে সে ছিলো একদিন 'বক-ধার্মিক' ; আরেক দিন বকো মধ্যে সে হয়ে দাঁড়াতে পারে হংস,—একথা বলেছেন একটি সুন্দর গল্পে—সিদ্ধ-জীবন স্বয়ং বামা ক্ষ্যাপা।

শ্যামাচরণকে যেমন একদিন মোরাদাবাদে কয়েকজন দম্ভ করে বলেছিল, আজকালকার সাধু মাত্রই ছাই-মাখা ভণ্ড, আসলে অসাধু ; —বামা ক্ষ্যাপাকেও একদিন কয়েকজন ঠিক অনুরূপ ভাষা ও তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলতে চেয়েছিলেন, সাধুর ছদ্মবেশে অসাধুরাই কলিযুগের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বামা ক্ষ্যাপা বললেন ঃ না ঃ তবে শোন—

রাজার বাড়ীতে শৌচাগার পরিষ্কার করতে গেলে এক মেথরের চোখে পড়ে যায় রাণীর অপরূপ রূপ। মেথরের মুখে বাসনার ছায়া পড়েছে দেখে বিচলিত হয় তার স্ত্রী,—সতীসাধ্বী এক মেথরাণী। মেথরের মুখে সে কেবল শুনতে পায় একটি কথা ঃ এমন স্ত্রী, ভাগ্য না হলে হয় না। স্বামীর জন্যে পারে না এমন কাজ মেথরাণীর জানা ছিলো না। দুরন্ত সাহসের দুপাখায় ভর করে সে রাণীর কাছে আবেদন করে ভুবনমনোমোহিনীরূপে একবার নির্জনে তার স্বামীকে সাক্ষাৎকার দানে স্বীকৃত হতে। বামনের চাঁদে হাত বাড়ানোর স্পর্ধায় রাণী না রেগে বরং অসীম উদারতায় বলেন ঃ তথাস্তু ; কিন্তু তোমার স্বামীকে বলো, রাজবাড়ীর সাধুর ছদ্মবেশে এসে বসতে ; নাহলে রাণী হয়ে কি বলে তোমার স্বামীর কাছে আমি যেতে পারি ? মেথরাণীর মুখে রাণীর প্রস্তাব শুনে রাতের ঘুম ছুটে যায় মেথরের। সকাল না হতেই সাধুর ছদ্মবেশে মেথর গিয়ে বসে রাজবাড়ীর সামনে। নবীন সন্ন্যাসীর সংবাদ রটে যায় মুহূর্তের মধ্যে। রাজধানীর লোক ভেঙ্গে পড়ে মেথরের পায়ে। গভীর নিশীথে বন্ধ্যা রাণী রাজার অনুমতি নিয়ে দেখা করতে এলেন মেথরের সঙ্গে,—সন্তানের জন্যে বরপ্রার্থনার অছিলায়। মেথর বসে আছে নির্জন রাত্রির নিঃসঙ্গতায়। রাণী এসে দাঁড়ালেন। দু'চোখে দুরন্ত কটাক্ষ। দু'গালে হাসলেই টোল খাচ্ছে। ঠোঁটের ওপর বাঁদিকে ছোট্ট তিল,—সে তিলের জন্যে সমরকন্দ দিতে চেয়েছে কবিরা যুগে যুগে। ভুবনমোহিনী সেই রূপ নিজে থেকে এসে দাঁড়িয়েছে কামনার জাগ্রত শিখার সবুজ পোকাকে ঝাঁপ দিয়ে মরবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে।

কিন্তু মেথর তখন আর সাধুর ছদ্মবেশ পরে নেই শুধু ; সাধুরও ওপরে চলে গেছে সে। রূপ থেকে অপরূপে উত্তীর্ণ এখন তার কাম 'না' হয়ে গিয়ে জেগেছে অন্য কামনা। রত্নাকর দস্যুর মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে সমস্ত কাব্যের শ্রেষ্ঠ রত্নের আকার রামায়ণকার আদিকবি বাল্মীকি।

রাণীকে একান্ত পেয়েও, নারীকে পেয়ে নির্জনে, ভণ্ড সন্ন্যাসীর তবু চঞ্চল হয় না তার মন। তার মনে হয় সাধুর ভাণ করতেই যখন আহ্বান না করতেই আসে সবাই, আসে স্বয়ং রাণী, তখন না জানি সত্যিকারের সাধু হলে হয়ত এসে দাঁড়াবেন স্বয়ং ভুবনেশ্বরী; এই জগতের যিনি রাজরাণী!

এগল্প রাস্তায় শুধু পাথর ঘেঁটে বেড়ায় যে ক্ষ্যাপা, তার নয়; পাথর ঘাঁটতে ঘাঁটতে যে পেয়ে গেছে পরশপাথর,—এ কাহিনী কেবল তাঁর মুখেই মানায়; যিনি কেবল ক্ষ্যাপা নন; যিনি স্বয়ং বামা ক্ষ্যাপা।

বামা ক্ষ্যাপার এই গল্পকে যিনি শিষ্যের জীবনে জীবন্ত করে তুলেছেন একদা তিনি স্মরণের অতীত, অতি সুদূরের রাম অথবা কৃষ্ণ নন; তিনি আমাদের অত্যন্ত আপনার ঘরের লোক, শ্রীরামকৃষ্ণ। মাতাল শিষ্যর বিরুদ্ধে অভিযোগে কান ঝালাপালা হবার উপক্রম হলে রামকৃষ্ণ একদিন শিষ্যকে ডেকে বলেনঃ মদ খাস কেন? আমোদের জন্যে ত? তাহলে মদে যে বিষ আছে সেটা আমাদের ব্যাঘাত করে যখন, তখন বিষটুকু 'মা'-কে নিবেদন করে দিয়ে শুধু সুধাটুকু নিজে নে না রে!

শিষ্যর গুরুবাক্যে আস্থা অসীম। রোজ পূজায় বসেই মা-কে বলেনঃ এই সুরার সব বিষটুকু শুষে নিয়ে আমাকে শুধু সুধাটুকু পান করতে দাও। কয়েকদিন পর পর মাকে এইভাবে ভোগ দেবার পর হঠাৎ মনে হয়, এ কি? যাকে 'মা' বলি, বিশ্বাস করি মাটি নয়, আসলে আমার 'মা'-টিই বলে,—তার মুখে ছেলে হয়ে বিষ তুলে দিই কি করে? সুরাপান ত্যাগ করে মাতাল শিষ্য মাতৃনামের সুরাপানে উন্মত্ত হয় পরমুহূর্তে!

॥ সাত ॥

'ইয়ে' মল্লিকের চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম কাশীতে হোটেলে জায়গা পাবার ব্যাপারে সুনিশ্চিত হবার কারণেঃ আগে বলেছি। চিঠি নিয়ে গিয়ে ভালোই করেছিলাম। পূজো পেরিয়ে গেলেও পূজোর ছুটি তখনও অনেকেরই পেরোয়নি। তাদের ছুটোছুটি অব্যহত তখনও ; ছু'দিন কাশী ; ছু'দিন লখনউ ; কয়েক দিন হরিদ্বার হ'য়ে তবে কলকাতায় ফিরবে বেশীর ভাগ। কাশীর গ্র্যাণ্ড হোটেল যেটি সেটি তখন রবি ঠাকুরের সোনার তরীর মত বলতে চায় কেবলইঃ ঠাঁই নাই ; ঠাঁই নাই। ইয়ে মল্লিকের চিঠিতে যার নামে চিঠি তার নামই ভুল হওয়ায় শেষ পর্যন্ত শাপে বর হলো। হোটেলের রকে হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা যে ভদ্রলোকের সঙ্গে ইয়ে মল্লিকের ভুল-নাম দেবার কল্যাণে আলাপ তাঁর রেকমেণ্ডশানে অনেক বেশী কাজ হবার কথা যে হোটেলে জায়গা পাবার পর তা জেনেছিলাম ; ভদ্রলোক হোটেলের প্রতিষ্ঠাতা এবং অন্যতম অংশীদার। সে সময়ে ঝগড়া চলেছিলো হোটেলের অবাঙালী অংশীদারের সঙ্গে। নিজের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে চলে যেতে চাইছিলেন ভদ্রলোক। অবাঙালী অংশীদার গায়ে হাত বুলিয়ে মাঝে মাঝে থোক টাকা হাতে তুলে দিয়ে যাবার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলেন। অন্তরে অপার করুণা বাঙালীর প্রতি একজন অবাঙালীরও আজ ভারতবর্ষে আছে এমন ছুর্ণাম অবাঙালী যাদেরকে তাদের পরম শত্রু মনে করে সেই বাঙালীও দিতে পারেন না। আসল কথা বাঙালী ভদ্রলোক চলে গেলে কাশীর গ্র্যাণ্ড হোটেল গ্র্যাণ্ড সেল-এ উঠবে। তাই সময় কাটাচ্ছিলেন অবাঙালী মহাপ্রভু। প্রথমে গায়ে হাত বুলিয়ে আরও কয়েকটা দিন কাটাতে পারলে পরে মাথায় হাত বুলিয়ে নামে মাত্র টাকায় হোটেলের অংশ বাগিয়ে নিয়ে বাঙালীকে বার করে দিলে, বাঙালীরা ততদিনে যে ভুলে যাবে যে, এ হোটেল একদিন বাঙালীর ছিলো এবং এখন

অবাঙালীর, এ ধারণা আসাম এবং বেরুবাড়ীর পরও অনেক বাঙালীর কাছে নতুন শোনালেও, বাঙালী চরিত্র সম্পর্কে এই অবাঙালী সে স্পেকুলেশন অনেক দিনের এবং প্রায় অব্যর্থ রকমের কারেক্ট স্পেকুলেশন।

বাঙালী সেই ভদ্রলোকের আসল নাম কিন্তু কাশীর অনেকেই হয়তো তাঁর আসল নাম আজও জানে না। ভদ্রলোক কাশীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বড়বাবু। এই ডাকনামেই তাঁর নামডাক। বড়বাবু,—এই এক নামের মহিমা এমন সারা কাশী জুড়ে যে একডাকে সাড়া না দেবে এমন অবাঙালী একজনও নেই; এমন বাঙালীও এক-আধজনের বেশী নয়। বড়বাবুকে প্রথম যেদিন দেখি সেইদিন কেন জানিনে ছবির হেমিংওয়ে বলে মনে হয়েছিলো অবিকল। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি সজারুকণ্টকে আবৃত আননের মধ্যে বাঘের মতো জ্বল-জ্বলে ছুটো দারুণ বড় চোখে প্রাগৈতিহাসিক পর্বের ছায়া। নিদারুণ ভিরাইল সে তা একনজরেই চেনা যায় যার নজর আছে তার কাছে তো বটেই; যার নজর নেই তার কাছেও হয়তো। লম্বা চওড়া, অতিপুরুষ বড়বাবুর বুকের ছাতি তার ছুর্জয় মনেরও প্রতীক। চোখে নেশার রক্তিম ছটা কখনও ছাড়ে না। মুখে মুহুর্মুহু গাঁজার টান সিগারেটের অনির্বাণ কলকেয়। সুখটানের সঙ্গে ভক ক'রে ধোঁয়া-ছাড়ার বহর মেল ট্রেনের নিঃশ্বাস-উদ্গীরণের মতই। আশপাশ কিছুক্ষণের জন্যে কালোয় কালো। হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা প্রায় সময়ই। ওপর গায়ে ফতুয়া সম্বল। তার ফোকর দিয়ে লোমের ঘন বন থেকে আলোয় গাছপালার উঠে দাঁড়াবার। কণ্ঠস্বর গণগণে হৃদয়ের উত্তাপে গমগমে; চড়া পর্দার ভাবে। এক কথায় আজকের পরিভাষায় সভ্য মানুষ নয় অর্থাৎ তাদের একজন নয় যারা যা বলে তা বিশ্বাস করে না বলে এবং যা বিশ্বাস করে তা বলে না বলেই কেবলমাত্র সভ্য।

বুনো, জংলী এই বড়বাবু কাশীতে প্রথম এনেছে সাইকেল-রিক্সা যার সংখ্যা এখন কাশীতে মানুষের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী।

কাশীতে মধ্যবিত্ত মানুষদের আহার ও বাসস্থানের সুলভ ব্যবস্থার মূলেও বড়বাবু। কাশীর যেটিকে 'গ্র্যাণ্ড হোটেল' বলছি সেটির খাবারের ব্যাপার তদারক করতেন ব্যক্তিগত ভাবে এই বড়বাবুই। এখন আর করেন না; যেদিন করতেন সেদিনকার সুনাম-এর বেগ কমে এলেও, গতি এখনও থামেনি। তারই জোরে যে হোটেলে উঠলাম তার চাকা আজও চলছে; কিন্তু যে চালাল এই চাকা সে আজ চাকার নীচে ভাগ্যচক্রের আবর্তনে। তার জন্যে কোন বাঙালীর কাশীতে এতটুকু মাথাব্যথা আছে মনে করলে বর্তমান বাঙালী চরিত্রের পরিচয় ভুলে যেতে হয়। বিশ্বপ্রেমে অধুনা উদ্দীপিত বঙ্গসন্তান মানুষ হতে গিয়ে আড়াই কোটিতে ঠেকেছে। অবিলম্বে মানুষ হবার বদলে আবার বাঙালী হবার দিকে মন না দিলে কেবল বেরুবাড়ী থেকে নয়, সব বাড়ি থেকেই তাকে বেরুতে হবে। যে উপায়ে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানে পরিণত সেই একই অপূর্ব উপায়ে পশ্চিমবঙ্গেরও আর কোনও অস্থান-কুস্থান হতে দেরী হবে না কিন্তু। উদ্বাস্তুদের যারা বাঙাল জ্ঞানে ঘেন্না করছে বাঙালী জ্ঞান করতে পারছে না আজও তারা জানে না যে শরীর থেকে হাত বাদ গেলে বেহাত হলে কেবল হাতের নয় শরীরের ক্ষতি! পশ্চিবঙ্গের তালপুকুরে এই হতভাগ্যের ঘটি ডুবতে দেরী নেই আর। আসামে যার বর্ণপরিচয় হয়নি, বেরুবাড়ীতে তার বোধোদয় হবে এমন আশার মর্মান্তিক তামাশায় আর যেই উদ্যত হোক, আমি হইনে। হইনে তার কারণ আমি রবীন্দ্রনাথ নই। রবীন্দ্রনাথ হলে বলতে পারতাম: মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। রবীন্দ্রনাথ এই বলে বলি; 'বন'-মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখা অনেক বড় পাপ।

এ-হেন বড়বাবুকে হোটেলে একদিন বলেছিলাম: ইনসাইড কাশীর রিয়াল চেহারা দেখতে চাই। বলেই মাথার চুল ছিঁড়েছিলাম; কেন বলতে গেলাম। তখন রাত দশটা; কিন্তু হোটেল কলকাতা'র বাঙালীতে যতটা সম্ভব তার চেয়েও বেশী গমগম করছে।

বড়বাবু হাঁক পাড়লেন ঃ রহমৎ ? রহমৎ আসবার আগেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ; আপনার কত নম্বর ঘর ? সাতাশ তো ? আমাকে হাঁ, না, বলবার ফুরসৎ না দিয়েই সত্যো আগত রহমৎকে বলেন বড়-বাবু আজ হোটেলকে শুনিয়ে ; রহমৎ, সাতাশ নম্বরকা সাহাব একঠো মেয়েমানুষ মাঙতা। হোটেল সুদ্ধ লোক দেখি বারান্দায় হাজির মুহূর্তে। এই এক মজা দেখছি ; কাশী টু ক্যালকাটা—সর্বত্র। সব চেয়ে জনশূন্য, সব চেয়ে নির্জন পৃথিবীতে, একজন পুরুষের সঙ্গে সেই একজন মহিলা দেখা সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা দ্বিগুণিত। রাতের যে অন্ধকার গড়ের মাঠে একা বসতে ভয়ে কাঁপে সব চেয়ে দুঃসাহসী বুক। সেখানেও একজন 'খোঁপা' কি 'বিণুনী' গিয়ে বসুক একজন 'ধুতি' কি 'ট্রাউজার'-এর পাশে, আশে-পাশে দেখতে দেখতে গজিয়ে উঠবে ভুঁইফোঁড়ের দল। ছার পোকার মত ; মশার মত ; রাণীকে দেখতে কেরাণীর পঙ্গপালের মতো এরা কোথা থেকে বেরোয় এবং কোথায় প্রস্থান করে কে বলবে।

বারন্দার মঞ্চে উপস্থিত সেক্স-ষ্টার্ভডরা প্রস্থান করলে ; হেসে বিদায় নিলে রহমৎ,—বড় বাবুকে সবিনয়ে বলি ; মেয়েমানুষ নয় ; মানুষ দেখতে এসেছি কাশীতে। একজন সাচ্চা মানুষ মেয়েমানুষ, কলকাতা টু কাশী এক, যে মেয়েমানুষের বাসা আপনি বলছেন ; তার জন্যে কাশী আসার মতো বয়স বা পয়সা কোনটারই প্রাচুর্য নেই আমার। আমাকে কাশীতে এমন একজন মানুষ দেখাতে পারেন, যাঁর জন্যে কাশীতে মরা নয়,—বাঁচার মানে হয়—

'পারি' ; নির্দ্বিধান্বিত উত্তর আসে বড়বাবুর মুখ থেকে ; কাল সকাল দশটায় এসে আমার ঘরে টোকা দেবেন। নিয়ে যাবো। কাশীতে তেমন মানুষ একজনই আছেন। এখনও পর্যন্ত আছেন বটে ; তবে আর কতদিন আছেন, কে জানে !

কার উদ্দেশ্যে যুক্তকর উঠে যায় প্রণামের ভঙ্গীতে বড়বাবুর, জানিনে। তিনি যিনিই হন, তিনি যে 'সবা'-র 'রাম'-নাম উচ্চারণের উদ্দীপনা জোগাবার জাদু জানেন,—বড় বাবুর কণ্ঠস্বরের আর্দ্রতায়

এবং নাম করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করবার মধ্যেই তার প্রমাণ, সূর্যমুখীর মধ্যে সূর্য যাক্ত্রার মতোই সুস্পষ্ট।

আমার হাতও আমার কপালে ঠেকল আমার অজ্ঞাতসারেই।

পরের দিন সকাল সাড়ে দশটায় বেরুনো গেলো গোধূলিয়া থেকে সাইকেল-রিক্সায়। ভাড়া ছু আনা, যাত্রী ছু জন; আমি আর বড়বাবু! সোনারপুরা অঞ্চলে গিয়ে নামলাম বড় রাস্তায়। তারপরই গলির গোলকধাঁধা। যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম সেখান থেকে একা আবার হোটেলের ডেরায় ফিরে আসা অসম্ভব। দরজার কড়া নাড়তে খুলে গেল দড়িবাঁধা খিল দোতলা থেকে টান দিতেই। এই খিল খোলা এবং বন্ধের ব্যাপারটি কাশীর সব চেয়ে নিজস্ব জিনিষ। ওপর থেকেই দড়ি টানতে তবে খিল খোলে। এই, আর একটুখানি জায়গা ওপেন সব বাড়ীতেই; সেখানটা জাল দিয়ে ঘেরা,—বাঁদরের উৎপাত থেকে বাঁচবে। খিল খুলতে অবারিত হলো যে পথ সে পথ পাতালের থেকে উঠেছে স্বর্গে। দোতলার স্বর্গে ওঠবার সিঁড়ি কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের চেয়েও অন্ধকার। সিঁড়ির ছাদ এত নীচু যে প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দিলো আমাকে যে আমি বাঙালী; আজকের মোসাহেবদের ভারতে মাথা উঁচু করবার উপায় নেই। করবার চেষ্টা করলেই অবাঙালী বাধা। কাশীর সিঁড়ির ছাদের মতই মুহূর্তে হিট ব্যাক করবেই!

স্বর্গ এবং মর্ত্যের মাঝখানে সেই প্রেতলোকের অন্ধকার সিঁড়িতে যখন ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলছি সেই সময়েই ওপর থেকে স্বর্গের ঘণ্টাধ্বনি হোলো। ঘণ্টার মতোই গোল গোল নিটোল কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হলো প্রশ্ন; কে রে? বড়বাবুর উত্তর উঠে গেলো ওপরে আমরা ওপরে গিয়ে পৌঁছবার আগেই: 'আমি দিদিমা!' 'কে,—বড়?'—বোঝা গেল প্রশ্নকর্ত্রী কণ্ঠস্বরেই চিনেছেন আগন্তুককে। ততক্ষণে ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছি তুজনেই। ঘরের ভেতরে দিনের প্রথমালোকেও অন্ধকার দূর হয়নি পুরো! তারই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন যিনি

তাঁর গায়ের রঙ এই অতিবৃদ্ধ বয়সের সূর্যকে লজ্জা দেয়। প্রথম দর্শনে কাশীর দিদিমা সম্পর্কে আমার ধারণা পরে পরিবর্তিত হয়েছিলো; গায়ের রঙ নয়,—রং-এর গায়েই কে যেন রামধনুর রং ছিটিয়ে দিয়েছে। এ রং গায়ের নয়; এ রং সেই মনের,—সেখানকার রঙ্ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কারুর কারুর বেলায় মুছে না গিয়ে নতুন করে খোলে।

দিদিমাকে প্রণাম করে বড়বাবু বলেন: এই আমার দিদিমা—

দু' পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলি: আর আমার কাশীর দিদিমা।

কাশীর দিদিমা মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন: এ কে রে? বড়বাবু জবাব দেন: কাশীতে মানুষ দেখতে এয়েছেন; তাই নিয়ে এলাম তোমার কাছে; কাশীতে আমার মতে একটাই মানুষ আছে—

ভেবেছিলাম কাশীর দিদিমা নিশ্চয়ই বিনয় প্রকাশ করে বলবেন, 'কি যে বলিস!' কিন্তু সেদিক দিয়ে গেলেনই না কাশীর দিদিমা; বললেন: 'ও? লেখে বুঝি?' কাশীর দিদিমার কথায় চমকে উঠি; মুখ-পড়তে জানেন নাকি? আমি তো বটেই; কাশীর দিদিমা যার কাছে কাশীর একমাত্র মানুষ,—সেই বড়বাবু পর্যন্ত সে আজকের চেয়ে একটু বেশীই, হতবাক হয়েছেন, বোঝা যায় তাঁর পরের প্রশ্নে। বড়বাবুও যে এতটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না তা প্রকাশ হয়ে পড়ে অতঃপর তাঁর কথাতেই: কি করে বুঝলে দিদিমা,—যে ইনি লেখেন?

কাশীর দিদিমা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দেন প্রশ্নের পিঠ-পিঠ উত্তর: লেখক না হলে এত বোকা আর কে আছে যে মানুষ দেখবার জন্যে কলকাতা থেকে কাশী আসবে?

কাশীর দিদিমা যে সত্যিই কাশীর দিদিমা সেই মুহূর্তে শুধু এইটুকুই মনে হয়েছিলো আমার!

অনেক পরে অবশ্য মনে পড়েছিলো আরও অনেকের কথা।

দেশে বিদেশে এমন শিক্ষিত মূর্খ অনেক, যাদের মুখে প্রায়ই শুনি, গল্প লেখার জন্যে দেশ দেশান্তর না করলে লেখক হওয়া যায় না। পদব্রজে পৃথিবী ভ্রমণ করে যারা তারাই যে পৃথিবীর সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক হতো, এ কথা কিন্তু তাদের মুখে শুনি না। বালজাক যে প্রায় ঘরে বসেই, বাড়ীর বাইরে পা না বাড়িয়েই এমন গল্প লিখেছেন যা দ্বিতীয়বার আর কারুর কলম দিয়ে বেরুলো না আজও, একথাও অবশ্য শুনি না তাদের মুখে। গল্প লেখবার জন্য যার দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে হয় সে বালজাক নয়; সে বড় জোর সমার্সেট মম্।

এবং আমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যাঁর কথা মনে না পড়ে পারে না, তিনি হচ্ছেন ইথেল মানিন। সমার্সেট মম্ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে কনফেশনস্ এণ্ড ইম্প্রেসানেসে তিনি বলেছেন: 'One would have thought that anyone who knew as much about human nature as the author of The trembling of a leaf, The painted veil, and the sacred Flame, would have seen through the fallacy that travel broadens the mind or is of any value in creative work...

কিন্তু ইথেল মানিন ইথেল মানিন। বিপুল তাঁর পড়াশুনো, বিস্তর তাঁর বুদ্ধি। কিন্তু কাশীর দিদিমা? তিনি কেমন করে জানলেন যে জীবনের গল্প হচ্ছে ছাই-চাপা আগুন; প্রতি সংসারেই তার অস্তিত্ব আদ্যন্তকাল পর্যন্ত অব্যাহত। জীবনের গল্পের জন্যে দেশে দেশে, দেশে বিদেশে যেতে হয় না। বরং প্রতি সংসারে যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই। পেলেও পাইতে পারে অমূল্য রতন! জীবনের গল্পের চেয়ে কোন রতন আর অধিক অমূল্য!

আমাদের দেশে কয়েক শ্রেণীর আরও শিক্ষিত আরও ইডিয়াট আছে যারা প্রায়ই বলে, শুনি, আমাদের জীবনে তেমন থ্রিল কই?

থোড়বড়ি-খাড়া, খাড়াবড়ি-থোড় এই জীবনে গল্প কোথায়। গল্প আছে ওদের জীবনে। নায়িকাকে নিয়ে উড়ো জাহাজে করে পালাচ্ছে অতিনায়ক ; আর নায়ক সাবমেরীনে ফলো করছে তাকে। কি থ্রিল ভাবুন একবার ?. এডগার ওয়ালেশ অথবা না বলে এর বাঙলা অনুবাদে যে থ্রিল সে থ্রিল জীবনের থ্রিল নয় ! জীবনের গল্পকার যে সে এর জন্যে দুঃখ করে না ; তার দুঃখ তার নিজের, তার কাছের জীবনকেও যথেষ্ট না-দেখার দুঃখ ; তাই তার মুখে শুনি—

'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির-বিন্দু !'

কাশীর দিদিমার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিনের প্রথম কথাটা তুলিনি ; আর মনে আছে প্রথম দিনের শেষ কথাটা। চলে আসবার উদ্দেশ্যে প্রথম দিন যখন আবার পায়ের ধুলো নিয়ে বলেছি : আবার দেখা হবে,—তখনও কাশীর দিদিমা বিনয় করেননি, বলেননি যে নিশ্চশই, নিশ্চয়ই, যা বলা এই সভ্যসমাজের, ক্রম ক্যাল টু কাশী এক দস্তুর; বরং তার পরিবর্তে বলেছিলেন, 'দেখা হলে ভালো, নাহলে আরও ভালো।'

পৃথিবী জুড়ে মনে রাখার মতো কথা এত বার এত লোক বলেছে যে তা দিয়ে সম্ভবতঃ ত্রিভুবন মুড়ে দেওয়া যায়। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' থেকে আরম্ভ করে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' পর্যন্ত কথামৃতের তো কথাই নেই ; অনেক বাজে কথাও কেবল বার বার বলে বলে শেষ পর্যন্ত কাজের কথা বলে চলে গেলো। যেমন আমার অভিধানে অসম্ভব বলে কোনও কথা নেই। যার অসম্ভব বলে কিছু নেই, তার সম্ভব বলে কিছু আছে কি ? নিজের উন্মাদনা চরিতার্থ করবার কারণে লক্ষ লক্ষ লোককে বাঁচার লক্ষ্য থেকে চ্যুত করে। যুদ্ধের উপলক্ষে বলি দেওয়া অসম্ভবের পায়ে এ এক আমাদের মতো ক্লীব দৃষ্টিকোণ থেকেই কেবলমাত্র যিনি বীর সেই নেপোলিঁওর পক্ষেই সম্ভব,—আর কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়, সত্যিই অসম্ভব। এমনই আরেক নির্বোধ-উক্তি হচ্ছে, আরাম হারাম হ্যায়। যে

আরাম করে না সে কাজও করে না। যার আরাম নেই, তার কাজ নেই, কাজের ব্যারাম আছে কেবল।

কিন্তু কাশীর দিদিমার এই, 'হলে ভালো, নাহলে আরও ভালো ;' একথার আর মার নেই। সংসারে থেকে একথা সে প্রতিপদক্ষেপে বলতে পারে সে-ই কেবল 'সব' ত্যাগ করে সার-কে পেয়েছে শেষ পর্যন্ত। এ-কথা কাশীর দিদিমার স্বরচিত নয় নিশ্চয়ই ; অন্যের মুখ থেকে এসেছে তাঁর সম্মুখে। তবুও। তবুও, কাশীর দিদিমার মুখেই একথা সাজে ; অন্যলোকের মুখে লাঠি বাজে। তাঁর মুখে শুনলে মনে হয় অন্যের কথা। অনেক কথা ভুলিয়ে দেয় এই অনন্য কথাটি।

প্রথম সাক্ষাতের দিনে কাশীর দিদিমা আসবার এবং ঢোকবার মুহূর্তে দুটি অবিস্মরণীয় উক্তির মধ্যে আরেকটি স্মরণীয় কথা বলেন। সেটি একটি প্রশ্নের উত্তরে কাশীর দিদিমা ব্যক্ত করেন। প্রশ্ন করেন তিনি এক সময়ে : কাশীতে এসে বিশ্বনাথ দর্শন করেছ ? জবাব দিই : না। কাশীর দিদিমার ব্যবহার আবার উল্টোপথ ধরে। লোকে কাশী এসে বিশ্বনাথ না দেখলে রাগ করে ; কিন্তু একি আশ্চর্য স্ত্রীলোক, কাশীর দিদিমা ! শুনে খুসী হন : ভালো করেছ ; খুব ভালো করেছ। ৺বিশ্বনাথ দর্শন না করে। লোকে চোখ তৈরী হবার আগেই হড়বড় করে কাশীশ্বরসন্দর্শনে যায় ; কাজেই তার দেখা হয় কিন্তু বিশ্বনাথ দর্শন হয় না। কাশীতে এসে প্রথম যাকে দেখবে তিনি হলেন সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গস্বামী।

আমি বলি : কিন্তু ওতো ত্রৈলঙ্গর মূর্তি, ত্রৈলঙ্গ নয়—

কাশীর দিদিমা উত্তর দেন : 'চোখ না থাকলে,—মূর্তি ; চোখ থাকলে দেখবে,—স্বয়ং বিশ্বনাথ ওখানে মূর্ত ! তবে তাঁকেই দেখব, প্রথম !'—বলে চলে এলাম।

কাশীর দিদিমার কাছ থেকে প্রথম দিন হোটেলে ফেরার পথে আরেকটি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়,—যারও দ্বিতীয় নেই। আসাম

এবং বেরুবাড়ীর পর বিশেষ করে আমার কাছে এই অভিজ্ঞতা অমূল্য। ব্যাপাটা সংক্ষেপে এই। হোটেলে ফেরার পথে রাস্তার ওপর রকে বসে একজন মালাই ইত্যাদি নিয়ে বসে আছে দেখি। লোকটার স্বাস্থ্য চেয়ে দেখবার মতো। বাইসেপ এতো উঁচু যে হাতের আঙল কাঁধ ঠেকে না। তার সামনে দণ্ডায়মান বাড়িওলা স্বয়ং; তুলে দেবার চেষ্টা করছে সে মালাইওলাকে বহুদিন। ওই রক সংলগ্ন আর সব ঘরকে তুলে দিয়েছে; পারেনি কেবল মালাইওলাকে। মালাইওলা অন্যদিন হয়ত কথাই বলে না; আজ নেমে এলো নীচে। এসে মালিকের সব কথা শোনবার পর মালাইওলা হঠাৎ নরম গলায় বললো ঃ হাম এক বাত বাৎলাই ?—অর্থাৎ আমি একটা কথা বলি এবার ? বললে এমন সুরে যেন রাধার মান ভাঙাতে কৃষ্ণের বাঁশি বাজছে! বলে, সেই একই স্বরে মালাইওলা তার বক্তব্য পেশ করে ঃ আদালত তুমার হো; ঘর তুমার হো; আইন ভি তুমার হো; পুলিশ তুমার হো, লেকিন, —অর্থাৎ আদালত, ঘর, আইন, পুলিশ সব তোমার, কিন্তু—! লোকটা থামে; আর কয়েক মুহূর্তের সে কি সাসপেন্স! যেন হিচককের ছবির চরম মুহূর্তের বর্ষণের আগে কয়েক মোমেণ্টের লাল। তারপর সেই বাইসেপওলা হাত যার কারণে আঙুল কাঁধে ঠেকে না,—মালাইওলা সেই হাত শূন্যে তুলে গর্জন করে ওঠে ঃ লেকিন, আবি এইসা মার মারে—!

যখন স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতে আসামের মতো ঘটনা ঘটে তখনই আমার মালাইওলার কথা মনে পড়ে। কাশীর সেই মালাইওলা। হিংসা খারাপ জানি; কিন্তু নির্বীর্যের অহিংসার চেয়ে বোধ হয় ভালো। তাছাড়া রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হবারই কেবল প্রয়োজন আছে যে তা নয়; বাল্মীকি থেকে রত্নাকরও হতে হয় কখনও কখনও যে; মরা মরা বলতে বলতে যেমন রামং রামরাজ্যে তেমনই রাম-রাম বলতে বলতে তেমনই কখনও কখনও প্রতিবাদের মার-মার আওয়াজ করা চাই।

॥ আট ॥

তলস্তয়ের গল্পের নায়ক সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার আগেই, সূর্যদেব বসবার আগেই পশ্চিমাকাশের পাটে, জমি জিতেছিলো দৌড়ে অঢেল। কিন্তু জীবনের সন্ধ্যা যে তার অনেক, অনেক আগেই অপরাহ্ন থেকে গড়িয়ে গিয়েছিলো সায়াহ্নে, জীবনসূর্যে নির্বাপিত হয়েছিলো প্রাণের অগ্নি; সে হতভাগা যখন তা জানতে পেলে তখন সে আরও যা জানতে পারল অথচ কাউকে জানাতে পারলো না, তলস্তয় তাঁর হয়েই তা সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষের দেহ কবরে দিতে যে সাড়ে তিন হাত জমির মাত্র দরকার হয়,—সব মানুষই সেই সাড়ে তিন হাতেরই জমিদার হতে পারে মাত্র। তার বেশী নয় এক ছিটেরও; অথবা এক তিল নয় কমেও। মানুষের দেহটারই মাপ সাড়ে তিন হাত। এই দেহ ছাড়াও মানুষের মধ্যে নিশ্চয়ই আরও কিছু আছে কোনও দেশে, কোনও কালে যার কোনও পরিমাপ নেই। দেহের মাপ আছে, মৃত্যু আছে; প্রয়োজন আছে তার তাই সাড়ে তিন হাত জমির। আত্মার পরিমাপ নেই; তার মৃত্যু নেই; অতিরিক্ত এই সাড়ে তিন হাতের অতিরিক্ত সে তাই।

কিন্তু ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে যখন কাশীর গঙ্গায় তাঁর দেহাবসান হলে সমস্ত শহর পরিক্রমার পর গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবার আগে শেষ দেখার জন্যে খোলা হলো শবাধার,—তখন দেখা গেল ত্রৈলঙ্গের দেহও সেই আধারে নেই। অর্থাৎ দেখা গেল যে তাঁকে দেখা গেল না। মানুষ মাত্রেরই আত্মা মৃত্যুঞ্জয়। ত্রৈলঙ্গের দেহও মৃত্যুকে জয় করেছিলো জীবনে। দেহেও তিনি ছিলেন দেহাতীত। তাঁর দেহ সাড়ে তিন হাতের চেয়ে বেশী ছিলো আর এক হাত। লম্বায় সাড়ে চার হাত এই মানুষ সেই অতিরিক্ত আর এক হাত দিয়েই অতিরিক্ত মৃত্যুকে দেখে নিয়েছিলেন এক হাত।

এই 'সাড়ে চার হাত' মানুষকেই দেখতে গেলাম কাশীর দিদিমার কথা মতো সর্বাগ্রে।

কাশীর দিদিমা কেবল ওই টুকুই বলেননি ; আরও বলেছিলেন। আরও বলেছিলেন যে : 'লৌকিক শরীরে তোমরা যাকে অলৌকিক বল, তার এমন আশ্চর্য প্রকাশ আশ্চর্যের চেয়েও একটু বেশী। শাস্ত্রে মানুষের যেসব অবস্থা হতে পারে বলে বলা হয়েছে ত্রৈলঙ্গকে না দেখলে বোধ হয় বলতাম মানুষের অমন অবস্থা হতেই পারে না।' ত্রৈলঙ্গের দীক্ষিত শিষ্যের কথা বলতে পারি না ; তাঁর ভক্তের শেষ নেই, বলতে পারি। কাশীর দিদিমা ভক্ত নন ; 'ভক্তি'। ত্রৈলঙ্গের 'ভক্তি'র প্রতিমূর্তি কাশীর দিদিমা।

কাশীর দিদিমা বাড়িয়ে বলেননি। আলোয়-আলোয়, রাগে-অনুরাগে, মেঘে-রৌদ্রে, সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, শীতে-গ্রীষ্মে, জলে-ডাঙ্গায়, আভরণে-অনাবরণে, জীবনে-মরণে এমন সমদৃষ্টি, এমন বিষম অভিজ্ঞতার তুলনা নেই কাশী কাঞ্চী, কোথাও !

ভগবানের সব চেয়ে কাছে থাকে যে ভক্ত, ভগবান থেকে সে থাকে সব চেয়ে দূরে,—এর প্রমাণ পেতে দূরে যেতে হবে না ; কলকাতা থেকে যেতে হবে কাশী। ত্রৈলঙ্গ বলতে 'কাশী'-র মুখ দিয়ে লাল পড়ে ; চোখ দিয়ে ভক্তির মৃদু অশ্রু, জোড়করে ওঠে কপালে, লোম দাঁড়িয়ে ওঠে গায়ে ; শরীর কাঁপতে থাকে কাশীর। কিন্তু কাশীতে যাদের দীর্ঘকাল ধরে বাস নয় কেবল, যে কোনও উপলক্ষ্যে নির্জলা উপবাস, তাদের অনেককে জিজ্ঞেস করুন ; ত্রৈলিঙ্গর আসন কোথায় কাশীতে ; দেখবেন তাদের অনেকের মুখই বড় করুণ ; তাদের অনেকেই একাশিতে পড়েও শুধু শুধুই এ-কাশীতে পড়ে আছেন। কাশীর সচল বিশ্বনাথ যেখানে বসে মাটির নয়, 'মা'-টির আরাধনা করে গেছেন ; সেখানে আজও তার অপূর্ব কৃষ্ণবর্ণ 'সাড়ে চার হাত' মূর্তি বিরাজমান তার খবর দিতে পারবে না।

পারবেন কি করে ? যাঁর কথা বলছি তাঁর তো দেশ-বিদেশ জুড়ে

জন্মোৎসব পালিত হয় না কোথাও। হবে কেমন করে? জন্ম-মৃত্যুর ছুয়েরই তিনি অতীত; যাঁর আদি নেই; নেই অন্ত—তিনি অনাদি এবং অনন্ত, কোন্ বিশেষ তিথি হবে তাঁকে স্মরণ করার যোগ্য,—তিথির অতীত, এ পৃথিবীতে সেই 'অ'-তিথির। পারবেন কি করে? যাঁর কথা বলছি তাঁর তো রচনাবলী নয়; তাঁর যে কেবল 'অহং'বলি!

একটা কথা একটু আগেই যে বলেছি, কাশীতে অনেকেই সচল কাশীশ্বর কোথায় বসে আছেন 'মূর্তি' হয়ে এখনও তা জানেন না,—মাফ করবেন, তার মধ্যে আপনাকে ধরিনি আমি। এই বসুমতী হরেকরকমের রসের এবং রসদের আয়োজন সত্ত্বেও যদি আপনি নেহাৎই এই প্রতিক্রিয়াশীল রচনার পাঠক হন, এবং আপনি দৈবাৎ যদি হন কাশীর লোক, তাহলে জানবেন আপনি আমার লক্ষ্য নন। আমার ঘাড়ে একটাই মাথা আছে কি না। আপনি ছাড়া আরও যে লক্ষ লক্ষ লোক আছেন কাশীতে তাঁরাই আমার উপলক্ষ্য। আরও একটা কথা। আপনি যদি পাঠক না হয়ে পাঠিকা হন; লোক না হয়ে কাশীর স্ত্রীলোক,—তাহলে শুধু মাফ নয়,—বিশ্বাস করবেন,—আপনাকে আমি অমন কথা বলতেই পারি না। বরং তার বদলে যা বলতে পারি তা হচ্ছে ত্রৈলঙ্গর আসন কোথায় আপনি ছাড়া আর কে জানে? ক'লকাতা থেকে কাশী কোনও একজন লোক আরেকজন লোকের মত নয়; কিন্তু স্ত্রীলোকের কলকাতা টু কাশী তো বটেই, ত্রিলোক জুড়ে স্ত্রীলোক সর্বত্র আদি ও অকৃত্রিম এক। কাজেই, আপনি যদি পাঠিকা হন তো, আপনি কাশীতে পদার্পণ না করলেও ত্রৈলঙ্গর তো বটেই, যাঁর আদি এবং অন্ত নেই বলেছি, তাঁরও আদ্যন্ত সব জানেন আপনি, এ কথা যে না জানে তাঁর তুল্য হতভাগ্য আর কে? আমার স্ত্রী-পুত্র আছে; ঘরবাড়ী আছে। পাঠিকাকে কিছু বললে আমি, তখন আর বাড়ী নেই, তখন আছে বেরু শুধু বেরুবাড়ী!

বেণীমাধবের ধ্বজার কাছে নৃসিংহ-দাঁড়ার ঘাট; আর তার

অনতিদূরেই ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর সমূর্ত্তিক আসন আশ্রম। পঞ্চগঙ্গার ঘাটের ওপরেই একদিন দাঁড়িয়েছিলো স্মরণের অতীত এক কালের অবিস্মরণীয় সাক্ষী বিন্দুমাধবের মন্দির। কাশীখণ্ড বলছেন, অগ্নিবিন্দু নামে এক সাধকের স্তবে কাশীধামে আবির্ভূত মাধব প্রীত হয়ে বলেন, যতদিন কাশীর নাম আছে, ততদিন তোমারও নাম রইবে আমার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। বিন্দুমাধবকে তাই হিন্দুরা উত্তরবাহিনী গঙ্গায় অবগাহন করে উঠে প্রণাম করতেন। বিন্দু এবং মাধবের নাম করতেন, প্রণাম করতেন একসঙ্গে।

সেদিনকার কাশীতে বিন্দুমাধবের প্রস্তরনির্মিত জয়ধ্বজাই ছিলো সব মন্দিরের চুড়ো ছাড়িয়ে। তার পর এলো ঔরংজেব। হিন্দুমন্দিরের উন্নত শিবকে অবনত করবার ব্রতয় বিব্রত করে তুলালো বিন্দুমাধবকে। ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে তাঁর ধ্বজা, বানালো মসজিদের মিনারেট। কিন্তু তবুও কাশীর কাছে, কাশীবাসীর কাছে তাঁর পরিচয় আজও অপরিবর্তিত। বেণীমাধবের ধ্বজা বা মাধোজীকা ধরারা। বিন্দু-মাধবের অস্তিত্ব এখনও এর কাছেই নবনির্মিত এক মন্দিরে অব্যাহত।

এরই অনতিদূরে কাশীর সচল বিশ্বনাথের অচলায়তন।

ত্রৈলিঙ্গর মূর্তি ছাড়াও এখানে তাঁর আরাধ্যা দক্ষিণা-কালিকার মূর্তি বিরাজমান। সেই মূর্তি যাঁকে ওপর তলায় রেখে নীচের তলায় বসতেন ত্রৈলিঙ্গ। ভক্ত প্রশ্ন করেছিলো: আপনার 'মা' ওপর তলায় তো আপনি সেখানে সাধনায় না বসে, নীচের তলায় এখানে বসে কেন। ত্রৈলিঙ্গ বললেন: যা ওপরে গিয়ে দেখে আয় তো 'মা' কোথায়? ভক্ত ওপরে গিয়ে দেখে মাতৃমূর্তি সেখানে নেই।

'আমাকে'-ই পূজো করে যে তার 'মা-কে' পাওয়া যায় বাইরের মন্দিরেই শুধু; আর আমাকে নয়, 'আমাকে'র মধ্যে মাকে যে পূজা করে তার মা থাকে যে মনের মন্দিরে। তাকে খুঁজতে একতলা দু'তলা করতে হবে কেন?

অনেক সিঁড়ি বেয়ে তবে নেমে গিয়ে দাঁড়াতে হয় ত্রৈলিঙ্গের

আশ্রমে তাঁর ভয়ঙ্কর অভয়ঙ্কর মূর্তির সামনে। নাম করতে হয় তাঁর। কোন্ নাম জানি না ; ত্রৈলিঙ্গ, না ত্রৈলঙ্গ না তৈলঙ্গ। সেক্সপীয়ারের মতো বলতে জানি না, নামে এসে যায় না। কারণ নামে এসে যায়। গাঁদাকে মেরিগোল্ড বললে যখন জগতে সর্বত্রই ছ'-পয়সা থেকে ছ'-আনায় ওঠে দাম, তখন নামে এসে যায় না বলি কেমন করে ? কিন্তু সেজন্যে নয়, নামে সত্যি এসে যায়। আমি বলছি বলেই একথা সত্য নয় ; সত্য বলেই আমি একথা বলছি! নাম দ্বারাই সব ; নামহারা শুধু শব।

যাঁরা ত্রৈলঙ্গর আসল নাম কি ছিলো তাই নিয়ে উত্তেজিত হতে ভালোবাসেন, ত্রৈলিঙ্গর এই জীবনকাব্য তাঁদের জন্যে নয়। বিদ্যাসাগর অথবা রামমোহন, নাকি ডেভিড হেয়ারের গায়ে ক'টা তিল, ক'টা আঁচিল ছিলো, কটাক্ষ করে ব'লছি না এই নিয়েই যাদের মাথাব্যথা এ জীবনকাব্য তাদের জন্যে নয়। কারণ, বাঙ্গালা ভাষায় লেখা হলেও আমি যা লিখতে যাচ্ছি তা জীবনচরিত নয় ; একটি জীবন্ত চরিত্র।

ত্রৈলিঙ্গ, রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপা, এঁদের এক নাম ছিলো না, অনেক নাম ছিলো। কাজেই এক নাম করলে অনেক নাম করা হয় ; অনেক নাম করা হলেও সেই 'এক'-এর নামই করা হয়। অনেককে প্রণামের মধ্যে সেই 'এক'-কে প্রণাম করা ; এক-কে প্রণাম করার মধ্যেই হয় অনেককে প্রণাম করা।

তাই বলতে পারব না, ত্রৈলিঙ্গ না তৈলঙ্গ ; তিনি দেড়শো বছর ছিলেন কাশীতে, কিম্বা পঁচানব্বই বছর পর্য্যন্ত। আমি যে নামে প্রণাম করছি ত্রৈলিঙ্গকে, সে নাম, কাশীর দিদিমার কথা ধার করে বলি, সেনাম-ধাম ঠিক হলে ভালো ; না হ'লে আরও ভালো।

বাঙলা এগারশো আট সাল। নেপালের সেনাপতি গুলি মেরেছেন বাঘকে। বাঘের গায়ে গুলি লেগেছে ; জখম হয়েছে ঃ কিন্তু মরেনি। বিকট আর্তনাদে বনভূমি কাঁপিয়ে সে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছে

এক সাধুর পায়ে। পায়ে পায়ে একটু বাদেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে নেপালের সেনাপতি। থেমে গেছে নিঃশঙ্ক সাধুর সামনে গৃহপালিত পশুর মতো চোখ বুঁজে নিঃশঙ্কতর সেই শার্দুলকে বসে থাকতে দেখে। তার হাতের উদ্যত বন্দুক নেমে এসেছে নিজের অজান্তে। চির উন্নত শির নত হয়েছে কখন, সাধুর পায়ে হয়েছে প্রণত, সে নিজেও জানে না। তার বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে অবারিত হয় এক অদৃষ্টপূর্ব জগতের সিংহদ্বার সাধুর মেঘমুক্ত দিনের আকাশে সূর্যালোকের চেয়েও সহস্রগুণ দীপ্ত হাসিতে। সে হাসিকে দিয়ে সাধু একথাই বলতে চেয়েছিলেন সেদিন যে গহন অরণ্যের আদিম হিংস্রতম নরখাদকও নিরুপায় হলে লুটিয়ে পড়ে মানুষের দুপায়ে-ই, যদি নর দেখতে পায় সকলের মধ্যেই নারায়ণ আছেন।

মানুষের মধ্যে চৈতন্য আবির্ভূত হলে বনপরিক্রমায় বাঘ এবং বলদ দুই হয় মানুষের বনসঙ্গী। কারণ তখন নারায়ণ যে নরের মনোসঙ্গী। এর চেয়ে লৌকিক আর কিছু হতে পারে না,—এই 'অলৌকিক' অঘটনের মতো।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে লোক বলছেন, হিংস্রকে হিংসা কোর না; সিংহও তার হিংসা ভুলে যাবে;—সেই লোকই, আবার হাতীকে নারায়ণ জ্ঞান করে শুয়ে পড়লেও হাতী যখন বিশ্বাসীকে পায়ের তলায় পিষ্ট করছে, তখন বলছে : মাহুত-নারায়ণের বারণ না শোনার ফলেই এমন দুরবস্থা ভক্তের,—এ কেমন কথা? তার উত্তরে বলি, এ কেমন নয়, এই কেবল এক মাত্র কথা। অর্থাৎ সকলের জন্যে নয় সব কথা। যার সাজে তার সাজে অন্যলোকের লাঠি বাজে। মুখে রামকৃষ্ণ মনে রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করলে রামও না; কৃষ্ণও না; রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার তো বাঁচাবার ক্ষমতাই নেই।

লোকে বলে, স্ত্রীলোকে তো বলে বটেই সবই যদি সেই বৃন্দাবনের একমাত্র পুরুষের ইচ্ছেয় হয়, তাহলে পুরুষকারে যদি কিছুই না হয়,—তাহলে তো পুরুষ মানুষের ঘরে শুয়ে থাকলেই হয়, সেই একমাত্র 'পুরুষই' তাহলে খাওয়াবেন, পরাবেন। জিব দিয়েছেন

যিনি আহার দেবেন তিনি,—এ মনে করে ঘরে যে সত্যিই শুয়ে থাকতে পারে তাকে নিশ্চয়ই দেবেন। কিন্তু যারা বলে তারা কেউ পারে কি সত্যিই ঘরে শুয়ে থাকতে ? দ্রৌপদী যতক্ষণ বিবস্ত্র হবার লজ্জায় বস্ত্রের খুঁট চেপে ধরেছিলেন ততক্ষণ দেখা দেননি শ্রীকৃষ্ণ। যেই দুই হাত তুলে দিয়েছেন মাধবের দিকে, দিকে দিকে অমনই দেখা দিয়েছে বস্ত্রের পর বস্ত্রের সম্ভার। দুর্যোধন মায়ের সামনেও হতে পারেননি নিঃসঙ্কোচ ; উরুর আবরণ করেননি উন্মুক্ত। উরু ভঙ্গেই কুরুরাজ ভঙ্গ হয়েছেন তাই!

আগুনের মধ্যে গুণাতীতকে দেখে যে প্রহ্লাদ সে নরকে স্পর্শ করে এমন বৈশ্বানর কোথায় ? জিব দিয়েছেন যিনি তিনি আহার দেবেন ; ঠিকই। কিন্তু জিব দিয়েছেন তিনি চাইলেই জিবে গজা দেবেন, এমন বিশ্বাস করলে হাতীর পায়ের তলায় পিষ্ট হতেই হবে। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ যখন শুদ্ধা ভক্তি ছাড়া আর কিছু চাইতে পারলেন না, একবার নয়, বার বার তিনবারই ব্যর্থ হলেন, তিনি যা চাইবেন তাই পাবেন জেনেও, বৈরাগ্য ছাড়া আর কিছু চাইতে, তখন বিবেকানন্দকে বলেছিলেন : 'যা, আজ থেকে তোর মোটা ভাত-কাপড়ের ভাবনা হবে না!' ইচ্ছে করলেই তিনি পোলাও কালিয়ার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করতে পারতেন, কিন্তু করেন নি।

করেননি, তার কারণ রাজা জনকের যা সাজে অন্য লোকের পক্ষে তা যে বিপজ্জনক এ যিনি জানেন শুধু তিনিই হতে পারেন রাম এবং কৃষ্ণ ; ইদানীং রামকৃষ্ণ।

লোকে আরও বলে ; স্ত্রীলোকে তো বলে বটেই যে সবই যখন তাঁর ইচ্ছেয় হয় তখন আর পাপ-পুণ্য কি ; স্বর্গ-নরক কেন ? যতক্ষণ তোমার পাপ-পুণ্য বোধ আছে ততক্ষণ আছে স্বর্গনরক। পাপ-পুণ্য দুয়েই যখন শূন্য বোধ হবে তখনই কেবল স্বর্গ-নরক নেই ; নেই জন্ম-জন্মান্তর। বিবেকানন্দ সম্পর্কেই কেবল রামকৃষ্ণ বলেছিলেন : ওর কোন কিছুতেই কিছু পাপ নেই! রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ যা করলে সাজে তা যুগান্তর-সম্পাদক বিবেকানন্দ

মুখোপাধ্যায় করলেও যে ঠিক হবে, এমন কথা অন্যে বললেও, যতদূর জানি, রামকৃষ্ণ বলেন নি। বলে জাননি বলেই তো জানি তাই!

তাই ব্যাঘ্রচর্মাসনে বসে, মুখে নারায়ণ, মনে নগদ নারায়ণ বললে বাঘ এসে আশ্রয় নেবে না মার্জারের মতো পায়ের কাছে। কিন্তু শার্দুলের মধ্যে দুলে উঠতে দেখবে সিংহবাহিনীকে, শুধু সে-ই যে ৺কালীর গায়ে প্রস্রাব ছিটিয়ে দিয়ে বলতে পারেন : গঙ্গোদকং! কালীর গায়ে তা ছিটোণো কেন,—এ জিজ্ঞাসার জবাবে যিনি বলেন : 'পূজা'—এ এক তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

নেপালের সেনাপতির গুলি-লাগা বাঘ যাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলো বেড়ালের মতো, সেই সাধুই আরেক সময়ে বসেছিলেন প্রয়াগে। সন্ধ্যার সময়ে 'গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া' সঞ্চারে 'ঈষাণের পুঞ্জ মেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে' এল দেখে রামতারণ ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ সেই সাধুকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে এলেন। সাধু হাসলেন। সেই প্রসন্ন বন্ধুর মতো মেঘমুক্ত দিনে আকাশের হাসি। দূরে অঙ্গুলি সংকেত করলেন সাধু। প্রলয়মদির জলে যাত্রী-নৌকা তার শেষ নিঃশ্বাস গুণছে। রামতারণের পলক পড়বার আগেই অন্তর্হিত হলেন সাধু। ডুবন্ত নৌকা ভেসে উঠল জলের ওপর। তীরের দিকে ছুটলো তরী তীরের বেগে।

নৌকা থেকে নিরাপদে সবাই নামবার পর সবাই অবাক হয়ে দেখলো,—সুদীর্ঘ সাড়ে চার হাত এক কৃষ্ণ জ্যোতি নেমে যাচ্ছেন নৌকা থেকে। সবায়ের মনে প্রশ্ন, নৌকায় তো ইনি ছিলেন না; ইনি কে? রামতারণেরই কেবল প্রশ্ন নেই। সে তার উত্তর পেয়ে গেছে; সব প্রশ্নের যা শেষ উত্তর,—তিনি কে?

এই সাধুই মূর্তির মধ্যে মূর্ত বিশ্বনাথকেই প্রথম দর্শন করতে গিয়েছিলাম কাশীতে। কাশীতে পা দিয়ে অচল বিশ্বনাথের আগে গিয়েছিলাম সচল বিশ্বনাথের কাছে। কাশীতে যদি কোনও পাপ

করে থাকি তা ওই একটিই; কাশীতে যদি কোনও পুণ্য অর্জন করে থাকি তাও ওই একটি।

কাশীর বিশ্বনাথ কে, বিশ্বনাথের মন্দিরে যিনি তিনি, না বিশ্বের যত অনাথের মনের মন্দিরে যাঁর বাস সেই ত্রৈলঙ্গ?—এর উত্তর স্বয়ং বিশ্বনাথ ছাড়া আর কে জানে?

মুক্ত পুরুষের আচরণ সম্পর্কে শাস্ত্রের সাক্ষ্য হচ্ছে, জড়বৎ, শিশুবৎ, উন্মাদবৎ আচরণ লীলা করবে যাঁর মধ্যে তিনিই কেবল যথার্থ মুক্তপুরুষ। ত্রৈলঙ্গ ছাড়া শাস্ত্রের এই ব্যাখ্যার জীবন্ত কোনও সাক্ষী নেই। রামকৃষ্ণ তাই এঁকে দেখে বলেছেন: দেখলাম, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তার শরীরটা আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন। রোদে বালি এমন তেতেছে যে পা দেয় কার সাধ্য? সেই বালির ওপরই শুয়ে আছেন।

কাশীর দিদিমা বলেছিলেন, শাস্ত্রে যা যা বলেছে, মানুষের যে সব অবস্থা হতে পারে বলে, তা যদি ত্রৈলিঙ্গ এসে দেখিয়ে না দিতেন, তাহলে ছুঁড়ে ফেলে দিতাম সব শাস্তর ওই গঙ্গার জলে।

বলেছিলাম, মনে আছে, সে কি শাস্ত্রের চেয়ে মানুষে বিশ্বাস বেশী? না। কাশীর দিদিমা ব্যাখ্যা করেছিলেন: যে শাস্তর শুধু বলে, অন্তরের মতো যা প্রমাণ করে না তার অভ্রান্তি, সে শাস্তর হিন্দুর শাস্ত্র নয়।

হিন্দুর সেই কালজয়ী শাস্ত্রের জীবন্ত ব্যাখ্যা ওই ত্রৈলিঙ্গ। এই ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর সংসারিক নাম ছিলো, শিবরাম। কাশীর অচল বিশ্বনাথ হচ্ছেন শিবলিঙ্গ। কাশীর সচল বিশ্বনাথ যিনি তিনি শিব থেকে হয়েছিলেন ত্রিলিঙ্গ।

॥ নয় ॥

'মারা মানুষ বাঁচাইবার উপায়'—গোদা গোদা অক্ষরে ছাপা বিজ্ঞাপনের এই শিরোনামা দেখে মুহূর্তের জন্যে চমকে ওঠে মানুষ আজও ; তারপর ক্ষুদি-ক্ষুদি টাইপে ওই বিজ্ঞাপনই যখন তার অব্যবহিত পরেই আবার জানায় যে, 'এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।' —তখন সে. শুয়ে পড়ে। ভূয়া বামপন্থী 'অভি'-নেতৃত্বে ডাক-তার ধর্মঘটের কৃপায় অসাধ্য সাধনের প্রতিশ্রুতি যখন কয়েক দিনও না চলতে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হবার ফলে বসে পড়তে বাধ্য হয় সাধারণ কর্মী, [শুধু বসে পড়তে নয় ; উঠতে-বসতে বাধ্য হয় কেউ কেউ,— দুহাতে দুকান ধরে উঠ-বোস করতে।] তখনকার মনের অবস্থার সঙ্গেই কেবল তুলনা চলে উপরিউক্ত বিজ্ঞাপন-পাঠকের দুরবস্থার [এক্ষেত্রে অবশ্য, বিদ্যাসাগর মহাশয় মাফ করবেন, দুরবস্থা নয়, দুরাবস্থাই ব্যাকরণ সঙ্গত না হলেও জীবনসঙ্গত এক্সপ্রেশান ; অবস্থা যখন এমন হয় যে ওই আকার না দেখলে অবস্থা কতদূর খারাপ অর্থাৎ কি দুরাবস্থা যে হয়েছে ডাক-তার ধর্মঘটীদের বিদ্যাসাগর মশাই তা দেখে যেতে পারলেন না তাই ; নাহলে তিনি বলে যেতেন দুরবস্থা নয় ; দুরাবস্থাই ঠিক। 'ব্যাকরণ-সম্মত না হলেও জীবনসঙ্গত সুনিশ্চিত।]।

কিন্তু সেকথা নয়। আমার বক্তব্য, আজ যা নিছক বিজ্ঞাপন,— আধুনিক বিজ্ঞাপনের পণ-ই হচ্ছে, প্রাণপণ চেষ্টাই হচ্ছে আগামী-কাল তা সত্য করে তোলে। এবং বিজ্ঞানের big gun যারা, যারা রথী মহারথী যারা আজ গ্রহ-গ্রহান্তরে গর্বিত সারথি, তারা যে একদিন সত্যি সত্যি মরা মানুষকে আবার বাঁচাবে এ বিষয়ে সন্দেহ কি ? কিন্তু সেই দিন দূরে থাক, ভগবান করুন সে দুর্দিন মানুষের কখনও না আসে। তার কারণ মরা মানুষকে না পারলেও, মুমূর্ষ মানুষকে বিজ্ঞান এখনই প্রাণ দান করতে অব্যর্থ সক্ষম হয়েছে ;

হচ্ছে ঃ আরও হবে। তার ফলেই। বাঁচা মানুষের পায়ের চাপে পৃথিবীর প্রতিইঞ্চি জমি এমন-ভাবে পিষ্ট হচ্ছে যে ফসল করলেও আর সোনা ফলানো সম্ভব হচ্ছে না। কাজে-কাজেই দেশে-দেশে যুদ্ধ বাধিয়ে বাঁচা মানুষকে মারা যায় কি করে, বসুমতীর ভার লাঘব করা যায় কিসে তারই দুর্দান্ত চেষ্টায় তৈরী হচ্ছে অতিকায় ফানুস। হিরোসিমায় মানুষ-মারা এই 'ফানুষের হিরো'-দের বীরত্বের সুরু মাত্র; সভ্যতাকে অবলুপ্ত করে অসভ্যতা জগৎজুড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আজ; মানুষের আজ দুঃখের সীমা-পরিসীমা নেই। মহাশূন্যে মানুষের জয়যাত্রার মুহূর্তে আফ্রিকায়, আলজিরিয়ায়, আসামে, বেরুবাড়িতে ঘোষিত হচ্ছে মনুষ্যত্বের পরাজয়বার্তা। সবার উপরে মানুষ সত্য নয়, সবার উপরে আজ ফানুস সত্য! আর তাই, এই নির্জন, নিস্তব্ধ, নিরুপম নীল ভেদ করে মানুষ যখন অন্য অনিলে মেলে দিচ্ছে তার পাখা তখনও আমি মানুষের জয়যাত্রাকে মনুষ্যত্বের পরাজয়বার্তা বলে জ্ঞান করতে বাধ্য হচ্ছি। আমার মনে অভূতপূর্ব আনন্দ নয়, পরমাশ্চর্য এক নিরানন্দ কেবলই মনে পড়াচ্ছে ঃ

'নিদারুণ দুঃখেতে
আত্মঘাতে
মানুষ চূর্নিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখনও দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?'

কে জানে? মানববিধাতা মহাশূন্যচারী মানুষ না কি ফানুসকে দেখে মনে মনে হাসছেন কি না ঃ 'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে?'

কিন্তু কেন? কেন এই মরা মানুষকে বাঁচবার উপায় প্রায় বের করে ফেলার মুহূর্তেই আবার বাঁচা মানুষকে যুদ্ধে দাঙ্গায়, সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে না মেরে ফেলা পর্যন্ত বিজ্ঞান নিরুপায়? এর কারণ বিজ্ঞান মরা মানুষকে প্রাণ দেয়; কিন্তু জীবন দেয় না। প্রাণ পশুরও আছে; মানুষেরও আছে। কিন্তু 'জীবন' শুধু মানুষেরই আছে; পশুর নেই। প্রাচীন ভারত মৃত্যুকে স্বীকারই করেনি।

মানুষকে মৃত বলে মানেইনি তারা ; মানুষকে তারা বলছে অমৃতের পুত্র। দেহের মৃত্যুকে সে বলেছে জীর্ণ-বসন পরিত্যাগ মাত্র। মৃত্যুকে বলেছে নবজীবনের সূচনা। বর্ষশেষকে নববর্ষারম্ভের। মৃত্যুতে মানুষের হাহাকারকে তুলনা করছে স্তন থেকে স্তনান্তরিত হবার মধ্যে অবুঝ শিশুর ক্রন্দনের মতো। শেষ বলে কিছু আছে একথা মনে করতে নারাজ এই ভারতবর্ষ। শেষ নেই সে শেষ কথা কে বলবে ? জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে। প্রকৃতির সঙ্গে মানবসংগ্রামের ইতিবৃত্তি পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে জীবন-মৃত্যুর রহস্য সমাধানের রাস্তায় জ্ঞান অথবা বিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত কেবলই গোলকধাঁধায় কেবলই ঘুরে মরছে। একেকটি আবিষ্কার হয়েছে আর মানুষ মনে করেছে এবারে রহস্যর আবরণ বুঝি উন্মোচিত হলো। কিন্তু হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছে সে যখনই আবার রহস্যের জট পড়েছে নতুন করে জীবন-মৃত্যুর জটিলতার আর কোথাও। আলো বলে যাকে মনে করেছিলো সে দেখা দিয়েছে আলেয়া হয়ে। শিশু মৃত্যু রোধ করেছে সে নতুন নতুন বহুমূল্য ভেষজের জন্মদানে কিন্তু জন্মের হার বেড়ে গেছে মৃত্যু হারের তুলনায় তার ফলে এবং এখন সেই বিজ্ঞানই আবার মনে ভাবছে জগৎ জুড়ে বেশ কিছু মানুষ মরলে বাঁচি। অর্থাৎ সিসিফাস ঠেলে ঠেলে পাথর তুলছে পাহাড়ের মাথায় ; তোলা মাত্রই পাথর আবার পাহাড়ের অপর পিঠ বেয়ে গড়িয়ে গেছে সমান স্পীডে। আবার তাকে ঠেলে তুলেছে মানুষ অসীম ধৈর্যে ; আবার সেই পাথর নামতে সুরু করেছে নীচে। এই পাথর তোলা আর গড়িয়ে পড়ার খেলা চলেছে যুগের পর যুগ। মহাকাশ যাত্রার মুহূর্তে আজও আবার নতুন করে মনে হচ্ছে মানুষ বুঝি খুঁজে পেয়েছে সেই আলো যা দিয়ে সে দেখবে জীবন-মৃত্যুর রহস্যাবৃত আনন। কিন্তু আবার সে দেখবে যাকে সে আলো মনে করেছে আসলে তা আলেয়া। জীবন-মৃত্যুর সারমেয়-লাঙ্গুল সোজা করার চেষ্টা সফল হবে না কোনও দিন জ্ঞানের অথবা বিজ্ঞানের দুঃসাহায্যে।

প্রাগৈতিহাসিক কালে যে সব অতিকায় প্রাণী একদিন পৃথিবী অধিকার করেছিলো; আজ তারা অনেকেই নেই। নেই তার কারণ যে অস্ত্রকে তারা যত ধার দিয়ে যত বড় ও তীক্ষ্ণ করে তুলেছে সেই অস্ত্রে সে নিজেই একদিন হয়েছে নিহত। মানুষের সব চেয়ে সহায় হয়েছে তার বুদ্ধি। এই ক্রমাগত শাণিত বুদ্ধিই ডেকে এনেছে তার অন্তিমকাল। এটম স্পিলিট করা মানুষের জয় ঘোষণা করছে যত না তার চেয়ে অনেক বেশী আসন্ন করছে মানব সভ্যতার চরম বিপর্যয়। এ যুগের শেষ চিন্তাশিল্পী বার্টাণ্ড রাসেল নিঃসংশয়ে উচ্চারণ করেছেন সেই সতর্কবাণী। এটম গাদা করা আছে যে গোপন জায়গায়, সেখানকার কোনও পাহারাদার যদি ক্ষণকালের পাগলামীতে আগুন নিয়ে খেলা আরম্ভ করে দেয় তা হলে আমরা জানবার আগেই জগৎ জুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবো। পৃথিবী আবার পরিণত হবে দগ্ধ মাটির ঢেলায়।

তাই, জ্ঞানে অথবা বিজ্ঞানে নয়, ধ্যানেই কেউ কেউ কখনও কখনও জীবন-মৃত্যুর রহস্যের পেয়ে গেছে সন্ধান। পেয়েছে বলেই একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে ঃ নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। শুধু সেই একবার নয়। বার বার ধ্যানীরা প্রেমীরা তার খবর পেয়েছে; কবিরা দিয়েছেন সেই খবর ঃ তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছে আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী।

জীবন-মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসার উত্তর জ্ঞানী অথবা বিজ্ঞানীর দেবার সাধ হয়েছে; কিন্তু সাধ্য হয়নি। সাধ্য হয়েছে যাঁদের তাঁদেরই নাম কখনও ত্রৈলিঙ্গ কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ; কখনও শ্রীচৈতন্য কখনও কবীর। কখনও কবির কলমেও উচ্চারিত হয়ে গেছে তাঁর অজান্তে এর উত্তর ঃ

'আনায়াসে যে পেয়েছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার॥'

যুগে যুগান্তরে চিরজাগ্রত মানব সমুদ্রের অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে ত্রৈলিঙ্গ হচ্ছেন চিরনিরুত্তর মানব-হিমালয়।

ত্রৈলিঙ্গ যখন শিবরাম ছিলেন অথবা তাঁর বাবা নৃসিংহ ধরের নামে নাম মিলিয়ে ছিলেন তৈলঙ্গধর। সেই সময়েই তাঁর মা তাঁকে বললেন ঃ 'আমার পুত্র না হওয়ায় গৌরীশঙ্করের পূজা এবং বারোটি ব্রাহ্মণের সেবা করেছিলাম। গৌরীশঙ্কর সন্তুষ্ট হলে তোমাকে পেয়েছি ; কিন্তু দ্বাদশ ব্রাহ্মণ সেবার ফল কি তা আজও জানি না ; শিবরাম তুমি সন্ন্যাসব্রত নেবেই যে একদিন তা আমি জানি কিন্তু আমার অনুরোধ, এই বারোটি ব্রাহ্মণ সেবার ফল না জেনে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ কোর না।'

মায়ের মৃত্যুর দশ বছর পর, শিবরাম তখন এক পুত্র ও কন্যার জনক, মায়ের সেই একমাত্র জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে বেরুলেন। কাশীতে এক পণ্ডিত তাঁকে ত্রিধারায় নব্যস্মৃতি রচনায় প্রতিষ্ঠ স্মার্ত-পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যর কাছে যেতে বলেন। শিবরাম উপস্থিত হয়ে রঘুনন্দনের কাছে তাঁর মায়ের প্রশ্ন উপস্থিত করেন ; দ্বাদশ ব্রাহ্মণ সেবার ফল কি ? রঘুনন্দন সে জিজ্ঞাসার এই জবাব দেন যে, একটি ব্রাহ্মণ সেবার ফল বলা যায় না ; দ্বাদশ ব্রাহ্মণ সেবার ফল কে বলবে ? এই রঘুনন্দন শিবরামকে নর্মদাতীরে সাত দিন মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আরাধনা করলে এক মহাপুরুষ এসে তাঁর প্রশ্নের মীমাংসা করে দিতে পারেন,—এমন আশা দেন।

শিবরাম নর্মদার নির্জনতম তীরপ্রান্তে বসে আরাধনা আরম্ভ করলেন মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর। তখনও সূর্যোদয় হয়নি নদীতীরে। গাছে বসে পাখী, মাটির নীচ থেকে বেরিয়ে এসে সাপ, এবং বনের অন্ধকার থেকে বহির্গত শেয়াল সব ভুলে শুনতে লাগলো সেই পাঠ। দেখা দিলেন জটাজুটসমণ্ডিত বাঘাম্বরে সজ্জিত ত্রিশূলাবলম্বিত এক পুরুষ। এবং তারও কিছু পরে সেই পুরুষের পাশে এসে বসলেন এক গৈরিক-বসনা গৌরী ; উন্মুক্ত বেণী মহাযোগিনী। শিবরামের প্রশ্নের উত্তরে

প্রাজ্ঞপুরুষ সেই মহাযোগিনীকে আদেশ দিলেন শিবরামকে তিনটি বটিকা দিতে। এবং বলে দিলেন যে এক নিঃসন্তান পার্বত্যরাজার পুত্রলাভ হবে এই বটিকা সেবনে ; সেই নবজাত শিশুই কেবল সক্ষম হবে দ্বাদশ ব্রাহ্মণ-সেবার ফল কি, তার সঠিক উত্তর দিতে।

মায়ের প্রশ্ন মাথায় নিয়ে অজানা উত্তর-অভিযানে বহির্গত শিবরাম এক সহরে এসে শুনলেন সেটি অপুত্রক পার্বত্য-রাজার রাজধানী। তিনি রাণীকে বটিকা খেতে দিলেন। এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত নজরবন্দী রইলেন সেখানে। নবজাতক ভূমিষ্ঠ হয়েই পদ্মাসনে প্রতিষ্ঠ পূর্বক হাসতে লাগলেন। শিবরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে একটি ব্রাহ্মণ-সেবার ফলস্বরূপ তিনি আজ রাজকুমার ; অতএব দ্বাদশ ব্রাহ্মণ-সেবার ফল অনুমেয়।

এই কাহিনী অলৌকিক কিন্তু অলীক নয় যে তার প্রমাণ যিনি এই উক্তির লিপিকার তিনি ত্রৈলিঙ্গর মুখ থেকে শুনে তবে লিপিবদ্ধ করেছেন এই ঘটনা। তাঁর নাম, ওঁ স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী। তিনি তাঁর তৈলঙ্গস্বামীর জীবন চরিতে লিখছেন, "আমি প্রায় একাদিক্রমে ৬২ বৎসর মানস সরোবরে স্বামীজীর চরণকমল সেবায় রত ছিলাম। ঐ সময়ে একদিন তাঁহার জীবন চরিত লিখিবার ইচ্ছা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে বাধা দিয়া উত্তর করিলেন, তুমি আমার সমাধি অন্তে আমি ব্রহ্মে লীন হইলে আমার জীবন চরিত প্রকাশ করিও।"

এই জীবনচরিতেই স্বামী কৃষ্ণানন্দ আরও জানাচ্ছেন। মহাত্মা একদিন হঠাৎ কি ভাবিতে ভাবিতে আমাকে বলিতে লাগিলেন, আমার বিমাতার এক পুত্র হইলে পর আমার মাতাঠাকুরাণী বিদ্যাবতী পুত্র কামনায় একনিষ্ঠ ভাবে গৌরীশঙ্করের আরাধনা আরম্ভ করিতে লাগিলেন এবং একদিন স্বপ্নে দেখিলেন একটি শুভ্রবর্ণ হস্তী তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি ঐ বৃত্তান্ত স্বামী নৃসিংহধরকে ব্যক্ত করায় তিনি বলিলেন, বিদ্যাবতী তোমার এমন একটি পুত্রসন্তান লাভ হইবে, যে ত্রিলোক

উদ্ধার করিবে এবং তুমি ধন্য হইবে। "অনন্তর ১৫২৯ শতাব্দীর অর্থাৎ বঙ্গীয় ১০১৪ সালের পৌষ মাসের পঞ্চম দিবসে পুষ্যনক্ষত্রে পূর্ণিমা তিথিতে শুক্রবাসরে দিবা সপ্তম ঘটিকায় আমি ভূমিষ্ঠ হই। পিতা পুত্রের কল্যাণ কামনায় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণসহ পুজা হোমাদি আরম্ভ করিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত আমি আমার মাতাঠাকুরাণীর কমল-মুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি। পঞ্চম বৎসরে চুড়াকরণ করিয়াছি এবং অষ্টম বৎসরে আমার উপনয়ন হয়। নামকরণ পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, পিতৃদত্ত নাম তৈলঙ্গধর; মাতৃদত্ত নাম শিবারাধনার জন্য 'শিবরাম'। জননীর স্নেহাধীন হইয়া পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম এবং পিতৃঋণও শোধ করিয়াছি। এক পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছিল এবং এই সকল সাংসারিক ব্যবহার সমস্তই দাদা শ্রীধরকে সমর্পণ করিয়া পরমাত্মা পরমব্রহ্ম উদ্দেশ্যে এই সংসার হইতে বাহির হইয়াছিলাম, আমার জীবনচরিত সমস্তই তোমাকে ব্যক্ত করিলাম। আমার দেহান্তে প্রকাশ করিও।"

স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতীর তৈলঙ্গ-জীবনী বলছে, মহাত্মা বিদ্যানন্দ সরস্বতী শিবরামকে দণ্ড-কমণ্ডলু দিয়ে সন্ন্যাসদীক্ষা দেন। তিনি যাবার সময় বলে যান : "বৎস! তুমি ভীমরথীতে কিছুদিন যোগাভ্যাস করিয়া তিব্বত ও মানস সরোবরে যাইও এবং সর্বদা আত্মধ্যানে মগ্ন থাকিও, সেই পরমাত্মাই তোমাকে ব্রহ্মধামে লইয়া যাইবেন।"

উদ্দেশ্যহীন জীবন আমাদের; আমাদের জীবনের বাণী তাই উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থ। ত্রৈলিঙ্গর জীবন দিব্যজীবন; তাই তাঁর বাণী দৈববাণী!

লৌকিক জগৎ ত্রৈলিঙ্গর অলৌকিক পরিচয় প্রথম পায় সেতুবন্ধ রামেশ্বর মেলায় ১১০৪ সালে। মেলার দ্বিতীয় দিনে একজন ব্রাহ্মণ সর্দিগর্মিতে প্রাণ হারান। হাহাকার পড়ে যায় মেলায় সেই ব্রাহ্মণের আত্মীয়-বান্ধবকুলে। মেলার আনন্দ মুছে গিয়ে আকাশ ভরে ওঠে বিচ্ছেদ-বেদনায়; বাতাস ভারি হয়ে ওঠে অশ্রুজলে। তারপর এক

সময়ে তারা ব্রাহ্মণের সৎকার-উদ্যোগ সুরু করলে এক অতিকায় মানব এসে দাঁড়ান তাদের সামনে। আশ্চর্য চেহারা সেই সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ওই দুঃসময়ে ঝড়ের যাত্রীদের চোখে যেন তীরের স্বপ্ন জাগিয়ে তুললো। যেমনই ভয়ঙ্কর আস্য ; তেমনই অভয়ঙ্কর হাস্য। মাথা যেন আকাশ পেরিয়ে অন্য কোনও আকাশ স্পর্শ করে। দৃষ্টি যেন সুদূর অস্ত-অচলে নিবদ্ধ ; মাথায় জটাজাল,—তৃতীয় দৃষ্টিতে দেখা দেয় সেখানে যেন 'ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা' ; অমাবস্যার ভয়ঙ্কর অন্ধকার আননে অভয়ঙ্কর হাসির বিদ্যুৎচ্ছটায় আশঙ্কা ও আশার লুকোচুরি খেলছে ; সুবিপুল সেই মানুষের কণ্ঠস্বর যেন মধ্যরাত্রির বন্দর ছেড়ে যাওয়া জাহাজের ঘরছাড়ার দিক হারাবার জলদ গম্ভীর আহ্বান। মুখে আগুন দেবার মুহূর্তে উচ্চারিত হয় 'বহুদূর সমুদ্রের বিষণ্ণ নাবিকের গানের' সুরে ঃ একে পোড়াচ্ছ কেন বাবা ? আত্মীয়দের মধ্যে একজন উত্তরে বলে ঃ প্রাণ নেই যে দেহে। উত্তর শোনা মাত্র সন্ন্যাসীর বিকট অট্টহাস্যে আকাশ ফুঁফাক হয়ে যায়, রামপ্রিয়ার আকুল আকুতিতে একদিন যেমন মাতা ধরিত্রীর বুক বেদনায় বিদীর্ণ হয়েছিলো সংখ্যা গণনার অতীত এক দিবসে। হাস্য সম্বরণ করে সন্ন্যাসী প্রত্যুত্তর করেন ; এর প্রাণ এখনও আছে কমণ্ডলুর এই বারিতে।

জলের ছিটেয় মুহূর্তের মধ্যে জেগে ওঠে সগরসন্তানের শরীরে জীবনের চিহ্ন !

কিন্তু মুহূর্তকাল পরে আর দেখা যায় না বৃষস্কন্ধ, আজানুলম্বিত বাহু, মানবহিমালয়কে। মৃতের চোখে আবার পলক পড়বার আগেই, অমৃতপুরুষ ত্রৈলিঙ্গ পলকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছেন ; উধাও হয়ে গেছেন কোথায় তা কে বলবে।

বার বার ত্রৈলিঙ্গ নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছেন ; অলৌকিক এই মায়ার জগতে স্থগিত রাখতে চেয়েছেন নিজের শক্তির বিকাশ। বার বার মর্ত্যলোকের আকুল আহ্বান অমর্ত্যলোকের ঘুম ভাঙ্গিয়েছে তবু—ধরা দিতেই হয়েছে অধরাকে। ধরা দিয়ে এই ধরাকে

বিপন্মুক্ত করার পরেই তিনি অদৃশ্য হয়েছেন। তবু ছড়িয়ে গেছে সেপথ দিয়ে হেঁটে গেছেন তিনি যে জল দিয়ে গেছেন ভেসে, তার রেণুতে রেণুতে, তার বিন্দুতে বিন্দুতে অমৃত্য নিঃসন্দ্য! ফুল ফুটলে তার গন্ধ জড়িয়ে যাবেই আকাশের কালো কেশে, চাঁদ উঠলে তার বাঁধভাঙা আলো হেসে গড়িয়ে যাবেই সমুদ্রদেহে; মহামানব এলে দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগবেই মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে!

এই মুক্তপুরুষকে বাঁধবার চেষ্টাও হয়েছে বারবার! বারবার ব্যর্থ হয়েছে তাও!

সমস্ত দিক যাঁর অম্বর তিনিই শুধু দিগম্বর হতে পারেন। ত্রৈলিঙ্গ তাই দিগম্বর। কাশীতে এই সত্যের মতো, সূর্যের মতো, মানবপুত্রের ভূমিষ্ঠ-বেশের মতো, পুণ্যের মতো, পবিত্রতার মতো, পূর্ণতার মতোই নিরাভরণ নিরাবরণ নির্মম উলঙ্গ ত্রৈলিঙ্গকে কয়েক-জনের প্ররোচনায় এক পুলিশ হাজতে দেবার নির্দেশ দেন। পরের দিন সকালে সাহেব দেখলেন হাজত ভেসে গেছে সন্ন্যাসীর মূত্রে; আর সন্ন্যাসী হাসছেন হাজতের বাইরে দাঁড়িয়ে। সাহেবের বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টির উত্তরে ত্রৈলিঙ্গ প্রত্যুত্তর করলেন: "আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, চাবি বন্ধ করিয়া কেহ কাহারও জীবন আবদ্ধ রাখিতে পারে না। তাহা হইলে মৃত্যুকালে হাজতে দিলে ত আর কেহ মরিত না।' [ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জীবনচরিত : কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী]

স্বামীজির বন্ধনমুক্তির হাসিই তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা!

'আমারে বাঁধবি তোরা সে বাঁধন কি তোদের আছে?
আমি যে বন্দী হতে সন্ধি করি সবার কাছে!

এই একবার নয়। আরেকবার,—নর্মদার তীরে দাঁড়িয়ে তৈলঙ্গধরের ইচ্ছা হলো দুগ্ধপানের। নর্মদার নীল জল হলো শুভ্রবরণ; জলধারা পরিবর্তিত হলো দুগ্ধধারায়। তৈলঙ্গধর অঞ্জলিভরে মেটাতে লাগলেন তিয়াস। আরেকজনও ঐ সময়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সেই দৃশ্য। তার নাম খাকি বাবা। তিনিও দুগ্ধপানের ইচ্ছেয় যেই স্পর্শ

করলেন, দুগ্ধধারা আবার প্রত্যাবর্তন করলো জলধারায়। লোকে একেই বলে অলৌকিক। কিন্তু এর চেয়ে লৌকিক আর কি? মা-টির প্রতিমাকে যে মাটির পুতুল মনে করবে সে-ই পৌত্তলিক; কিন্তু মাটিতে পুতুলে 'মা'-টির প্রতিমা যে দেখতে পাবে সে খেতে দিলে খাবে না কোন্ মা? সে মায়ের পায়ে কুশাঙ্কুর বিঁধিয়ে দিলে কেন বেরুবে না রক্ত সেই রক্তপদ্মপদ থেকে?

লোকে পুণ্য তিথিতে স্নান করে গঙ্গায়; পাপমুক্ত হয় না তবু। কেন? কারণ—নর্মদাকে যে প্রাণদা, 'সর্ব'-দা মনে করে নর্মদা তাকেই দেয় জলের বদলে দুধ। নর্মদাকে যে নদী মাত্র মনে করে তার কাছে নর্মদা আর নর্দমায় তফাৎ কোথায়?

যে যা দিনে যত দিতো, যতক্ষণ দিতো ত্রৈলিঙ্গ তাই নিতেন, তত নিতেন ততক্ষণ নিতেন। তাই দেখে একদিন ভ্রান্ত কয়েকজন জলের সঙ্গে চুণ আর আফিংগুলে খাইয়ে দেয় তাঁকে। ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর তা গলাধঃকরণ, নীলকণ্ঠ একদা বিষপান করেছিলেন যেমন অনায়াসে তেমনই নির্দ্বিধায়। তারপর তাকে বার করেছেন প্রস্রাবের সঙ্গে ত্রিধারায়; জল চুণ, আর আফিং আলাদা আলাদা করে। বহু ভক্ত কখনও-কখনও তাঁর অঙ্গে পরিয়ে দিতো মহার্ঘ্য অলঙ্কার। বহুতর লোভী আবার তাঁর গা থেকে খুলে নিতো সেই গয়না। ত্রৈলিঙ্গ পরিয়ে দেবার সময়ও যেমন, খুলে নেবার সময়ও তেমনই নির্বিকার। অলঙ্কারই যাদের একমাত্র অহঙ্কার তারা গয়না দিলে আনন্দিত এবং খুলে নিলে আন্দোলিত হতে পারে; কিন্তু ওঁকারই যাঁর এক-মাত্র রণ হুঙ্কার তাঁকে নিরলঙ্কার করবে কে?

২৮০ বৎসর মর্ত্যলোক এই অমর্ত্যলোকের লীলা প্রত্যেক্ষ করে দেহত্যাগের পূর্বদিন ত্রৈলিঙ্গ বললেনঃ "আগামী কাল একখানা নৌকা ভাড়া করিবে, দেহত্যাগের পর সিন্দুকে আমার দেহ বন্দী করিয়া, অসি থেকে বরুণা পরিভ্রমণের পর গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিবে। অন্য সংকারের প্রয়োজন নাই।" পরের দিন সকাল আটটায়

আবার বললেন ঃ "সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দাও ও যে পর্যন্ত আমি দরজায় আঘাত না করিব ততক্ষণ কেহ দরজা খুলিও না।" বেলা তিনটেয় দরজায় আঘাত পড়লো। সংসারের বন্ধ দরজায় সংসার-মুক্ত পুরুষের সেই শেষ আঘাত!

গঙ্গাগর্ভে সিন্দুক ভাসিয়ে দেবার আগে লোকশ্রুতি আছে, সিন্দুক খোলা হয় একবার, শেষ দর্শনের জন্যে। কিন্তু খোলার পর দেখা যায় যে ত্রৈলিঙ্গর দেহও তাঁর আত্মার সঙ্গে মুক্ত হয়ে গেছে, ত্রৈলিঙ্গর দেহ নেই সিন্দুকে।

শ্রুতি নয়; সত্য। অসীম সিন্ধুকে কে বন্দী করতে পেরেছে কবে লোহার সিন্দুকে।

॥ দশ ॥

ত্রৈলিঙ্গস্বামী যেখানে মূর্তির মধ্যে মূর্ত হয়ে আছেন সেইখান থেকে হোটেলে ফিরে,—কাশীর গ্র্যাণ্ড হোটেল যাকে বলে, শুনি হৈ-হৈ কাণ্ড রৈ-রৈ ব্যাপার। একজন কাল রাতেও ফেরেনি; আজ সকালেও না। এবং হোটেলের অভিজ্ঞতায় বলা চলে আর ফিরবেও না। কিন্তু তার মালপত্তরের তা'হলে কি হবে? হোটেলের অভিজ্ঞতায় তারও অবধারিত উত্তর হচ্ছে সে মালপত্তর পড়ে রইবে; তবুও মালিক ফিরবে না। ফিরবে না কারণ, মালপত্তর বলতে একটা ছাতাপড়া মরচে ধরা টিনের বাক্স; বাকী উশুলের জন্যে মালিক পালালে যার মধ্যে থেকে বেরুবে কেবল কয়েকটা থান ইঁটের ভাঙা টুকরো। আজকেও যে তার ব্যতিক্রম হবে না হোটেলের মালিকের ঘরে, মালিক অথবা ম্যানেজারের ঘরে মালিক অথবা ম্যানেজারের ফোড়েদের মধ্যে সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। তাদের মধ্যে তখন উত্তপ্ত আলোচনা চলছে পলাতক সম্পর্কে; পলাতকের নামটি শুনেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম; হাবলু গাঙ্গুলী।

রবিন হুড শুনলে একদিন রাজার অনুচরেরা; মোহন দত্তের শশধরের নাম শুনলে যেমন পুলিশ সুপার; শার্লক হোমসের নাম শুনলে যেমন নিরপরাধ ব্যক্তির বুক ঢুকে যায়, শুকিয়ে যায় মুখ, হাত পা ঠাণ্ডা হোয়ে আসে, হাবলু গাঙ্গুলীর নাম শুনলে তেমনই তার পরিচিতদের মাথা ঘুরে যায় মুহূর্তে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্সী-স্কটিশের যারা ছাত্র কিংবা শিক্ষক হাবলু গাঙ্গুলীকে আজও তাঁদের মনে গেঁথে আছে নিশ্চয়ই। হাবলু গাঙ্গুলীকে মনে রাখা নয়; ভোলাই শক্ত। তাঁদের আরও ভোলা যা শক্ত তা হচ্ছে হাবলু গাঙ্গুলীকে আমরা হাবলু জি বলতাম; হাবলু বাঁড়ুজ্যে বলে আরেকজন ছিলো,—যার সঙ্গে না গুলোবার

জন্যে। হাবলু গাঙ্গুলী ছিলো হাবলু 'জি'; হাবলু বাঁড়ুজ্যে, হাবলু 'বি'। হাবলু বি এতদিনে বিয়েটিয়ে করে নিশ্চয়ই বাপের দয়ায় এখন বড় চাকরি, বাড়ি গাড়ি সবই করেছে। পৃথিবীতে অসংখ্য সাকসেসের গড্ডালিকায় হারিয়ে গেছে হাবলু 'বি'। কিন্তু হাবলু 'জি' ঠিক আছে। জনি ওয়াকার কেবল ষ্টিল গোয়িং ষ্ট্রং; হাবলু জি ষ্ট্রং থেকে ষ্ট্রংগার হোলো দিনে দিনে। সারা জীবন ধরেই তার শুক্ল পক্ষ। প্রত্যেক দিনই সে বাড়ছে, এক কলা দু'কলা করে। ষোলো কলা পূর্ণ করা পঞ্চদশীর রাত তার জীবনমহাকাব্যে এখনও অনেক পরের অধ্যায়।

সেই হাবলু 'জি'। আমার সঙ্গে তার আলাপ, ইজের পরা বয়সেরও আগে থেকে। আমরা এক মা-মাসীর কোলে-পিঠে মানুষ; এক টোলে পড়ুয়া এবং কলেজেও একই বছরের একই ক্লাসের মেট। কিন্তু হাবলু জি আজ নয় সেই প্রথম দিন থেকেই আমার এবং পরবর্তী জীবনে আমাদের সকলেরই অবিসম্বাদী লীডার। আমরা সেদিন কে তার গোয়েবল্‌স্ গোয়েরিং ছিলাম, জানিনা; কিন্তু সে আমাদের সকলেরই যে একমাত্র 'ফুয়েরার' ছিলো জানি। তফাতের মধ্যে এই জার্মাণ ফুয়েরার তাঁর দলবল এবং নিজেকে একবার ডুবিয়েছেন; আমাদের ফুয়েরার আমাদেরকে কতবার ডুবিয়েছেন বলা শক্ত; কিন্তু নিজে ডোবে নি একবারও সেকথা বলা শুধু সহজ যে তাই নয়; বলা বোধ হয় বাহুল্য।

একটি চাল টিপলেই যেমন বোঝা যায় ভাত সিদ্ধ হয়েছে কি না; তেমনই হাবলু 'জি'-র কীর্তির এক কণা নমুনা দিলেই জ্ঞান হবে যে সে তার কীর্তির চেয়ে কত মহৎ। তখন আমরা দু'জনেই মিত্র স্কুলের ভবানীপুর শাখার ছাত্র; কোন্ ক্লাসে পড়ছি অথবা এখন বলতে বাধা নেই আর, পড়ছি না অথচ, মনে নেই। আমাদের অঙ্ক কষাতেন তখন বিখ্যাত কেশব নাগ মহাশয়, পরবর্তী কালে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক; বর্তমানে বোধহয় অবসর উপভোগ করছেন অঙ্কের নতুন কোনও সমস্যা নিয়ে। সেই

ক্ষীণ কলেবর কিন্তু বিপুল প্রতাপ কেশব নাগ মহাশয় গরমের ছুটিতে আঁক কষে আনতে দিয়েছেন—কম করে শো হুয়েক। কিন্তু ছুটি মানেই তো ছুটোছুটি। আজ করি, কাল করি করে করে, দার্জিলিং যাবার আগে করি, দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে করি করি করে শেষ অব্দি প্রতি বছরই যা হয়, স্কুল খুলতে যখন আর দিন দুয়েকও নেই পুরো, তখন শরণাপন্ন হতেই হয় আমার আদি ও অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীমান হাবলুর। হাবলু 'জি'র।

হাবলু ঘাবড়াতে বারণ করে কেবল বলে : কেশব বাবুকে আমি যা বলব, তুইও তা-ই বলবি ; ব্যস্,—দেখবি কেশব বাবু বকবেন তো না-ই ; বরং—। হাবলু বাকীটা বলে না ; আমি আন্দাজ করে নিই। বোধ হয় আদর করবেন,—গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ;—ভাবি,—এই কথাই, এই আশাই হাবলু আমার ভীতু মনে জাগাতে চায় ; আমার ভয়ঙ্কর ভীতু মনে। কিন্তু হাবলুর কথা শেষ পর্যন্ত সত্য হয়। কেশব বাবু আদরই করেন শেষ পর্যন্ত। আমাকে আদর করেন ; একলা আমাকেই ; হাবলুকে নয়। ও রকম আদর ছ' বছরের মধ্যে স্কুলে আর কেউ পেয়েছে বলে মনে পড়ে না। কিন্তু হাবলুকে কেন আদর করেন না,—হাবলু কি করে বঞ্চিত হয় কেশব নাগের স্নেহান্তসুখস্পর্শ থেকে,—সে কথা জানলেই হাবলুকে জানা হয়! এখন সে কথাই বলছি।

স্কুল যথারীতি খুললো এবং কেশব বাবু ক্লাসে এসে যথারীতি হোম টাস্‌ক্ দেখতে চাইলেন প্রত্যেকের! হাবলুর চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, রুগ্ন চেহারা। হাবলুর টার্ণ আসতেই হাবলু খুব মিহি গলায় বলে : 'হয়নি'। 'কেন ?' কেশব বাবুর গর্জনের উত্তরে আরও মিইয়ে গিয়ে আরও মিহি গলায় হাবলু প্রায়াশ্রুত কণ্ঠে বলে : ম্যালেরিয়া হয়েছিলো। 'বোসো',—কেশব নাগের গলা আশ্চর্য মোলায়েম। শুনে ভরসা হয়। কেশব বাবুর আমাকেও ওই এক প্রশ্ন : হোম টাস্‌ক্ ? 'হয়নি',—আমার উত্তর। 'কেন ?' 'ম্যালেরিয়া হয়েছিলো।' আমার উত্তরের মধ্যে কি ছিলো কে জানে, সেই উত্তর

শুনে,—ক্লাসের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম থেকে কেশব বাবুর দোর্দণ্ড ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হাসির হররায় ছাদ ফেটে যাবার জোগাড়! এমন হাসি কল্লোল যুগের উপন্যাস পড়েও কেউ কখনও হাসেনি। কিম্বা জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় না পড়ে; নবনাট্যান্দোলনের কবলিত অভিনয় কি বিওরিয়্যালষ্টিক ছবির সিয়েরিয়াস দৃশ্যেও এমন হাসি স্ত্রীলোকের হাসার বড় বেশি সুযোগ ঘটে না!

কেশব বাবু আমাকে ডেকে কাছে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কি হয়েছিল তোমার?' 'ম্যালেরিয়া,'—আবার উত্তর করি। আবার হাসিতে কড়িবরগা কাঁপতে থাকে ক্লাসের। কেশব বাবু ক্লাসের উদ্দেশ্যে বলেন: 'দেখো, ম্যালেরিয়া হলে কেমন টম্যাটোর মতো লাল আর ফুলো ফুলো হয় গাল!' বলেন,—আর মারেন মাথায়। গাঁট্টা মারেন আর বলেন। গাঁট্টা নয়। গাঁট্টার চেয়ে একটু বেশিই বোধ হয় সেগুলি; গাঁট্টাগোট্টা। আমার চোখে জল; সকলের মুখে হাসি! সব চেয়ে বেশি হাসি,—অবশ্যই, বলা বাহুল্য,—হাবলুর মুখে নয়, দু চোখে। আমাদের হাবলু 'জি'-র!

আরেকবার। কাশীর হোটেলে 'হাবলু' 'জি'-র এই পালাবার কয়েক মাস আগে,—কাশ্মীর যাচ্ছে হাবলু। সঙ্গে তার স্ত্রী, অনীতা, একটি কয়েক মাসের বাচ্চা, হাবলুর ভাই এক শ্যালক এবং হাবলুর প্রধান সাকরেদ পিকলু চ্যাটার্জি। রাতে শুতে যাবার আগে, টিকিট-টাকা সুদ্ধ পার্স বৌ-এর হাতে দিয়ে শুতে গেলো হাবলু: আমাদের হাবলু 'জি'। বৌ সেটিকে বালিসের তলায় রেখে,—ঘুমোতে গেলো লোয়ার বার্থে। ডেরিয়ানশোনএ চা দিতে এলো এবং তারপর আর পার্স পাওয়া গেলো না। হাবলুর বৌ-এর কান্না, শালা ভাইদের যোগদান, পিকলু নার্ভাস। সকলের মত,—ফিরে চলো, ফিরে চলো আপনার ঘরে। হাবলুর মাথাও এক মুহূর্তের জন্যে ঘোরে; তারপর আবার যে হাবলু জি, সেই হাবলু জি, বলে: না; বেরিয়েছি যখন তখন কাশ্মীর হয়ে তবে ফিরবো।

চেন টানা; গাড়ি থামা; গার্ড আসা; যথারীতি যাত্রা নাটকের

দৃশ্য পর পর অভিনীত হয়। হাবলুকে ট্রেণকর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে হাবলুকে নেমে যেতে হবে এখনই; এখনই! কেন? হাবলুর জিজ্ঞাসার জবাবে রেলওলা জনৈক উচ্চপদস্থ জানান; কারণ আপনি ডবলিউ-টি অর্থাৎ উইদাউট টিকেট ট্র্যাভেল করতে পারেন না। ঠিক সেই মুহূর্তেই হাবলুর মুখ দিয়ে সেই মোক্ষম উত্তর বেরোয়; আলবৎ পারি; আমি বোনাফাইড্ প্যাসেঞ্জার। বাল্মীকির মুখ দিয়ে যেমন একদিন শরাহত ক্রৌঞ্চমিথুনের বেদনায় উচ্চারিত হয়েছিলো প্রথম কাব্য; গান্ধীজীর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিলো সেই বিখ্যাত ব্রিটিশ বিতাড়ন উক্তি: কুইট ইণ্ডিয়া; হাবলুর মুখ দিয়ে ঠিক তেমনই উৎসারিত হলো বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার।

শ্লোগান নয়; মেসিনগান। আঁকড়ে ধরে আগাগোড়া রাস্তা যেখানেই নেমে যাবার কথা বলবার জন্যে আক্রমণের সম্ভাবনা সেখানেই ঘুরিয়ে গেল হাবলু ওই ঐক্য-বাক্য-মাণিক্য: বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার। ডেরিয়ানশোন,—যেখানে এই দুর্ঘটনার সূত্রপাত সেখানে ট্রেণ বেশিক্ষণ দাঁড় করানো গেলো না। ঠিক হলো দিল্লিতে হাবলুকে নামিয়ে দেওয়া হবে সপরিবারে,—আর পাদমেকং দেওয়া হবে না এগুতে। হাবলু দিল্লিতে গাড়ি লাগতেই পাঠানকোট রাউণ্ড গাড়িতে বউ, শালা, ভাই এবং সাকরেদকে তুলে দেওয়ার পর, —রেলকর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে একা লড়ে গেল সেই একমাত্তর অস্তর দিয়ে: বোনাফাইড্ প্যাসেঞ্জার। অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষ একসময়ে মেনে নিল যে হাবলু, হাবলু-'জি' বোনাফাইড্ প্যাসেঞ্জার! কিন্তু তখন তারা নতুন প্রশ্ন তুললো হাবলুই হাবলু-জি তার প্রমাণ কি অর্থাৎ হাবলু জি-ইযে সেই বোনাফাইড্ প্যাসেঞ্জার তার প্রামাণ কি? হাবলু প্রশ্ন করে এবার,—কি প্রমাণ চান? রেলকর্ত্তৃপক্ষ বলে: দিল্লিতে আপনাকে চেনে এমন কেউ আছে? আছে। কে? ডক্টর প্রসাদ! হাবলুর উত্তর শুনে নিরুত্তর হয় রেলকর্ত্তৃপক্ষ তো বটেই; ইঞ্জিনের বাঁশি পর্যন্ত।

পাঠানকোট থেকে কাশ্মীর ডিলাক্স-বাস সার্ভিস। সেখানেও

হাবলু 'জি'-র টিকিট ওইঃ বোনাফাইড্ প্যাসেঞ্জার! কাশ্মীরে গুলমার্গে জ্ঞান হয় হাবলুর, হাবলু 'জি'-র যে সে তার অন্ততঃ কাশ্মীর আসার মানে হয় না কোনও। 'কারণ' কলকাতাতেও তো সে গুলমার্গেই থাকে সারাদিন!

ফেরার পথে দিল্লিতে ইতিহাসের পুনারাবৃত্তি হয় যথারীতি। অর্থাৎ যাবার সময় যারা আটকে ছেড়েছিলো, এবার তারা আটকায়। হাবলুকে তারা বলেঃ কি মশাই, খুব যে বলে গেলেন, ডক্টর প্রসাদ আপনাকে চেনেন; কই তাঁর কোনও সেক্রেটারি তো কোনও জন্মে আপনার নাম শুনেছেন বলে স্বীকার করলেন না! হাবলু জি এতটুকু না দ্বিধা করে পাল্টা প্রশ্ন করেঃ ডক্টর প্রসাদের আবার সেক্রেটারি কি? তাঁর আবার সেক্রেটারি হলো কবে, এ্যাঁ? উত্তর শুনে এবার কিন্তু নিরুত্তর হয় না রেলওলা; আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠেঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সেক্রেটারি নেই? জানেন একথা বললে সিডিসন হয়? নিস্পৃহকণ্ঠ হাবলু 'জি' জবাব দেয়ঃ জানি। রাজেন্দ্র-প্রসাদের সেক্রেটারি থাকবে না কেন? তিনি দরিদ্র ভারতরাষ্ট্রের প্রথম পুরুষ,—ইণ্ডিয়া দ্যাট ইস্ ভারত এর যত পপ্যুলেশান তাঁর অর্ধেক হওয়া উচিত তাঁর সেক্রেটারি! রেল কর্তৃপক্ষ বোকার মতো হয়ে যায়; তবে যে বলেছিলেন ডক্টর প্রসাদ; তাহলে তিনি কে? হাবলু 'জি' উত্তর দেয় তৎক্ষণাৎ! তিনি দিল্লির একজন দাঁতের ডাক্তার; আমার কাছে এখনও কিছু টাকা পান; তাই তাঁর নাম নির্ভয়ে বলেছিলাম,—কারণ তাঁর পক্ষেই আমাকে মনে রাখা সব চেয়ে সহজ! রাজেন্দ্রপ্রসাদকে ডক্টর প্রসাদ বলতে যাব কোন্ কারণে? তিনি কি আমার এয়ারবন্ধু? তাহলে বলতাম, প্রেসিডেণ্ট; আর তিনি আমাকে জানলে,—আমার মতো একজন বোনাফাইড প্যাসেঞ্জারকে আপনারা এমন অপদস্থ করতে সাহস করতেন? বলুন, আপনারাই বলুন?

এর পর হাবলু জি-র কলকাতার ঠিকানা নিয়ে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় রেলকর্তৃপক্ষ; ট্রেনে করেই ছেড়ে দিতে হয় অবশ্য; সপরিবারেই

ছেড়ে দিয়ে আসতে হয় ;—হাওড়া পর্যন্তই পৌঁছে দিতে হয় অবশেষে ! হাবলু, আমাদের হাবলু 'জি' বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার যে !

কলকাতায় ফিরে জামাকাপড় গুছিয়ে আলমারীতে তুলতে গিয়ে বাক্সর তলা থেকে বেরিয়ে আসে হাবলুর সেই হারানো পার্স ! হাবলুর বৌ-এর আবার সুরু হয় নতুন করে কান্না। এরই জন্যে এত হেনস্তা,—অথচ সেই পার্স হারায়নি, কেউ চুরি করেনি, দিব্যি দিবানিদ্রা দিচ্ছে কাপড়ের গাদায় ? তারপর পার্স খুলতেই টাকা, কানের দুল সব পাওয়া যায় ; পাওয়া যায় না শুধু টিকিট। হাবলু বলে : তাইতো টিকিটটা শুধু কে নেবে ? এমন সময় হাবলু, হাবলু 'জি'র চোখ আর তার বউ অনীতার চোখ মিট করে ; শুভদৃষ্টি হয় আবার নতুন করে। হাবলুর বৌ যেন আলো পায়; তার চোখে জলের বদলে এখন হাসির রামধনু ; সেই রামধনুতে সহাস্যপ্রশ্ন ঝিলিক দেয় : আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো ; টিকিট কিনেছিলে তো আদৌ ?

প্রশ্ন শুনেই পিছু হঠতে থাকে, বাথরুমের দিকে হাঁটতে থাকে হাবলু ; আমাদের হাবলু 'জি'। কাঁধে তোয়ালে, হাতে দাঁতমাজা ব্রাশ, পিছন না ফিরেই জবাব দেয় ! কি যে বলো ? টিকিট কিনি নি মানে ? আমি একজন বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার !

সেই হাবলু, হাবলু 'জি'-র ট্রাঙ্ক ভাঙ্গতে উদ্যত যখন হোটেলওলার ফোড়েরা,—তখন আমি আর থাকতে পারলাম না ; গেলাম মালিকের কাছে। বললাম : ট্রাঙ্ক ভাঙ্গলে বিপদে পড়বেন ; এই হাবলু গাঙ্গুলিকে আমি চিনি ; কলকাতা-সুদ্ধ সবাই চেনে ; কলকাতার নামকরা ছেলে ! আরেকটু অপেক্ষা করুন না হয়। হোটেলের মালিক যদি বা ঘাবড়াতেন শুনে, ফোড়রা [অকুতোভয় প্রভু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শত গুণ]। তার ওপর ফোড়েরা প্রায় সবাই কাশীর ছেলে। কলকাতার ছেলেকে তারা কেয়ার করতে চাইবে কেন। তাই তারা কোরাসে, আমার, হাবলুর ট্রাঙ্কভাঙ্গার ব্যাপারটা আপাতত মূলতুবি রাখার প্রস্তাব নামঞ্জুর

করলো ; আমরা ট্রাঙ্ক ভাঙ্গবই। বিরোধীপক্ষকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টায় মেজাজ ভালো থাকলে ডক্টর রায় যেমন কায়দায় কথা বলেন তার অনুকরণ করি অতঃপর ঃ ট্রাঙ্ক ভেঙ্গে কি পাবেন ? কিন্তু হা হতোস্মি ! চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী হোটেল-তলার ফোড়েরা চতুর্গুণ চীৎকার করে ওঠে ঃ পাব কয়েকটা ঢিলপাটকেল জানি কিন্তু যদি কোনও এতটুকু হদিস পাই হাবলু গাঙ্গুলীর ঠিকানায়, তাহলে থানাপুলিশ হয়ে যাবে এবার ! কলকাতার ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া দরকার। ইট-পাটকেল-বোঝাই ট্রাঙ্ক জামীন রেখে টাকা না দিয়ে পালিয়ে যাওয়া কাশীর হোটেল থেকে,—আর হতে দেব না !

তর্ক করা বৃথা বুঝে বললাম ঃ তাহলে ভাঙ্গুন ! বারান্দায় বেরিয়ে আসতে আসতে শুনলাম একজন ফোড়ে বলছে ঃ না বললেও ভাঙ্গতুম !

বারন্দায় এসে সিগারেট ধরালাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম হাবলুর হাবলু'জি-র। সিগারেটের নীল ধোঁয়া স্পাইর‍্যাল সিঁড়ির মতো ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগলো স্বর্গলোকের দিকে। আর তারই সঙ্গে ঘুরতে লাগলো আমার মাথা। ঘুরে ঘুরে আসতে লাগলো কাশীর গ্র্যাণ্ড হোটেলে এই আড়াই দিনের অভিজ্ঞতা ! ছবির মতো রিলের পর রিল অবারিত হতে থাকে মনের পর্দায়। আশ্চর্য সব চিত্র আশ্চর্যতর কত চরিত্র !

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন মুখব্যাদান করে। স্বাধীন ভারতে বিশ্বরূপ দেখতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিয়ে যেতেন যে কোনও হোটেলে। রবি ঠাকুর লিখেছেন, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া ; হোটেলে বাস করলে রবীন্দ্রনাথ জানতেন, ঘর হতে দু'পা ফেলিবারও প্রয়োজন নেই ; ঘরে বসেই এমন সব দৃশ্য চোখে পড়ত যাতে বাইরে যাওয়া হোত বাহুল্য। পৃথিবীর কবিকুল দুনিয়াকে পান্থশালার সঙ্গে তুলনা করেছেন। পান্থশালা হোটেলেরই প্রথম সংস্করণ। যে পৃথিবী পান্থশালা ছিলো, সে পৃথিবী আজ

আর নেই ; জটিল হয়েছে অনেক। তাই তার তুলনা আজ হোটেলের সঙ্গেই দিতে হয়। সেক্সপীয়ার যেমন আজ জন্মালে, ওয়ার্লড ইজ এ ষ্টেজ লিখতেন না ; ওয়ার্ল্ড ইজ এ ফিল্ম ষ্টুডিও, লিখিতে বাধ্য হতেন ; ওমর খৈয়ামও তেমনই আজকের পৃথিবীকে পান্থশালা বলতেন না। মডার্ণ ওয়ার্ল্ড হচ্ছে আল্ট্রা মডার্ণ হোটেল।

এই যাকে কাশীর গ্র্যাণ্ড হোটেল বলেছি, আসল গ্র্যাণ্ড হোটেলের তুলনায় যা ন্যুয়ার্কের তুলনায় কলকাতাও নয় ;—সেই কাশীর গ্র্যাণ্ড হোটেলে আড়াই দিনের মধ্যেই যা দেখবার পেলাম, একাশিবার পৃথিবী ঢুঁড়েও এর চেয়ে বেশি কি দেখতাম। পৃথিবীটা যদি জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান হয়, কাশীর গ্র্যাণ্ড হোটেল তবে রাজশেখর বসুর চলন্তিকা ; তফাৎ মাত্র এই। চলন্তিকা থেকে জ্ঞানেন্দ্রাভিধানের সেই সব কথার মানে বাদ দেওয়া হয়েছে যা বাদ দিয়ে বরবাদ করেও কাজ চলে। কাশীর গ্র্যাণ্ড হোটেলেও পৃথিবীর সব দৃশ্যই দেখা যাবে ; কেবল সেই সব দৃশ্যই কেবল অদৃশ্য, —যা না দেখতে পেলেও মানবচক্ষের দেখার ক্ষমতার সীমা নিয়ে দুঃখ করার সময় অত্যন্ত অল্প অথবা একেবারেই নেই।

কাশীর এই গ্র্যাণ্ড হোটেলেই শুধু নয়। পৃথিবীর সব হোটেলেই একখানা খাতা আছে। তাতে আপনার নাম-ঠিকানা, বাবার নাম ; আসার উদ্দেশ্য এবং থাকার বাসনা কতদিন সব লেখাবার নিয়ম। খাতাখানা সই করে দিলেই আপনার ছুটি। আপনি ঠিক লিখলেন কি ভুল দিলেন তার দায়িত্ব যারই হোক ; হোটেলওলার দায় নেই বিন্দুমাত্র। কলকাতার নাগরিক যেমন যে কোনও রেস্তোরাঁয় ঢুকে যে কোনও খাবারে মুখ দিতে পারে নিশ্চিন্তে, যদি শুধু ঢোকবার মুখে বড় বড় অক্ষরে দাগানো থাকে : No BEEF ! ব্যাস্ ! 'No BEEF' লিখে যে কোনও মাংস দাও,—খেতে আপত্তি নেই কারুর !

অথবা কলকাতায় যে কোনও বাড়িতে যে কোনও লোকের মাথার ওপর একটা তিন বা চার ব্লেডের পাখা থাকা চাই। সেটা

হাওয়া না দিলেও চলবে ;—শুধু খটমট আওয়াজ একটা হলেই কলকাতার নাগরিকের মাথা ঠাণ্ডা,—পাখা আছে !

হোটেলেও তাই। খাতায় লেখা হলো,—লেখার সঙ্গে জীবনের খাতা মেলাবার দায় অথবা দায়িত্ব আর যারই হোক ! হোটেলওলার নয়।

ভারতবর্ষ জুড়ে যে অসংখ্য হোটেলে অসংখ্যতর লোকের আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়া, তাদের সঙ্গে যে সব স্ত্রীলোকের এক ঘরে থাকা তারা সব সময়েই যে তাদের স্ত্রী, তা নয়। কিন্তু তাদের ওঠা-বসা, চলা-ফেরা থেকে বোঝবার যো নেই যে কে কার স্ত্রী এবং কে কার স্ত্রী নয়। কেবল চোখ আছে যার সে বুঝবে—নিজের স্ত্রী হলে এই সব স্ত্রীলোকেরা সবাই তাদের এত স্ত্রী-স্ত্রী মনে হত না সর্বক্ষণ। আসল চ্যাপলিনের চেয়ে নকল চ্যাপলিনকে সব সময়েই অনেক বেশি আসল হবার প্রাণপণ চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হতে হয় যে ! শহরে আজকাল প্রায়ই সতীলক্ষ্মীদের মাথায় সতীলক্ষ্মী সিঁদুর নেই ; থাকলেও গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে-আসা শীর্ণ নদীর প্রায় অদৃশ্য রেখার মতো আছে কি নেই বোঝা যায় না। হোটেলে তা হবার উপায় নেই ; এখানে যার বিয়ে হয়নি তারও মাথায় কখনও কখনও সিঁদুর জ্বলজ্বল করতে দেখবেন অনেক দূর থেকে।

হ্যাঁ। ভালো কথা ! সিঁদুর বলতে মনে পড়লো। সদ্যবিবাহিত এক শিশুট্যাক্সি-ড্রাইভার। ফুলশয্যার রাতে লাল টিপপরা নববধূর সঙ্গে আলাপের আরম্ভেই ঘটে গেলো বিপর্যয়। কেস খারাপ হতে পারত ; সাইকোএন্যালিষ্টের কাছে যেতে পারত ; আরও কত কি ঘটতে পারত এই বিবাহ-বিচ্ছেদের [হু]-যুগে ! কিন্তু যেদিন সেই নববিবাহিতা সবুজশাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করতে সবুজ টিপ পরে এলো স্বামীর কাছে সেদিন আর আলাপ ব্যাঘাতের কমা। সেমিকোলন, ফুলষ্টপের বাধা মানলে না মোটেই ! গড়গড় করে এগিয়ে চললো আদরের তুফান মেল নির্দিষ্ট স্থানে আমার নিষেধ অবজ্ঞা করে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ! এগিয়ে চলবেই তো। প্রথম দিন ছিলো লাল

গোল টিপ; শিশুট্যাক্সি-চালকের চোখে যে তা STOP-এর ট্রাফিক সিগন্যাল! আর আজ সবুজ গোল টিপ,—শিশুট্যাক্সি-চালকের চোখে তার সংকেত হচ্ছে : Go!

হোটেলে লোক এবং স্ত্রীলোক চর্চ্চা থেকে আরেকটি সংখ্যাতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় অনায়াসেই। এখানে পরের রমণীঅঙ্গসুখকামনায় যারা বিপুল রিস্ক-এর বিনিময়ে বিপুলতর অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হয় কখনও কখনও তারা সবাই কিছু যে ব্যাচেলার নয়; তাদের অনেকেরই ঘরের রমণী ঘরেই আছে। সেই ঘরের যারা তারা কেউ কেউ ইন্দ্রের ঈর্ষাযোগ্য রমণী; তবুও তাদের স্বামিগণ যে হোটেলের কয়েক ঘণ্টার সুযোগ সৃষ্টি করতে গিয়ে সারা জীবন দুর্য্যোগ পোয়াতে বাধ্য হয় অথবা বধ্য হয়, দেখতে অতি সাধারণ, কখনও রীতিমতো কুৎসিত এমন কারুর সান্নিধ্যে যারা ঘরেরও নয়, পরেরও নয়, কেবল সন্ধ্যেবেলায় কে ডেকে নেয় তারই অপেক্ষায়, এর কারণ কি? এর কারণ এনয় যে এরা সবাই স্ত্রীকে সাঙ্ঘাতিক কষ্ট দেওয়া নিদারুণ বজ্জাত লোক। না। যদিও এই একফোঁটা গুরুতর দোষের চোনা তাদের একাধিক গুণের এক বালতি দুধকে দারুণ অপেয় করে তোলে ঠিকই; তবুও তারা যে বাড়ির দিকে ফিরে তাকায় না। স্ত্রী এবং সন্তানেরা মরলো কি বাঁচলো দেখে না, এমন নয়; বরং এই জাতীয় অনেকেই অনেক চরিত্রবান লোকের চেয়েও ঘর, ঘরণী, এবং সন্তানদের প্রতি কর্তব্য বেশি করে। নিজের স্ত্রীকে তারা ভালোওবাসে কম নয়; তবুও পরনারী থ্রম্বসিসে যে পুরুষ প্রায়ই কাতর হয়। কাৎরায় কেবলই, তার কারণ বোধ হয় ওই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের অভিশাপের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে; আদমের ওপর সেই আদিম অভিশাপেরই অকারণ বোধ হয় এর একমাত্র কারণ হবে।

পুরুষ এবং প্রকৃতির প্রকৃতিই বোধ হয় এই;—অনেকের মধ্যে দিয়ে একের উপাসনা!

নাহলে কেন এই গল্প চালু হবে, যে গল্প অনেকবার শোনা থাকলেও আরেকবার শুনতে বাধা নেই! বইপাগল এক অধ্যাপক

তার স্ত্রীর দিকে যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়ায় তার প্রায় পাগল বউ স্বামীকে শুনিয়ে প্রার্থনা করছে মা কালীর কাছে : মা, যদি আসছে বারে আবার জন্ম দিয়ে পাঠাও এ পৃথিবীতে, তাহলে বউ করে পাঠিও না ; বই করে পাঠিও ; তাহলে অন্ততঃ স্বামীর মন পাব। শুনে বইপাগল অধ্যাপক প্রায়-পাগল বউকে শুনিয়ে বলছে বাবা শঙ্করের কাছে আকুল আবেদনে : যদি মা কালী ওকে বই করেই পাঠায় শেষ পর্যন্ত বউ না করে তাহলে তুমি ওকে পাঁজি করে পাঠিও বাবা যাতে বছর বছর বদলাতে পারি।

কতক্ষণ এই সব স্বপ্নে বিভোর ছিলাম জানি না,—হোষ্টেলের মালিকের ঘরে দারুণ হাল্লায় স্বপ্নভঙ্গ হলো। গিয়ে দেখি, হাবলুর, হাবলু জি-র ট্রাঙ্ক ভেঙ্গে ফেলেছে মালিকের ফোড়েরা। এবং ভেঙ্গে ফেলতেই তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে আলাদিনের আশ্চর্য্য-প্রদীপ ! থরে থরে নোটের বাণ্ডিল সাজানো ! গাদা গাদা একশো টাকার নোট গাদা করা ! কয়েক হাজার টাকা সেই ট্রাঙ্কে,—যে ট্রাঙ্ক নাকি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে তার মালিক হাবলু, আমাদের হাবলু 'জি'-কে এই সন্দেহ করে যে হোটেলের কয়েকটা টাকা মেরে দেবার জন্যে যে পালিয়েছে এই ট্রাঙ্ক ফেলে রেখে।

হোটেলের মালিকের মুখের অবস্থা অবর্ণনীয়। ফোড়েদের মধ্যে একজন প্রেষ্টিজ পাংচার হয়ে যাওয়ায় শুধু বললো : এতো টাকা ট্রাঙ্কে,—তাহলে পালিয়ে বেড়াবার মানে বুঝলাম না তো ! সংগে সংগে প্রত্যুত্তর এলো : এখনি বুঝবেন ! দেখি দুয়ার হতে অদূরে দাঁড়িয়ে স্বয়ং হাবলু গাঙ্গুলি ; আমাদের সেই আদি ও অকৃত্রিম হাবলু 'জি' ! সঙ্গে নিয়ে আসা পুলিশকে জিজ্ঞেস করতে ব্যস্ত হোটেলের মালিক এবং ফোড়েদের শুনিয়ে : ঘরে ট্রেসপাস এবং টাকাভর্তি ট্রাঙ্ক ভাঙায় মিনিমাম কত বছর জেল হয় বলছিলেন ?

॥ এগার ॥

'কাশী বস্তুত ভারতবর্ষের কোনও বিশেষ প্রদেশভুক্ত নয়, কাশী ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেরই।'

—রবীন্দ্রনাথ।

স্মরণের অতীত এক ভারতবর্ষের স্মৃতির ধূসর পাণ্ডুলিপি এই কাশী। 'সব সাধকের সব সাধনার ধারা' এই কাশীতেই কেবল 'মিলিত হয়েছে তারা'। কাশী হিন্দুর। কিন্তু সেই হিন্দুর যে সিন্ধুর মতো অতল, পর্বতের মতো যে মাথা উঁচু করে আছে আকাশে, বসুমতীর মতো যে সর্বংসহা, গভীর অরণ্যের চেয়েও যে গহন, জীবনে যে মৃত্যুর চেয়ে মহৎ এবং মৃ ত্যুতে যে জীবনের চেয়ে দীপ্ত,—কাশী সেই হিন্দুর। সেই হিন্দুর কাশী যে সম্রাট্ আকবরের জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তরে সবাই যখন নীরব, তখনও নিরুত্তর থাকেনি। জগদীশ্বরের পরেই ছিলো একদা মোগল ভারতে যে একজনের স্থান সেই দিল্লীশ্বর জানতে চেয়েছিলেন ছুটি জিজ্ঞাসার জবাব। চরম তৃষ্ণার উত্তরে প্রার্থনা করেছিলেন পরম পানীয়। তাঁর প্রশ্ন ছিলো ছুটি ; এক,—ভগবান কি পারেন আর ভগবান কি পারেন না ? দুই,—আর, এই মুহূর্তে ভগবান কি করছেন ?

মুহূর্তের মধ্যে দিল্লীশ্বরের এই জগদীশ্বর সম্পর্কে কৌতূহলের কথা রটে গেল আসমুদ্র হিমাচলের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। অনন্তর উদ্দেশে অনন্তর নিক্ষিপ্ত এই ঢিল পাণ্ডিত্যের মৌচাকে পড়তেই ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়া নানা ধর্মের নানা মধুকরের উদ্যত হুলের অন্ত রইলো না আর। কিন্তু প্রশ্নের কুঁড়িতে ব্যাখ্যা আর টিকার, ইণ্টারপিটেসান আর এলিউসিডেশানের হুল যতই আঘাত করুক; জিজ্ঞাসার ফুল ফোটাতে পারলো না

কিছুতেই। সেই ফুল নয়; বিউটিফুল তার উত্তর বহন করে আনে যিনি অবশেষে তিনি এক হিন্দু সন্ন্যাসী।

দিল্লীশ্বরের সামনে এসে দাঁড়ালেন জগদীশ্বরের ভক্ত। বললেন: হে সম্রাট্ ভিখারী, তোমার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, ভগবান সম্ভবকে অসম্ভব করতে পারেন; অসম্ভবকে সম্ভব। একটি জিনিষ কেবল পারেন না তিনি; জীবকে তিনি তাঁর বক্ষচ্যুত করতে পারেন না কিছুতেই। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, তোমার চোখে গুরু এবং আমার চোখে শিষ্য রূপে স্বয়ং ভগবান এই মুহূর্তে গুরু-শিষ্য সম্বাদ করছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয়,—দুই চরম জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তরে আজও পর্যন্ত হিন্দুভারতের এই হচ্ছে অদ্বিতীয় পরম উত্তর।

এই হিন্দুভারতেই আবার অতিরিক্ত প্রাচুর্যের মধ্যে যার অহোরাত্র বাস সেই রাজা জনকের কাছেই যেতে হয়েছিলো তত্ত্বজিজ্ঞাসু শুকদেবকে,—অতি রিক্ত অবস্থার মধ্যে যার বছরের বেশির ভাগ সময়েই উপবাস। ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন যিনি বৈরাগ্যজ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে, সেই শুকদেব প্রশ্ন করলেন: চরমজ্ঞানের জন্যে আমার আর কি করণীয় বাকী? আদেশ হলো, রাজা জনকের কাছে যেতে। দ্বিরুক্তি না করে সেই মুহূর্তে যাত্রা করলেন বৈরাগী শুকদেব বৈভবী জনকের কাছে। যাচ্ঞা করলেন উপদেশ। প্রার্থনার উত্তরে রাজা জনক কেবল ভৃত্যকে বললেন, উন্মুক্ত করে দিতে অতিথিশালা। দিনের পর দিন যায়, রাতের পর রাত, উত্তর মেলে না শুকদেবের। অবশেষে সিদ্ধান্তে আসেন বৈরাগী যে এই বৈভবী সুখ দেবে, কিন্তু শুকদেবের প্রশ্নের উত্তর দেবে না। দেবে কেমন করে? বিলাসের মধ্যে তিনি নেই, বৈরাগ্যের মধ্যেই কেবল যিনি আছেন।

বিদায় নেবেন বলে যখন শুকদেব সংকল্পে প্রায় স্থির তখন একদিন রাজপুরীতে আগুন লাগায় অস্থির হয়ে পড়েন তিনি। অলিন্দে শুকোতে দেওয়া একটি মাত্র সম্বল, একটি কৌপীনকে

অগ্নির জঠর থেকে বাঁচাতে দৌড়ে আসেন জন্মবৈরাগী শুকদেব! কৌপীনে হাত পড়তেই শুনতে পান হাসি। হাসি নয়; রাজা জনকের অট্টহাসি। একটি মাত্র কৌপীনের মায়া ত্যাগ করতে পারেন নি বৈরাগী; আর রাজপুরী পুড়ে ছাই হতে দেখেও হাসতে পারছেন বৈভবী! কেন জনকের কাছে আসার আদেশ হয়েছিলো তাঁর প্রতি, শুকদেব তা অবগত নয় কেবল, মর্মগত হন মুহূর্তে।

এই হাসি আজও কেবল কাশীর মাটিতেই কান পাতলে শোনা যায়। সেই কাশী আজও হাসে কখনও কখনও! উত্তরবাহিনী যেখানে গঙ্গা তারই তীরে দাঁড়িয়ে কাশীর সেই অট্টহাসি আজও শুনি; 'পণ্ডিতেরা মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে, সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে' যেমন হেসেছে সে বার বার!

সেই ভারতবর্ষের কথা বলছি না, যে ভারতবর্ষে সাহেব ছিলো একদা দারুণ এবং যে ভারতবর্ষে অধুনা মোসাহেবরা নিদারুণ বিভীষিকা। সেই ভারতবর্ষের কথা বলছি, যে ভারতবর্ষ একদিকে গীতার; আরেকদিকে গীতাঞ্জলির। যে ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যজীবনে এবং রামকৃষ্ণ ঠাকুরের জীবনকাব্যেই আজও বিধৃত। সেই ভারতবর্ষের কথা এখন বলছি না, যে ভারতবর্ষে হিন্দী বললে যেমন সুবিধার অন্ত নেই তেমনই নিজেকে 'হিন্দু' বললে যে ভারতবর্ষে অসুবিধা অনন্ত। হিন্দুর ভারতের বদলে হিন্দির এ-ভারত সেকুলার নয়, পেক্যুলার স্টেট! এ ভারতবর্ষ বিশ্বপ্রেমে মশগুল; ভারতবাসী বলে আজ কেউ নেই; আছে কেবল উপবাসী ভারত। কাশী এ ভারতের প্রাণকেন্দ্র নয়; এ কাশীতে একাশিবার গেলেও তাই কোনও পুণ্য হয় না। সেই কাশীর কথা বলছি যে কাশী কোন প্রদেশের নয়, ছিলো সকল দেশের। যে কাশী ছিলো সেই হিন্দুর যে নিজেকে বাঙালী, মারাঠি, গুজরাটি, ওড়িয়া আসামী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী ভাবেনি! যে নিজেকে জানতো পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার অনির্বাণ অগ্নিশিখার পরিচয়ে প্রদীপ্ত বলে। যার সমস্যার অভাব ছিলো না; কিন্তু ভাষায় তা প্রকাশ করবার ছিলো না বাধা।

ভাষা সমস্যা ছিলো না সেদিন ; কারণ হৃদয়ের ভাষায় তারা কথা বলতো সেদিন। প্রাণের ভাষায় নয়।

সেই হিন্দুর ছিলো কাশী। প্রাণধারণের উর্দ্ধে ধ্যানধারণার পৃথিবী তার যে সূর্যকে অযুতনিযুত বৎসর করেছে প্রদক্ষিণ, বৃন্দাবন তারই যৌবনের উপবন ; বারাণসী তারই বার্দ্ধক্যের আনন্দকেতন। আমরা আজ যারা 'দশরথের চার ছেলে,-র হিন্দি করছি দশরথ কি চৌবাচ্চা বলে ; আমরা যারা মনে মনে প্রতি মুহূর্তে নিজেদের অহম অথবা আসামী, শিখ অথবা পাঞ্জাবী, গুজরাটি অথবা মারাঠি ছাড়া কিছু ভাবতে পারছি না, অথচ মুখে বলছি আমরা সবাই 'India that is Bharat' ; আমরা যারা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই-না-করে-জেতার দুঃখ ইংরেজি ভাষার সঙ্গে লড়াই করে পোষাবার চেষ্টা করছি আমরা নামে হিন্দু প্রণামে কাল মার্কস ; গ্রামে কংগ্রেস, শহরে কম্যুনিষ্ট ; আমাদের দক্ষিণে ধর্মের নামে নরবলি, বামে ধর্মঘটের নামে বানরবলি অব্যাহত। আমরা মুখে রামকৃষ্ণ বলি, মনে বলি, রামকৃষ্ণ ডালমিয়া ! আমাদের একদিকে টানছে ডিভোর্স, আরেক দিকে ডিভাইন ফোর্স। আমাদের বক্তৃতায় কেবল গ্রাম ; আমাদের প্রত্যেকের বাসায় রেডিও এবং বাসনায় রেডিও-গ্রাম। মুখে মা, মনে সিনেমা ! আমাদের এক চোখ চরম রুষের দিকে ; আরেক চোখ পরম পুরুষের দিকে, একই সঙ্গে বিস্ময়ে পলকহীন !

হিন্দি বলতে আজ যে আমরা গর্ব করি, কিন্তু নিজেদের হিন্দু বলতে লজ্জা পাই তার কারণ, এই হিন্দুরা কি এবং কে আমরা আজ জানি না এবং জানতে চাই না তাই। হিন্দু বলতে আমরা কেবল বুঝি যারা মূর্তিপূজায় এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণে বিশ্বাস করে। এবং যেহেতু মাটির পুতুলে তারা মায়ের প্রতিমাকে দেখতে পায় ; তাকে মাটি না করে, 'মা'-টিতে উত্তীর্ণ করে সেই হেতু তারা পৌত্তলিক। রাজনৈতিক [অভি]-নেতাদের ছবি অথবা মূর্তি ঘরে রাখুন, ঘরে-বাইরে আপনি সোস্যাল কনশাস বলে অভিনন্দিত

হবেন ; বিরুদ্ধ পক্ষ কর্তৃক নিন্দিত হবেন অবশ্য;—কিন্তু সে মূর্তি-পূজার কারণে নয়, যার মূর্তি ধ্যান করছেন তার প্রতি বিরুদ্ধ পক্ষের বিদ্বেষের অকারণে। কিন্তু মাতৃমূর্তি ধ্যান করতে ধারণায় আনতে সুবিধের জন্যে, 'মা'-টি অনুধ্যানে নিবিষ্ট চিত্ত হবার জন্যে মাটির তৈরী প্রতীক ঘরে রাখুন ঘরে-বাইরে আপনি প্রতিক্রিয়াশীল বলে অবধারিত গ্রাহ্য হবেন যে এ বিষয়ে আর যারই সন্দেহ থাক, আপনি যে নিঃসন্দেহ তাতে আর সংশয় কার ?

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রে যারা সমাজ ভাগ করেছিলেন, মানুষকে তাঁরা ক্ষুদ্র করবার জন্যে এই ভাগ করেননি। ভারত ভাগ করেছে যারা আজ তাদের চেয়ে তাঁরা নির্বোধ ছিলেন না। সবাই যদি যজ্ঞ নিয়ে থাকে তাহলে দেশকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করবার যোগ্য লোক পাওয়া ভার হবে, তাই ক্ষত্রিয়। অন্নচিন্তার তুলনায় কোনও অন্য চিন্তাই অর্থহীন তাই ব্যবসা, বাণিজ্য, চাষবাসের জন্যেও একদল লোকের বিশেষ কেবল সেই কাজেই নিযুক্ত থাকার প্রয়োজন দেখা দিলো ; তারাই বৈশ্য। এবং অপরিহার্য সেকাজগুলি না সম্পন্ন হলে সম্পন্নমহল থেকে বিত্তহীন পর্যন্ত সবাই অচল,—সকলের সেবায় যারা মহত্তম কর্মে নিরত নিযুক্ত, সেই শূদ্রকে ক্ষুদ্র বলে বিবেচনা করেনি সেই হিন্দুরা কাশী যাদের জীবন ও কর্মের কেন্দ্র ছিলো একদা !

শ্রেণী লোপের যারা আজ সাঙ্ঘাতিক সংগ্রামী তাদের সমাজ কি বলছে। বলছে বসুন্ধরা বীরভোগ্যা নয় ; বসুন্ধরা তদ্বিরভোগ্যা। পৃথিবীটা কার ? না, পৃথিবী টাকার। সেই প্রাচীন হিন্দু ভারতে অর্থহীন ব্রাহ্মণ, বিদ্যা, চরিত্র, নির্লোভতার জোরে রাজার চেয়েও ছিলেন অনেক বেশি পূজার পাত্র। রাজার আদর ছিলো স্বদেশে ; বিদ্বানের আদর ছিলো সর্বত্র। আজ। যার পয়সা আছে, সমাজ কেবল সেই মুষ্টিমেয়র। একদল ব্রেডের লড়াই-এ ক্ষত-বিক্ষত যখন তখন আরেক দল রুটির দুদিকে পুরু করে butter লাগিয়ে খেতে খেতে বাটারফ্লায়ের স্বপ্ন দেখছে শুধু। শূদ্র যে এ জন্মে, তার অধিকার

ছিলো কর্মের মহত্ত্বে ব্রাহ্মণ হবার। এ যুগের যারা 'হ্যাভেনটস্' জন্মে জন্মে তারা ওই সবহারানোদের, সবহারাদেরই দলের। হিন্দুদের কাষ্ট সিষ্টেম যদি প্রগতির পরিপন্থী হয়, তবে আজকের দিনে এই নয়াবাদ যার যথার্থ নামকরণ হওয়া উচিত cursed system,—এ তাহলে জগৎজুড়ে বর্তমান তুর্গতির, এখনও অনেক অনেক দূরে গতি যার বাকী, তার প্রচণ্ড অনুকূল ছাড়া আর কিছু নয়।

যদি কেউ বলেন শূদ্রদের হাতে না খাবার কারণ কি ছিলো হিন্দু ব্রাহ্মণের ; তাহলে তরে উত্তরে বলব, ছিলো ; এবং এখনও আছে। ব্রাহ্মণেরা সেদিন শূদ্রের হাতে খেত না তার কারণ এ নয় যে তারা শূদ্রকে অমানুষ জ্ঞান করতো। কারণ ব্রাহ্মণতর কারুর হাতে খাওয়াই ব্রাহ্মণের পক্ষে অবিধেয় ছিলো। স্বপাক আহারই ছিলো ব্রাহ্মণসম্মত ; জীবনসঙ্গত। কিন্তু কেন এই বিধিনিষেধ ? এর কারণ ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরের ভয়াবহ পরিণাম তাঁরা অবগত ছিলেন। যা তা খেলে অসুখ করে, এইটুকু জেনেই আমরা যেমন বিজ্ঞানের [হু] যুগে আজ আত্মসন্তুষ্ট, সেদিন জ্ঞানের যুগে তাঁরা ওর চেয়ে একটু বেশিই জানতেন। কেবল যা তা খেলেই নয় ; যার তার হাতে খেলেও সুখ হয় না,—এ জ্ঞান এ বিজ্ঞান তাঁদের কেবল করতলগত নয়, অস্থিমজ্জাগত ছিলো যে !

আজ থেকে অনেক দিন আগে এক সন্ন্যাসী অনেক রাত্রে একা ব্রাহ্মণের গৃহে রাতটুকুর জন্যে অতিথি হয়েছেন। সন্ন্যাসীর আগমনকে মহা সৌভাগ্যসুখজ্ঞানে, বিত্তবান না হলেও চিত্তবান সেই ব্রাহ্মণ যথাসাধ্য সেবা এবং আতিথেয়তার পরিচয় দিয়েছেন। রাতে শুতে দিয়েছেন সেই ঘরে যে ঘরে নিজেরাও কখনও করেননি শয়ন, সেই সালঙ্কার কৃষ্ণগোপাল আর রাধার পূজালয়ে। সূর্য ওঠবার মুহূর্তে ব্রাহ্মণ ঘরে এসে দেখেন, সন্ন্যাসী নেই, আর নেই কৃষ্ণ-রাধার স্বর্ণাভরণ।

সন্ন্যাসী তখন হন্ হন্ করে হেঁটে চলেছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের নিরাপদ দূরত্বে।

সূর্যদেব যখন দিনান্তে পরিশ্রমান্তে বসেছেন পাটে এবং ব্রাহ্মণের হতাশ মুখে যখন পর্যন্ত ওঠেনি একগ্রাস অন্নও, ঠিক সেই মুহূর্তে ফিরে এসেছেন সন্ন্যাসী। সমস্ত অপহৃত অলঙ্কার সমেত। এসে রাধাকৃষ্ণের পায়ের কাছে পড়ে কেঁদে উঠেছেন হাউ হাউ করে। ব্রাহ্মণও তখন কাঁদছেন। ফিরে পাবার গভীর আনন্দে নয়; নয়, ঠাকুরের অলঙ্কার চলে যাবার সুগভীর বেদনায়। সন্ন্যাসীর দুই পা জড়িয়ে ব্রাহ্মণ কেবলই বলেন: সন্ন্যাসী ঠাকুর সব অপরাধ আমার। হতবাক সন্ন্যাসীর জিজ্ঞাসা: চুরি করলাম আমি, অপরাধ তোমার কেন ঠাকুর? কারণ,—ব্রাহ্মণ তখন ব্যক্ত করে: তোমাকে যে অন্ন দিয়েছিলাম, সে চাল আমি পেয়েছিলাম শ্রাদ্ধবাড়িতে। শ্রাদ্ধের অন্ন দিতে নেই কাউকে; দিতে হয় শ্রদ্ধার অন্ন। যার শ্রাদ্ধে পেয়েছিলাম এই চাল, অন্যায় পথে সে সঞ্চয় করেছিলো বিপুল সম্পদ। তার সেই মনের প্রভাব ক্ষণকালের জন্যে তোমাকে আচ্ছন্ন করে তোমাকে দিয়ে করিয়েছে অপহরণ। সেই চাল হজম হয়ে যেতেই উঠে এসেছ তুমি তমসাচ্ছন্ন লোক থেকে তোমার অন্তরের সরল, সাধু, স্বচ্ছ আলোকে। এ পাপ তোমার নয় সন্ন্যাসী; এ পাপ আমার!—

খাদ্যে কেবল শরীর গঠিত হয় এ সেই হিন্দুরা বিশ্বাস করতেন না। খাদ্যের প্রভাব মনের ভাবের ওপরেও পড়ে, এ যুগের বিজ্ঞান যেদিন পুনরুদ্ধার করতে পারবে এই জ্ঞান, কেবল সেদিনই হিন্দুদের মতো করে বলতে পারবে সে, যা তা খাওয়াই বারণ নয় শুধু; যার তার হাতে খাওয়াও নিবারণযোগ্য!

কাশী কেবল এই হিন্দুরই। এই হিন্দুরই কেবল কাশী!

হিন্দুরা কে এবং কি, একথা জানতে হলে যেতে হবে না অতীত ভারতের সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষে! আজও তার পরিচয় প্রদীপ্ত হিন্দুদের শ্রাদ্ধের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যেই; যেখানে হিন্দু বলছে এই পৃথিবীর কোনও প্রান্তে এমন হতভাগ্য যদি কেউ থাকে, অপুত্রক, এমন কেউ যার আত্মার শান্তির জন্যে ইহলোকে নেই,

এমন কেউ যে দেয় এক গণ্ডুষ জল,—আজ এই শ্রাদ্ধবাসের তার উদ্দেশ্যেও শ্রদ্ধামিশ্রিত শ্রাদ্ধবারিতে করছি তিলতর্পণ! হিন্দু অথবা ভারতবাসীর কথা নয়। অকূল আর কোনও সিন্ধুতীরে, মরুদেশ থেকে মেরুদেশ পর্যন্ত সকল চর্মের সকল ধর্মের মানুষের প্রতি মানুষের এই চরম নিবেদন, এই পরম তর্পণ,—হিন্দু ছাড়া আর কার মুখে হয়েছে একবারও উচ্চারিত?

কাশীতে এই হিন্দুই কেবল সংকল্প করতে পেরেছে 'এক বিশ্বের'; আরেক বিস্ময়ের! পৃথিবীর মানুষ যদি ফানুসের ভয়েও এক হয় কোনও দিন কোনও এক জায়গায়,—সে স্থান যদি কাশী না-ও হয় তবুও হিন্দুর এই সংকল্পের ফলেই কোনও এক কল্পে তা সম্ভব হবে। কারণ সবার উপরে মানুষ সত্য,—সবার উপরে ফানুস সত্য নয়, একথা মহামানবের সাগরতীরে ভারতবর্ষেরই জীবন ও বাণী!

ভারতবর্ষ কেবল কবির দেশ নয়; পৃথিবীর প্রথম কবিরাজের জন্মও বোধহয় সেদিন সুনীল জলধিজাত ভারতই দিয়েছে। এই কবিরাজরাই যাবতীয় রোগের প্রস্তুত করেছে প্রতিষেধক। তারপর বলেছে, এছাড়াও আছে, এই তালিকার বাইরেও রয়েছে আর এক রোগ; আরেক মহাব্যাধি,—তার নাম মৃত্যু। সে রোগের নিদান নেই ওই প্রতিষেধকের তালিকায়। মৃত্যুরোগের একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে হরিনাম। হরণকালে হরির নাম করো; প্রণাম করো তাঁকে। তিনি রাখলে মারে কে? তিনি মারলে রাখে কে! ভারতবর্ষের এই শেষ কথার মধ্যেই রয়ে গেছে সেই অশেষ কথা, ভারতীয় কবিরাজের সে উক্তির প্রায় পুনরুক্তি করে বলেছিলেন জগদ্‌কবিদের রাজা রবীন্দ্রনাথ। জীবনদীপ নির্বাপিত হবার আগে সূর্যদীপ্ত সেই প্রতিভা জ্বলে উঠেছিলো যখন শল্যাহত হতে অনিচ্ছুক কবিকে পার্ষদরা বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টায় বলেছিলো যে অপারেশন ছাড়াও কবি সুস্থ হবেন, তবুও অপারেশন কেন, না, সাবধানের মার নেই! শুনে, যাবার সময় হলো যে বিহঙ্গের, সে বিহঙ্গ কোনও দুঃসময়েই

বন্ধ করেনি গানের পাখ, সে বিহঙ্গ হেসে বলেছিলো : কিন্তু মারেরও সাবধান নেই !

আজকে যে হিন্দু মারা গেলে মাঝরাতে পাড়াপড়সীকে স্মরণ না করে পারে না বলহরি হরিবোল ডাকে, সে হিন্দুর কথা বলছি না। জীবনে যারা গোলে হরিবোল দিতে অভ্যস্ত হয়েছে, মরণে তারা সে বোল পরবর্তীদের কানে তুলে দিতে ভুলবে কেন ?

এই ভারত কেবল কলার গুরুকে নয়; কামকলার গুরু বাৎসায়নকেও বলেছে ঋষি। বলেছে ; বলতে পেরেছে যে তার কারণ, তারা জানক কলার নয় কেবল, কামেরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন। কাম তাদের কাছে লজ্জার অথবা গোপন করবার ছিলোনা বিষয়। কাম থেকেই যে সমস্ত কামনার জন্ম,—একথা ফ্রয়েডের জন্মের শতসহস্র শতাব্দী আগে ভারতের মুখে উচ্চারিত। স্বপ্নব্যাখ্যার সে আধুনিক প্রয়াসে আমরা মূর্ছা যাই, তার আবির্ভাবের স্মারণাতীত কাল পূর্বে ভারতবর্ষ স্বপ্নতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে যে তথ্য উদ্ধার করেছে তা আজও যদি কেউ পুনরুদ্ধার করে আবার তাহলে সে স্বপ্নাতীত ব্যাপার বলে স্বীকার করবেই ; করতে বাধ্য হবে সে।

পুরীর মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ কামকলার বিচিত্র চিত্র দর্শন অথবা বাৎসায়নের কামশাস্ত্র পাঠ করবে যারা বিকৃত অসুস্থ কামনা চরিতার্থ করবার কারণে কেবল তারা নয় ; যারা ওর মধ্যে দেখবে যে সেদিনের প্রাণবন্ত বীর্যোচ্ছল বীরভোগ্যা বসুন্ধরার যারা অধীশ্বর তারা জীবনের এমন কোনও দিক ছিলোনা যার সম্বন্ধে না ছিলো পূর্ণোৎসাহি পুরুষ। শুধু তারাই জানবে যে, বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি ছিলো না তাদের মত ; রূপগন্ধশব্দস্পর্শস্পন্দিত পৃথিবীর প্রতি কণায় তারা পেয়েছে ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরকে। ইন্দ্রিয়ের সাধনা করতে করতেই তারা খুঁজে পেয়েছে ইন্দ্রের সাধ্যাতীত, সেই ইন্দ্রিয়াতীতকে।

তাই ঋষি বলেছে তারা জীবনায়নের জন্মদাতা বাৎসায়নকে। আজকের দিনে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সে কিছু ভাবে না, কেবল

ছাগলদাড়ি রাখে এবং পাগলবাণী দেয় এই কারণে সবাই যাকে ঋষি ভাবে, তেমন ঋষি নয়। সত্য অর্থ্যৎ ঋক-এর তপস্যায় অহর্নিশি যিনি নিরত,—তিনিই শুধু ঋষি।

তেমন ঋষিই ছিলেন ভগবান ভৃগু। সংখ্যাগণনার অতীত সংখ্যায় মানুষের ভবিষ্যৎ গণনা করে গেছেন তিনি। যতরকম গ্রহসন্নিবেশে জন্মাতে পারে মানুষ, ভৃগুর আগে, তাঁর সময়ে এবং তাঁর পরে, আদিকাল থেকে অনাদিকাল পর্যন্ত, গ্রহসন্নিবেশের সম্ভব-অসম্ভব পার্মুটেশান-কম্বিনেশান অগণিত গণিত কষে কষে বার করে গেছেন ; যদি কেউ বলেন যে সেগুলি যে অভ্রান্ত তার প্রমাণ কিসে ? তাহলে বলব সে প্রমাণের প্রয়োজন কিসে ? বর্ত্তমান আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ অন্য। আমি কেবল বলতে চাইছি যে সেদিনকার ভারতীয়রা জীবনের কত গভীরে অনুপ্রবেশ করেছিলো, বাৎসায়নের কামকলা, ভৃগুর ফলিত জ্যোতির্বিজ্ঞান তারই তুলনাহীন দৃষ্টান্ত কি না,—শুধু তারই বিচার করুন।

আজকের জ্যোতিষ-জমিদারের কথা নয়। পাঁচটার একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে গেলে যিনি আপনাকেই প্রথম প্রশ্ন করবেন ; বয়স কত। আপনি বললেন : সাতাশ। ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর জ্যোতিষ-জমিদারের ; যান, আপনার বয়স, আর পাঁচ বছর বাদে বত্রিশ হবে। যেতেই হয় আপনাকে ; চলে যেতেই হয় আপনাকে অগত্যা। আপনার সবেধন নীলমণি পাঁচটি টাকা ততক্ষণে চলে গেছে জ্যোতিষ-জমিদারের পকেটে রকেটের চেয়েও দ্রুতবেগে অনেক। আর তাছাড়া, আপনার বর্ত্তমান বয়স সাতাশ হলে, পাঁচ বছর বাদে আপনার বয়স বত্রিশ হবে,—এমন অকাট্য গণনা মাত্র পাঁচ টাকায় করা আপনারও অসাধ্য ছিলো যে!

কালিদাসের কালে যারা জন্মায়নি তারাই আজকের জগৎকে আর আজকের জগজ্জনকে ভেবেছে নিদারুণ মডার্ণ। কালিদাসের কালে জন্মালে লোকে জানতো, স্ত্রীলোকে জানতো অনেক বেশি সে, তাদের সময়েও ছিলো লিপষ্টিক, কিউটেক্স, রুজ, পাওডার পর্যাপ্ত

পরিমাণে ছিলো তার ব্যবহার। অন্য নামের মেয়েদের চুলে, ঠোঁটে, মুখে, বুকে বিরাজ করত লোধ্ররেণু, অলক্তরাগ। চন্দন-কুমকুম, —আরও কত কি। এমন কি, আজকের যে লেটেষ্ট মডেলের বুক-ঢাকা যাতে নাকি বুক ঢাকা যাবে না, তারও বিকল্প ছিলো সেদিন। পত্রলেখার বক্ষবরণ সেই বিচিত্র বিকল্প। দেহকে তারা আদর করতে জানত; কারণ তারা দেহকে জানত দেহাতীতের আলয় বলে। দেহাতীতের আলোয় তারা দেহালয়কে দেখেছে সেদিন। তারাই সত্য করে বলতে পারত সেদিন: আমার এই দেহখানি তুলে ধর,—তোমার এই দেবালয়ের প্রদীপ কর!

এই ভারতবর্ষই বলেছে বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। কিন্তু বীর বলতে এই ভারত কেবলমাত্র দেশ জয় করেছে যারা বাহুবলে তাদের কথা বলেনি। সমস্ত কীর্তির চেয়ে মহৎ যে মানুষ দেশে-কালে বেরিয়েছে জয় করতে মানুষের হৃদয় চরিত্রবলে তাদেরকেই স্বীকার করেছে সত্যিকারের বীর বলে। শক্তির উপাসককে ভারত নিবেদন করেছে তার শ্রদ্ধা, কিন্তু সমস্ত শক্তির চেয়েও যার শক্তি বেশি সেই নিরাশক্তির যারা সাধক তাদেরই ভারত করেছে পূজা যুগে যুগান্তরে। এই জন্যে ভারত যাকে বীর বলেছে সে শুধু বীর নয়; তাঁর পুণ্য নাম রঘুবীর ['কে পেয়েছে সবচে' কে দিয়েছে তাহার অধিক]।

এই রঘুবীর-এর জনক রাজা দশরথ, গুরুতর অন্যায় করে ফেলে; এসেছেন ঋষির কাছে জানতে প্রায়শ্চিত্তের বিধান। ঋষি সেই সময়ে কুটীরে না থাকায় ঋষিপুত্র বলেছেন, তিনবার 'রাম'-নাম করতে। দশরথ চলে গেলে ঘরে ফিরে ঋষি সেই কথা শুনে শাপ দিয়েছেন পুত্রকে; সে-নাম একবার করলেই অসংখ্য জন্মের সমস্ত পাপ শূন্য হয়ে পরিবর্তিত হয় মুহূর্তকালের মধ্যে অক্ষয় পুণ্যে,—সে নাম তিন-বার করতে বলেছেন কেন ঋষিপুত্র? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে সহস্রবার 'রাম'-নামেও অপ্রাপনীয়।

কাশী কেবল এই ভারতেরই মর্মকেন্দ্র। এই হচ্ছে বার্দ্ধক্যে বারাণসীর ভূমিকা; তার যথার্থ এবং একমাত্র পটভূমিকা। এই

ভূমিকা মনে অনির্বাণ অগ্নিশিখার মতো নিত্য জাগ্রত না থাকলে লক্ষবার কাশী গেলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ঘুরতে হবে, যেমন ঘুরছি আমরা ; জন্ম-জন্মান্তরের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছি কেবলই !

কবি তাজমহলকে বলছেন, কালের কপোলে মুক্তোর মতো মালিন্যমুক্ত এক বিন্দু অশ্রুজল। কাশী হচ্ছে চিরকালের জন্যে চলিষ্ণু মুহূর্তের দল থেকে ছিটকে-পড়া একটি মুহূর্ত ;—অন্তহীন একটি মুহূর্ত। এক অনন্ত মুহূর্ত !

যদি কেউ বলেন যে এসব কথা তো কাব্যকাহিনী অথবা পুরাণের গল্প মাত্র ;—তাহলে বলি কোনও কাহিনী কখনও মরে না ; সত্য যা শতশতাব্দীর আঘাতে সে টলে না, অপমানে হয় না অস্থির, সাময়িক বিস্মৃতির অতল থেকে উঠে আসে যখন-তখন, দেখা যায় মানুষের স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষিত সেই হাসি-কান্নার হীরা-পান্নায় গাঁথা সোনার কাহিনীগুলিই শুধু মানুষের চিরকালের ধন। সেই অমর কাহিনীরই তো আরেক নাম কাব্য। আর সে গল্প কখনও পুরানো হয় না, তারই নাম তো পুরাণ !

যে জায়গায় দাঁড়িয়ে অবিস্মরণীয় এই ভারতচিত্র চলচ্চিত্রের মতো স্মৃতির রজতপটে অলোছায়ার খেলা খেলছিলো, সে স্থান পুণ্যভূমি কাশীর সবচেয়ে পুণ্য, সবচেয়ে পূর্ণ, সবচেয়ে পবিত্র, আমার সবচেয়ে প্রিয় স্থান হরিশ্চন্দ্রের নামাঙ্কিত শ্মশানঘাট।

বাইরের আকাশে চন্দ্রের উদয় আছে ; বিলয় আছে। মানুষের মনের আকাশে যার নেই অস্ত যাওয়া, সেই চির-উদিত চন্দ্রের নামই হরিশ্চন্দ্র !

রাজা হরিশ্চন্দ্রের দানতপস্যার পরীক্ষাকল্পে প্রার্থী চেয়ে বসেছেন সসাগরা পৃথিবী। মুহূর্তমাত্রও দেরী হয় না রাজার তা দিতে। কিন্তু পরের মুহূর্তেই তাঁর স্মরণ হয় দানের সঙ্গে দিতে হয় দানকর ; দিতে হয় 'বেণীর সঙ্গে মাথা' ! সময় নেন হরিশ্চন্দ্র। সময় যখন সমাপ্তির মুহূর্তে গড়িয়েছে প্রায়,—তখন মনে পড়ে তাঁর এই কাশীর কথাই সর্বপ্রথম। সসাগরা পৃথিবী দান করে দেবার পর যে পৃথিবীতে বাস

করার, উপবাস করার অধিকারও যে তিনি হারিয়েছেন। হারান ; ক্ষতি নেই। সসাগরা পৃথিবীর বাইরে রয়েছে এখনও আরেক পৃথিবী। সমস্ত বসুন্ধরার দু বাহু দিয়েও যাকে ধরা যায়নি সেই কাশীর দ্বার মুক্ত রয়েছে এখনও রিক্ত রক্তাক্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের জন্যে।

সেইখানে চণ্ডালের কাছে নিজেকে বিক্রয় করেন রাজা ; তবুও দানধর্মের প্রতিজ্ঞায় অবিচল হরিশ্চন্দ্র ; প্রতিজ্ঞাভঙ্গের যুপকাষ্ঠে আত্মবিক্রয় করেন না তিনি। দানকর দিতে গিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে বাধ্য হন রাণী শৈব্যা আর পুত্র রোহিতাশ্বকে। কিন্তু তবুও কি পরীক্ষার শেষ হয় ? না। এ যে সত্যরক্ষার অগ্নিপরীক্ষা। সত্য যে কঠিন বড়ো ! সে কঠিনকে তবুও ভালোবাসতে হয়, 'সে কখনো করে না বঞ্চনা !'

হরিশ্চন্দ্রঘাটে দাঁড়িয়ে কল্পনায় ফিরে যায় কল্পনাতীত সেই 'কৃষ্ণা-রজনী'-তে। বিদ্যুৎ বিচলিত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ তারাহারা নিঃসীম অন্ধকার সেই রাত। প্রলয়াহ্বানে সাড়া দিয়েছে সারা জগৎ। শ্মশানঘাট থেকে সেদিনও ছুটি নেই চণ্ডালের ক্রীতদাস একদা রাজা হরিশ্চন্দ্রের। তখনও অপেক্ষায় আছেন সংসার থেকে ছুটি হয়ে গেছে এমন কেউ যদি আসে দৈবাৎ তার জন্যে। অপেক্ষা সার্থক [!] হয়।

সর্পনিহত বালককে নিয়ে এসে দাঁড়ায় এক নিঃস্ব রমণী সন্তানের দাহকার্যের কারণে। কর্তব্যনিষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র চান তাঁর প্রতিপালক শ্মশানেশ্বরের প্রাপ্য। কণ্ঠস্বর শুনে কেঁদে ফেলে মৃতপুত্র ক্রোড়ে সেই কান্তা। আর সেই মুহূর্তে বজ্রনির্ঘোষে কেঁপে ওঠে পায়ের তলায় মাটির পৃথিবী ; বেদনায় বিদীর্ণ হয় সর্বংসহা বসুন্ধরার বুক। দুলে ওঠে পৃথিবী। ফুলে ওঠে সাগরের উদগত অশ্রু আর জ্বলে ওঠে বিদ্যুতালোকে আকাশের বুক। রাজা হরিশ্চন্দ্র সেই আলোয় দেখেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, মৃতপুত্র রোহিতাশ্ব-ক্রোড়ে রাণী শৈব্যা ; তাঁর চোখ টলমল করছে জল। আর সেই মুহূর্তেই মরলোকে বেজে ওঠে জয়ডঙ্ক ; অমরলোক থেকে হয় পুষ্পবৃষ্টি ! অযুত নিযুত বৎসরের সূর্য প্রদক্ষিণের পথে চলতে চলতে থেমে যায় চিরকালের

চাকা ! প্রতি মুহূর্তে প্রস্ফুটিত কালের শতদল থেকে খসে পড়ে একটি পাপড়ি। অন্তর্নিশ্চিত মুহূর্তের দল থেকে জন্ম নেয় দল ছাড়া একটি অনন্ত মুহূর্ত !

মর্ত্যলোকের সঙ্গে অমর্ত্যলোকের মাল্যবদলের সেই মিলনরাত্রে অসীমকালের আকাশ-প্রদীপ জ্বলে ওঠে মৃত্যুহীন প্রাণের, জ্যোতির্ময়ী একটি গানের, অনির্বাণ আলোকশিখা !

পূরাণের বলেই হরিশ্চন্দ্র কি কখনও পুরানো হবার ?

॥ বারো ॥

'History, in the conventional European sense, has never possessed much interest for the Hindu Mind.'

—হ্যাভেল।

সময়ের চেয়ে বয়সে প্রাচীন এই কাশীর বয়স কত, কে বলবে? সহস্রলোচন জাবাকুসুমসঙ্কাশ, রক্তবর্ণ সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন তখন। দিনের আলো রাত্রির মুখচুম্বন করে বিদায় নিচ্ছে; সন্ধ্যা নামছে সারনাথে। আর বহু যুগের ওপার থেকে ভেসে আসছে আমার কানে, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। এই সেই সারনাথ,—যেখানে কোন এক জন্মে বুদ্ধদেব আর তাঁর ভাই দেবদত্ত আবির্ভূত হয়েছিলেন হরিণদের রাজারূপে। একদল হরিণের অধিপতি ছিলেন বুদ্ধদেব স্বয়ং; আরেক দলের—তাঁর ভাই দেবদত্ত। সারনাথ তখন কাশীর কাছে এক গহন অরণ্য ছিল। কাশীর রাজা মৃগয়ায় বেরিয়ে মারছিলেন এই হরিণের দলকে; নির্দয় হাতে সেই হৃদয়হীন নির্মম হত্যা করছিলেন বনের সব চেয়ে নিরীহ, সব চেয়ে নিরুপম মৃগদের! কিন্তু যে মৃগদের প্রাণ হরণে নিরত ছিলেন কাশীরাজ,—সে হরিণ সবই দেবদত্তের। তাই দেখে বোধিসত্ত্ব, যিনিই পরে বুদ্ধ, তিনি অনুরোধ করলেন রাজাকে যে শুধু দেবদত্তের মৃগদল হত্যা না করে তিনি বোধিসত্ত্বের মৃগ-প্রজাদেরও মারুন। তাতে, দুই দল হরিণই নিশ্চিহ্ন হবার আগে আরেকটু সময় পাবে।

রাজা সম্মত হলেন এ প্রস্তাবে। ঠিক হল, একদিন বোধিসত্ত্বের আর আরেকদিন দেবদত্তের দল থেকে যাবে একটি হরিণ, পালা করে প্রত্যহ। সেই হরিণ স্বেচ্ছায় গিয়ে মাথা দেবে হত্যার হাড়িকাঠে,

দিনের পর দিন, একবার দেবদত্তের আরেকবার বোধিসত্ত্বের বাহিনী থেকে। এমনি করে চলতে চলতে একদিন এক মৃগীর পালা এল প্রাণ দেবার। কিন্তু তার পেটে রয়েছে এখন এক বাচ্চা। সে তার দলের রাজা দেবদত্তকে বললে এই অনাগত শাবকের জন্মরক্ষার কারণে, তার পরিবর্তে আর কাউকে পাঠাতে সেদিন, কাশীর রাজার লোভানলে। দেবদত্ত সেকথা কানেই তুলল না। ক্রুদ্ধ হয়ে তাড়না করলে সন্তান অভূমিষ্ঠ যার সেই মৃগজননীকে।

হতাশ হয়ে সন্তানের জন্যে প্রাণ-ভিক্ষা করতে গেল সে অন্য দলের রাজা, বোধিসত্ত্বের দরজায়। বোধিসত্ত্ব তাকে ফেরালেন কিন্তু দেবদত্তের মতো হতাশ করে তাকে ফেরালেন না। তাকে ফেরালেন মৃত্যুর মুখ থেকে। নিজে গেলেন ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে। রাজদ্বারে গিয়ে দাঁড়াতে সাধারণ এবং অসাধারণ লোকের ভীড় জমল। স্বয়ং 'মৃগ'-রাজ এসেছেন কেন আজ? কাশীরাজ বিশ্বাস করতে চাইলেন না প্রথমে 'মৃগ'-রাজের আগমনবার্তা। কিন্তু লোকের মুখ থেকে মুখে সেকথা যখন সত্য হয়ে গিয়ে পৌঁছল নৃপকর্ণে তখন রাজা আর থাকতে পারলেন না। বেরিয়ে এলেন প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে যেখানে উন্মুক্ত নীলাকাশের নীচে মৃত্যুর মুহূর্তেও মৃত্যুঞ্জয় ধ্রুব এক বিশ্বাস মূর্ত দাঁড়িয়ে মৃগমূর্তিতে। পাখীরা কূজন-বিস্মৃত; জনতা রুদ্ধশ্বাস; সূর্যদেব গতিরুদ্ধ; বাতাস ভীষণ ভারী। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বয়ং নির্মম কাশীনাথ এবং নির্ভীক সারঙ্গনাথ।

হরিণরাজের এই অপ্রত্যাশিত আগমনে বিস্মিত কাশীরাজ কারণ কি জানতে চাইলে, হরিণরূপী বোধিসত্ত্ব বলেন: 'আজ যার প্রাণ দেবার পালা সে মৃগ নয়; মৃগী। শুধু মৃগী নয়; সন্তানসম্ভবা এক হরিণ-জননী। তাই তাকে হাড়িকাঠে পাঠানো গুরুতম অপরাধ মার্জনার অতীত; তার বদলে তাই আপনার প্রাপ্য চুকোতে এসেছি আমি। আপনি আমার প্রাণ নিয়ে আপনার রন্ধনশালার রসদ জোগান আজকের মতো।' সেই উত্তরে নিরুত্তর রইলেন রাজা

অনেকক্ষণ। মুখ তুললেন যখন, তখন তাঁর বুক ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে; তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কেবল বললেন: 'মানুষের বেশে আমিই আসলে পশু; আর আপনি পশুরূপে অপরূপ এক মানব-সত্ত্বা!' এই কথা বলে রাজা আদেশ দিলেন, হরিণ-হত্যা নিষেধ করে; এবং যেখানে নিরীহ প্রাণ মৃগদের বিচরণক্ষেত্র, সেই অরণ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন মৃগয়া। হরিণরাজ অর্থে সেই সারঙ্গনাথ থেকেই এসেছে আজকের বিশ্বখ্যাত এই 'সারনাথ'-নাম।

সেই সারনাথে দাঁড়িয়ে আমি কল্পনা করতে চেষ্টা করছিলাম কাশীর ইতিহাস। কল্পনাতীত এই কাশীর ইতিবৃত্ত কে দেবে? যার আদি নেই এবং সেই কারণে নেই ইতিও, তার ইতিহাস লিখবে কে?

কাশী অনেক লোকের ইতিহাস; আবার মূলতঃ দুটি লোকের ইতিহাস। তার একজন বুদ্ধদেব; অপর জন শঙ্করাচার্য। কিন্তু সে দুজনের আগেও যেমন, পরেও তেমনই অশেষ হয়ে আছে কাশীর কথা। নিছক ষ্টোরী বলে যাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে হিস্‌টরী চিরকাল, কাশীর জন্মবৃত্তান্তে তার ভাগও নেহাৎ কম নয়। কিম্বদন্তীর এই কাশীতেই কবি বলেছেন, গিয়েছিলেন একদিন ভারত ধুরন্ধর ভীষ্ম। বিশ্বামিত্র এখানেই তাঁর ত্রিবিদ্যাকে অপরূপ রূপ দেবার, অসম্ভবকে সম্ভব করবার 'ত্রিবিদ্যা'কে করেছিলেন লাভ। বুদ্ধদেব এখান থেকেই আরম্ভ করেছিলেন তাঁর দিগ্বিজয়। রামভক্ত তুলসীদাস, আর জোলার ছেলে কবীর দুজনেই কাশীর গঙ্গার তীরে বসে জীবনের করে গেছেন জয়গান। কাশী কেবল মাটি দিয়ে তৈরী নয়; মন্ত্র দিয়ে রচিত এর দেহ।

ইতিবৃত্তকার-এর মুখর ভাষণ ক্ষান্ত হ'লে তবেই প্রবেশ করা যাবে কাশীর অন্তর্লোকে। সমস্ত মানুষ, যে এক পৃথিবী, এক পরিবারভুক্ত হবার কথা আজ চিন্তা করছে তার প্রথম স্বপ্ন আর সাধনা দিয়ে তৈরী সকল মানবের আত্মার গেহ, এই পূত, পবিত্র, পরমাশ্চর্য কাশীর দেহ!

সমস্ত মানুষই একদিন মুক্ত হবে ; নশ্বর হবে ঈশ্বর ; ব্যাসের এই সংকল্পের অস্থি দিয়ে নির্মিত কাশীকাণ্ড। রত্নাকর একদিন বাল্মীকি হবেই,—হিন্দু ভারতের এই হচ্ছে এক বিশ্বাস ; আর তার আরেক বিশ্বাস হচ্ছে, শুচি ও অশুচির কোনও ভেদ থাকা পর্যন্ত, ভাল ও মন্দের কোনও বিচার থাকা পর্যন্ত আসবে না সে মুক্তি ! কাশীই হচ্ছে বাঙালী কবির দৃষ্টিতে, কেবল আকুতির নয়, বিপুল সেই মুকতির পীঠস্থান। কাশীনাথ না কি ঘোষণা করেছিলেন, কাশীতে কেউ রইবে না অভুক্ত ! কবি বলেছেন, কেবল দেহের ক্ষুধা নয়, আত্মার সুধাও জোগাবে এই কাশী। এখানেই একদিন ব্যস সংকল্পিত সেই এখনও অকল্পিত কাণ্ড ঘটবে ! আজও মানুষ যে 'ওয়ান ওয়ার্ল্ডের' স্বপ্ন দেখছে, সেই 'এক বিশ্ব,' সেই পরম এক বিস্ময় ঘটবে এই কাশীতেই একদিন ; এবং এখানেই মানবাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার নতুন আত্মীয়তা গড়ে উঠবে যে আত্মায়তা গড়ে উঠলে তবেই মানুষের চর্মগত নয় আর, এ জ্ঞান মর্মগত হয় যে গায়ের জোরে সাম্য হয় না ; সাম্যবাদ হয় মাত্র। সেই one-কে না জানলে, তাঁর কাছে নত না হলে, না হলে প্রণতঃ one world-এর প্রতিষ্ঠা হয় অসম্ভব !

পুরীতে সেই 'এক'-এর নাম জগন্নাথ। কাশীতে 'এক'-এর নাম বিশ্বনাথ।

যিনি জগন্নাথ, তিনিই বিশ্বনাথ ! যিনি কালী তিনিই দুর্গা। যিনি অনেক, তিনিই এক। হিন্দুর নিঃশ্বাসে এই হিন্দুর বিশ্বাসেও এই ! একে যাঁরা বুঝতে পারেননি সেই 'এক'-কেও তারা পারেননি বুঝতে। তাঁরাই দূরে সরে গেছেন, হিন্দুরা পুতুল পূজা করে,—এই হাস্যকর বিমূঢ়তায় ! দূরে সরে গেছে বলেই তাই ; কাছে এলে তারা দেখতে পেত, পুতুল নয় প্রতিমা ! নিজের স্ত্রী ছাড়া সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে, কখনও কখনও নিজের স্ত্রীর মধ্যেও 'মা'-কে যারা দেখতে পেয়েছে তারাই প্রতি 'মা'-র মধ্যে পেরেছে 'মা'-কে প্রতিষ্ঠা করতে ! প্রতি 'মা'-ই তাই হিন্দুর প্রতিমা !

এই কাশীতেই একদা এক অশ্ব-ব্যবসায়ী তক্ষশীলা থেকে আসছিল মেলায় যোগ দিতে। পথে একদল ডাকাত তার বিক্রীর ঘোড়া সব চুরি করে এবং অশ্ববিক্রেতাকে সাঙ্ঘাতিক জখম করে চলে যায়। বুকে হেঁটে সে কোনও রকমে শহরতলীতে একটি পরিত্যক্ত গৃহে আশ্রয়ের জন্যে প্রবেশ করে। সেখানে রাজার অনুচর এই পরদেশী পথিককে ধরে নিয়ে যায় রাজদরবারে চোর বলে। নিজেকে নির্দোষ বললেও সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কারাগারে যাবার পথে তার সাক্ষাৎ হয় কাশীর শ্রেষ্ঠ নর্তকীর সঙ্গে। সেই সহায়-সম্বলহীন তস্কর বলে ধৃত অশ্বব্যবসায়ী না জেনে এবারে একটি অনর্বচনীয়, অপরূপ বস্তু হরণ করে; কাশীর সেই 'উর্ব্বশী'র মন। এমন পুরুষ সেই প্রকৃতির চোখে পড়েনি এর আগে। বিপুল বিত্তশালিনী আর এক অঙ্গে যার অনেক রূপ সেই অপরূপ বিলোল কটাক্ষী, যার পদভরে কাশীর পৃথিবী নেশায় টলমল করে সেদিন সেই নৃত্যপটীয়সীর আজ্ঞায় তার পরিচারিকারা গেল রাজার অনুচরের কাছে পরিচয়হীন সেই অজ্ঞাতকুলশীলকে উদ্ধার করে আনতে। বিপুলতর উৎকোচের বিনিময়ে রাজার লোক রাজি হল চোরকে ছেড়ে দিতে। সর্ত হলো আরেকটি লোককে পাঠিয়ে দিতে হবে মৃত্যুকক্ষে, যার প্রাণ বলির বদলে প্রাণ ফিরে হবে দণ্ডিত প্রেমিক কাশীর নর্তকীর।

সেই উর্বশীর জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল আরেক রূপমুগ্ধ; ধনী মহাজনপুত্র সেই প্রায়-বালককে রাজি করাতে দেরী হলনা ছলনাময়ীর; খাবার পাঠাবার অছিলায় তার আত্মীয়ের কাছে; কিশোর প্রেরিত হল বধ্যভূমিতে, অশ্বারোহীর জন্যে আহার নিয়ে। পৌঁছন মাত্র উৎকোচবশ রাজপ্রহরীর অস্ত্র দ্বিখণ্ডিত করল তার দেহ এবং মুক্তি পেল অশ্ববিক্রেতা! একটি মহৎ প্রাণের মৃত্যুতে জন্ম নিল এক পক্ষে উত্তপ্ত এবং আরেক পক্ষে অনুতপ্ত প্রেম।

সদ্যমুক্ত প্রেমিককে যত জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করে কামনাবিবশ সেই কামিনী, ততই মুক্তি খোঁজে সেই অনুতাপের অনলে অঙ্গার প্রেমিক। মহাজনপুত্রের মৃত্যুর মূল্যে ফিরে পাওয়া প্রাণ পীড়া দেয়

এই 'মহা'জনকেও। গঙ্গায় নৌকাবিহারে বেরিয়ে একদা নর্তকীকে জলের মধ্যে দুহাতে গলা চেপে ধরে তার প্রেমিক। সুর এবং সুরায় মাতাল নর্তকীর প্রাণহীন দেহ নদীর ঘাটে ফেলে দিয়ে পালায় প্রণয়ী। নর্তকীর মা দাঁড়িয়েছিল অদূরেই; সে মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করে আবার। নর্তকী আবার পত্র দেয় তক্ষশীলার পলাতককে কাশীতে এবং তার জীবনে, তার যৌবনে প্রত্যাবর্তন করবার জন্যে! তৃপ্তিহীন কামনায় কালো সে চিঠির কথা! মৃত্যুহীন প্রেমে উজ্জ্বল তার অক্ষর!

এই নর্তকীর নাম শ্যামা; এই অশ্ববিক্রেতার নাম বজ্রসেন। এই শ্যামাই আবার যশোধারা; এই বজ্রসেনই সিদ্ধার্থ গৌতম হয়ে আবির্ভূত হন কপিলাবস্তুতে, শাক্যরাজের একমাত্র বংশধর। শ্যামা-জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন যশোধারা যখন তাঁকে পরিত্যাগ করে যান, জীবনের মহত্তর অর্থে সিদ্ধ হবার কামনায় ব্যাকুল, সিদ্ধার্থ গৌতম।

বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধত্বলাভের পর কাশীযাত্রা করেন। এই কাশীকে কেন্দ্র করেই আরম্ভ হয় বৌদ্ধধর্মের জয়যাত্রা!

ভগবান বুদ্ধের মহিমায়, সম্রাট অশোকের ছত্রছায়ায়, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী অহিংসায় উদ্দীপ্ত হল। আসমুদ্র হিমাচল ভারত চঞ্চল হয়ে উঠল: বুদ্ধং শরণং গচ্ছামী এই গানের জয়গানে। সে ডাকে সাড়া দিল চীন; সে ডাকে নাড়া খেল জাপান। বুদ্ধের পর এলেন আরেক প্রবুদ্ধ; তাঁর নাম শঙ্করাচার্য। বুদ্ধের মতন শঙ্করাচার্য্যের প্রথম কর্ম, প্রথম ধর্মকেন্দ্রও এই কাশী। হিন্দুরা যখন শাস্ত্রের অন্তরঙ্গতা ত্যাগ করে তার বহিরঙ্গ নিয়ে মেতে উঠল; এবং সমাজের হিত-অহিত করার সর্বময় কর্তা হয়ে বসল পুরোহিত; যখন পূজার নামে পশুবলির প্রমোদে সবাই ঢেলে দিয়েছে মন, তখন এলেন এমন একজন যিনি বললেন; অহিংসা হিংসার চেয়ে বড়। অস্পৃশ্যকে তিনি স্পর্শ করলেন; ভগবানের দূত তিনি বললেন: 'অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।'

অন্তর থেকে উত্থিত মনুষ্যত্বের বাণী মন্তরের মতো কাজ করল পুরোহিতপিষ্ট ভারতে।

বুদ্ধের সঙ্গে হিন্দু ব্রাহ্মণদের বিরোধ বেধে উঠল প্রধানতঃ দুই বিষয়ে! ব্রাহ্মণরা বলে আসছিলেন: পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে বলির প্রয়োজন এবং তাঁদের শিক্ষাই মুক্তির একমাত্র উপায়। বুদ্ধ অস্বীকার করলেন বেদের সর্বময় কর্তৃত্বকে 'বলি'র তত্ত্বকে নস্যাৎ করলেন; এবং বললেন: সর্বপাপ মুক্ত হতে হলে চাই অষ্টসিদ্ধি। সে সিদ্ধি আসে সিদ্ধার্থের মতে;··"through right views, right resolve, right speech, right actions and living, right effort, right self knowledge, and right meditation···" [Benares, The sacred city ;—E. B. Havell]

বুদ্ধ জানতেন, 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই।' তবু বাঁধা পড়েছে যে মানুষ হিংসার বাঁধনে তাকে মুক্ত করতেই তাঁর আসা মর্ত্যলোকে অমর্ত্যলোক থেকে।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে ভগবানের দূত ভগবান বুদ্ধ এসেছিলেন এই পৃথিবীতে। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন এবং রাণী মহামায়ার কোলে মহামায়ার কৃপায় জন্ম নিলেন যিনি সেই নবজাতকের নাম হল গৌতম। পৃথিবীকে যাঁরা পাপমুক্ত, পবিত্র করতে আসেন তাঁরা আসেন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে; তাঁরা জন্ম নেন কখনও গোশালায়; আবার কখনও আস্তাবলে! সকলের অগোচরে, সকলের অবহেলায়, সমস্ত জগতের উপহাস আর অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় তাঁরা নিশ্বাস নেন। লেখাপড়ার থেকে, আমোদ-প্রমোদ থেকে দূরে নির্জনে আরম্ভ হয় তাঁদের নিঃসঙ্গ সাধনা। লোকে বলে ভণ্ড। রাজার অনুচর ভয় দেখায়; স্ত্রীলোক দেখায় লোভ। সব কিছুকে তুচ্ছ করে, শশিকলার মতো বাড়তে বাড়তে, বসুন্ধরা তাদের ধরে রাখতে পারে না আর। পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয় আকাশে। আত্মার আলো ছড়াতে ছড়াতে চলেন শূন্যে,

জলে স্থলে। 'জড়ায়ে আছে বাধা!'—ছাড়ায়ে যেতে চায় যারা তবু পারে না তাড়াতে ভয় আর ভৎর্সনা, অলঙ্কার আর অহঙ্কার তাদের মধ্যে ছড়াতে থাকেন বীর্যের আর করুণার বিরামহীন ধারা! ভয়ঙ্করের সাধনায় অভয়ঙ্করের উদ্বোধন হয় এই ভাবেই!

কিন্তু বুদ্ধদেব এসেছিলেন এই পৃথিবীতে রূপোর চামচে-মুখে নিয়ে রাজার ঘরে; বৈশাখী পূর্ণিমার এক পবিত্র রাত্রে; যে রাত্রকে বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রি থেকে বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে উত্তীর্ণ করে যান তিনি: কিন্তু রাজার ঘরে জন্মালেও যা, প্রজার ঘরে জন্মালেও তাই। জগতের যিনি রাজা, তাঁর জয়টিকা যিনি ললাটে নিয়ে এসেছেন পার্থিব সুখে তাঁর অসুখ; পার্থিব অসুখে তাঁর সুখ। সেকথাই ভূত-ভবিষ্যতের যিনি অতীত আসলে, তাঁর ভবিষ্যত গণনা করে বলেন রাজগণক। সংসারে থেকেও সং ত্যাগ করে 'সার' গ্রহণ করবার সাধনাই হবে এঁর সাধনা। সকলের যাতে সাধ তাতে 'না' করাই হবে এঁর সাধনা! কারুর যা সাধ্য না, তাই হবে এঁর সাধনা। অসৎকে নাশ করার জন্যে ইনি গ্রহণ করবেন সন্ন্যাস!

বালক গৌতমের কোলে ভাই দেবদত্তের তীরবিদ্ধ হাঁস এসে পড়ে হঠাৎ। দেবদত্তর দাবীর উত্তরে গৌতম বললেন, তোমাকে এই হাঁস আমি মারতে দেব, যদি এর প্রাণ তুমি ফিরিয়ে দিতে পার তবেই! নচেৎ নয়। বালক বড় হল। বিবাহ হল তার কোলিকন্যা গোপার সঙ্গে যার আরেক নাম যশোধারা! রাজার ছেলে হয়ে জন্মে, রাজা হবার স্বপ্ন দেখেন না গৌতম। ইন্দ্রের ঈর্ষাযোগ্য রমণীলাভ করেও অন্য রাজার, অন্য রমণীয় সঙ্গের জন্যে লালায়িত গৌতম একদিন রাজরথে যেতে যেতে রাজপথে দেখেন হেঁটে যাচ্ছেন এক থুরথুরে বুড়ো। মাথার চুল কাশফুলের মত সাদা; গায়ের চামড়া কাঁথার মতো কুঁচকে গেছে। দাঁত নেই; চোখ দৃষ্টিশক্তি-হীন। সারথি ছন্দক, বিস্মিত রাজপুত্রকে বললেন: এই অবস্থা, এই দুরবস্থা থেকে কারুর মুক্তি নেই। আবার একদিন, ওই রাজরথে যেতে যেতেই, রাজপথে দেখলেন মুমূর্ষুকে। রাজরথ-চালক বললেন: এই অবস্থা

সকলেরই সামনে উপস্থিত হবে একদা! তারপরও আরেক দিন; এবারে এক মৃতদেহ। সারথি এবার জানায়: রাজা প্রজা, জ্ঞানী মূঢ়, কারুরই নিস্তার নেই, এই 'নিশ্চিতের' হাত থেকে।

কিন্তু মুক্তি যে সুনিশ্চিত আছে, এই নিশ্চিতের হাত থেকেও তাই দেখবার জন্যেই যেন সন্ন্যাসী এসে দেখা দেন রাজপুত্র গৌতমকে। 'মেঘমুক্ত আকাশের প্রসন্ন হাসি হাসছেন বন্ধুর মতো' সেই সন্ন্যাসী। তাঁকে দেখে মনে হয়, সারথি যে যে অবস্থা থেকে পরিত্রাণ নেই কারুর বলেছিল, সেই সব অবস্থার থেকেই ইনি মুক্ত, সর্ব বিপন্মুক্ত এ কে? কি করে এঁর এ অবস্থা লাভ হল জানতে গিয়ে গৌতমের এই জ্ঞান লাভ হল যে: ভোগের ফল ওই দুর্ভোগ! ত্যাগের পথেই আসে মুক্তির রথ।

সেই পথেই একদিন বেরিয়ে পড়লেন গৌতম; সার লাভের যে পথ গিয়ে শেষ হয় আরেক দিন সারনাথে!

জরা রোগ, মৃত্যু এ পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ করেছে প্রায় সবাই। সন্ন্যাসীর মূর্তিও কারুর অগোচরে নয়। তবু তারা কেউ জানতে চায়নি কেন জরা, রোগ এবং মৃত্যুর ভয়? এবং সন্ন্যাসীর হাসিতে কি করে আসে অভয়। গৌতম জানতে চাইলেন। অনেকে মনে করে, গৌতম বুঝি ওই চার দৃশ্য দেখেছিলেন বলেই রাজ্য ছেড়ে যেতে পারলেন। তারা মনে করে 'বেলা যায়' ডাক শুনেছিলেন বলেই বুঝি লালাবাবু পথে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিলেন। তুলসীদাসের স্ত্রী তুলসীদাসকে অপমান করেছিলেন বলেই, না কি তুলসীদাস আরাম ছেড়ে রামকে পেরেছিলেন চাইতে। না। গৌতমের মধ্যে, লালাবাবুর মধ্যে তুলসীদাসের মধ্যেই ছিলো এমন কিছু, সংসার ছাড়ে যারা তাদের মধ্যেই থাকা দরকার এমন কিছুর যার জবরদস্তিতে 'স' ত্যাগ করে 'সার' কামনার জীবন জিজ্ঞাসা জাগে তাদের মনে। না এ জিজ্ঞাসা তেমন ভাবে না জাগলে সংসার ছেড়ে গেলেও তারা সার পায় না; ছাইমাখা সং সাজে। আবার কেউ সংসারের মধ্যে থেকেই অসার ত্যাগ করে পেয়ে যায় ঈশ্বরসঙ্গ। শুধু তাতেও হয়

না। সময় হওয়া চাই। গৌতমের যেদিন সেই সময় এল তার আগের মুহূর্তেও তিনি তৈরী ছিলেন না এই সাক্ষাৎ এবং তার থেকে সাক্ষাৎ-মুক্তির তীব্র পিপাসা জাগবার জন্যে। লালাবাবুর জীবনে, অনন্ত সন্ধ্যা এসেছে এবং গেছে। কিন্তু যে সন্ধ্যায় সেই জীবনের প্রথম প্রভাত এল পায়ে হেঁটে, লালাবাবুর অন্তরে, সেদিন তার মন্তরের প্রয়োজন হল না।

তুলসীদাস ছিলেন স্ত্রৈণ। স্ত্রীর দাস ছিলেন তুলসীদাস। বিবাহের পর একদিনের জন্যেও স্ত্রীকে তাঁর পিতৃগৃহে পাঠাতে পারেননি তিনি, রমণীহীন জীবন মণিহীন চোখের মতো তা অর্থহীন বলে। একদিন পিতার গুরুতর অসুখের খবর পেয়ে তুলসীদাসের অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে পড়লেন বাপের বাড়ির দিকে। ঘরে ফিরে ঘরণীকে না পেয়ে, আকাশপথোত্তরণে ক্লান্তপাখা বিহঙ্গ সিন্ধুবক্ষের নিকটবর্তী কোথাও ডাঙা খুঁজে না পেলে যেমন কেঁদে মরে তেমনই অসহায় বোধ করলেন তুলসীদাস ; অন্ধকার দেখলেন জগৎ, স্ত্রীর ঘরের বন্ধ দ্বার দর্শনে। দুরন্ত জল ঝড়ের রাত সেদিন। পশুরা পর্যন্ত যে রাতে বেরুতে ভয় পায়, সে রাতে শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে বেরুলেন তুলসীদাস। দুস্তর পারাবার পার হয়ে পৌঁছলেন শ্বশুরালয়ে। দরজা বন্ধ প্রবেশদ্বারের। প্রাচীর অতিক্রম করতে গিয়ে ধরা পড়েন তুলসীদাস। ধরা পড়ে শ্বশুরবাড়ির লোকের হাতে জামাই প্রচণ্ড মার খেয়ে অচৈতন্য হয় ; তবু চৈতন্য হয় না স্ত্রীঅন্ধ গোস্বামীর।

স্ত্রী তখন স্বামীকে তীব্র ভৎর্সনা করে বলে ঃ আমার দেহের জন্যে তোমার এই ঘৃণ্য কামনা, এর একটুখানি যদি তোমার ঈশ্বরের জন্যে হত তাহলে বিশ্রী কাম দূরে যেত, দেখা দিত স্বয়ং শ্রীরাম।

তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়েন তুলসীদাস ; প্রভাতের জন্যে করেন না অপেক্ষা (প্রভাত কি সূর্যোদয়ে ?) !

আমরা কত সময় বলি, এর অর্ধেক ডাক ভগবানকে ডাকলে তিনি সাড়া দিতেন। কত সময় আমাদেরকেও লোকে বলে।

কিন্তু আমাদেরও কিছু কাজ হয় না ; যাদের বলি তাদেরও হয় না। হয় না যে তার কারণ তখনও সময় হয় না। তুলসীদাসকেও তাঁর স্ত্রী নিশ্চয়ই একথা আগেও বলেছিলেন। হয়ত অনেকবারই বলেছিলেন। কিন্তু কাজ হয়নি ; কারণ সময় হয়নি ; সময় যখন হল তখনই তুলসীদাসের কানে গেল না সেকথা শুধু, প্রাণে গিয়ে বাজল।

সময় হলে তবেই 'রত্নাকর' হয় বাল্মীকি ! 'ক্ষুদে' হয় ক্ষুদিরাম ! 'বিলে',—বিবেকানন্দ !

সময় হলো গৌতমের বুদ্ধ হবার ; প্রবুদ্ধ হবার। বেরিয়ে পড়লেন তিনি পথে। এসে পৌঁছলেন বৈশালীতে ; অরাড় মুনির আশ্রমে। মুনি উত্তর দিতে পারলেন না গৌতম-জিজ্ঞাসার : দুঃখ থেকে মুক্তি কিসে ? মুনি তাঁকে স্বর্গের পথ বলতে পারলেন ; কিন্তু মুক্তির ঠিকানা দিতে পারলেন না। গৌতম স্বর্গ অথবা নরকের রাস্তা জানতে চান না ; তিনি চান মুক্তির পথ। তাঁর জন্যে নয় ; জগতের জন্যে। সেখান থেকে গৌতম এলেন উরুবিল্বের পাঁচ ব্রাহ্মণের কাছে। অনাহার-তপস্যাই মুক্তির পথ তাঁরা বললেন। গৌতম সেপথ পরীক্ষা করে বুঝলেন এ পথ তাঁর পথ নয়।

গৌতম বুঝলেন তাঁর পথ তাঁকেই আবিষ্কার করতে হবে। নিরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষের তলায় আসন পাতলেন তিনি। আরাধনার আসন। দুঃখ থেকে মানুষের মুক্তির মৃত্যুঞ্জয় সাধনায় রত গৌতমকে দুঃখের রাজা 'মার' ভয় দেখান ; অপ্সরীরা লোভ। কিন্তু গৌতম তাদের অতিক্রম করে পেলেন সেই জ্ঞান। তিনি বুদ্ধ হলেন ; প্রবুদ্ধ।

বুদ্ধের নবধর্মের যাত্রা আরম্ভ হয় বোধিলাভের উনপঞ্চাশ দিন পরে মৃগদাব সারনাথে ; বৌদ্ধধর্মের জয়যাত্রা !

এই বৌদ্ধধর্ম যখন আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ এবং ভারতের বাইরে একের পর এক, দেশ নয়, দেশের হৃদয় জয় করার পর অবিচল প্রতিষ্ঠায় প্রদীপ্ত,—তখন এসেছিলেন এই ভারতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু, শঙ্করাচার্য।

শঙ্করস্থান কাশীতেই শঙ্করাচার্যও অবস্থান করেছিলেন। তাঁর জয়যাত্রাও আরম্ভ হয় এই কাশীতেই। কাশী যে শঙ্করের আর কাশীতে সে শঙ্কর এসেছিলেন এঁদের ছু'জন আসলে এক। প্রথম শঙ্কর আর দ্বিতীয় শঙ্কর, এঁরা ছুজনেই অদ্বিতীয় শঙ্কর যে এ না বুঝলে অদ্বৈতবাদকে বোঝা যাবে না। এবং অদ্বৈতবাদকে না বুঝলে হিন্দু কি এবং কে, কাশী সেই হিন্দুর কাছে কি এবং কে অসম্ভব হবে উপলব্ধি করা ; কারণ : 'Nevertheless it was Sankaracharya's teaching and philosophy which established Sivaism,.......' [E. B. Havell]

অদ্বৈতবাদের জন্ম শঙ্করাচার্যের জন্মের অনেক আগে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে হিন্দুধর্মের যে ভিৎ টলে উঠেছিল শঙ্করাচার্য তাকে চিরকালের মতো আবার অটল প্রতিষ্ঠা দিয়ে যান অদ্বৈতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠায়। তার প্রমাণ :

'It is not to be supposed that Sankaracharya was the first to teach the pantheistic doctrines of Hinduism. The idea of the One Supreme being manifested in the many had been clearly indicated centuries before in the Upanishads, and developed in the Vedanta school of philosophy, but Sankaracharya's preaching marks the final absorption of Buddhism into the Brahmenical system, and the development of the worship of Shiva into one of the most popular cults.' [Benares, The sacred city]।

হিন্দুরা জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছিল। একদা তারই প্রথম পরিচয়ে প্রদীপ্ত উপনিষদ ; তার দ্বিতীয়, অদ্বিতীয় প্রমাণ, বেদান্তের অদ্বৈতসিদ্ধান্তে সিদ্ধ শঙ্করাচার্য।

বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই যদি কখনও কোনও 'বিস্ময়' জন্মগ্রহণ

করে থাকেন তবে তিনি শঙ্করাচার্য। অতি অল্পায়ু এই 'বিস্ময়' ত্রিশ বৎসরের কম বেশি জগতে অবস্থান করে গেছেন। কেরলের এই বালক-বিস্ময়ের বয়স যখন যোলো, তখন গুরু-কৃপায় বেদান্তভাষ্য রচনা সমাপ্ত। হেগেল অথবা কান্ত বলতে আমরা মূর্চ্ছা যাই, তাই ; চৈতন্য যদি কখনও ফিরে আসে হিন্দুভারতের, সেদিনই সে জানবে শঙ্করাচার্য কি এবং কে ? এবং মানবে, কাশী কেন ভারতবর্ষের কোনও একটা 'স্থান' মাত্র নয়। শঙ্করাচার্য যেখানে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সেই কাশীতেই কেবল 'শঙ্করের' নিত্য অবস্থান !

মাত্র সেদিনই, ভারতের হিন্দুরা জানবে, কাশী কেবল হিন্দুর নয় ; নয় বৌদ্ধের, কাশী সেই সকলের, যাদের চর্মভেদ নয় কেবল, মর্মভেদ করেছে শঙ্করবাণী ; কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ! সেই ভাগ্যবান ছাড়া আর সকলেরই বেনারসযাত্রা সম্ভব হলেও কাশীদর্শন হবে অসম্ভব। কাশী সত্যিই বিনারস ছাড়া আর কি ? শঙ্করের রস বিনা !

॥ তের ॥

'যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয় মন ও কর্মেন্দ্রিয় চক্ষুকর্ণাদির কারণ, যাহা আকাশের ন্যায় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, যে বস্তু দিবাকরের ন্যায় নিখিল পদার্থের প্রকাশক, আমিই সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা।'

—[সাধক-জীবনী : শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী]।

রৌদ্ররুক্ষ রাজপথ দিয়ে হেঁটে চলেছেন অদ্বৈতবাদী অদ্বিতীয় শঙ্কর। মাথার ওপর মধ্যদিনের সূর্য আগুন ঢালছে আপন মনে। পায়ের তলায় পথ যেন পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে; মুণ্ডিত-মস্তকে সূর্যের অগ্নি, নগ্নপদে পথের উত্তাপ দুই অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলেছেন হন হন করে স্বয়ং শঙ্কর; তাঁর ভারত দ্বিগ্বিজয়ের পথে শেষ কণ্টক, মণ্ডন মিশ্রের গৃহ অভিমুখে। তপ্ত দিবাকর, আর উত্তপ্ত পথ এ-দুয়ের চেয়েই, উৎপাটিত না করতে পারা পর্যন্ত সেই কণ্টকের জ্বালা শঙ্করের পক্ষে অনেক বেশি দুঃখকর। মণ্ডন মিশ্রের বাসভূমি মাহিষ্মতীতে, আজ শঙ্কর সেই কারণেই উপস্থিত; শঙ্কর প্রশ্ন করলেন রাজপথে দেখা হয়ে-যাওয়া কয়েকজনকে : মণ্ডন মিশ্রের বাড়ি চিনব কি করে? জিজ্ঞাসিতদের একজন জবাব দিল : যে-বাড়ির দরজায় শুকপাখি তর্ক করছে জগৎ স্বতঃপ্রমাণ না পর্বত-প্রমাণ; জগৎ নিত্য না অনিত্য,—সেই বাড়িই জানবে, মণ্ডন মিশ্র ছাড়া আর কারুর নয়।

পিতৃশ্রাদ্ধে নিরত মণ্ডন মিশ্র দুই ব্রাহ্মণের পা ধুইয়ে দিচ্ছিলেন যখন ঠিক তখনই শঙ্কর সেখানে উপস্থিত হলেন, উপবীতহীন ও মুণ্ডিত মস্তকে শিখাবিহীন অবস্থায়। কুপিত মণ্ডন কটাক্ষ করলেন শঙ্করের গুরুভার কন্থার প্রতি। গাধা যে ভার বইতে সহজে প্রস্তুত নয় তুমি সেই বস্তুর ভার সানন্দে বহন করছ; অথচ শিখা ও

উপবীতের ভার তোমার কাছে এতই বেশি যে, তোমার পক্ষে তা দুর্ভার বলে ত্যাগ করেছ?

শঙ্কর প্রত্যুত্তর করেন তদ্দণ্ডেই :

ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানশুঃ।

শ্রুতি ব্যাখ্যা করে বললেন শঙ্কর : কাজ, পরিবার অথবা অর্থ মোক্ষের সামর্থ্য জোগায় না। মুক্তির পথই হচ্ছে ত্যাগের পথ। তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী যিনি বর্ণভেদে, বস্ত্রে, কেশে দারপরিগ্রহে বিশ্বাসী নন। শিখা ও যজ্ঞোপবীতে মুমুক্ষুর প্রয়োজন কি?

মণ্ডন মানলেন তবু মানলেন না : পত্নীপালনে অসমর্থ, এ-সত্য স্বীকারে দেখছি তুমি সমর্থ নও—

হার মানলেন না শঙ্করও : মণ্ডনকে তিরস্কার করলেন মণ্ডন স্ত্রীলোক পরিবৃত বলে। মণ্ডন পুনর্বার শঙ্করকে আক্রমণ করেন এই বলে যে, যে স্ত্রী জন্মদাত্রী, যে স্ত্রীলোক পালয়িত্রী, যে স্ত্রীলোকের দুগ্ধে সন্তানের বৃদ্ধি, সেই স্ত্রী-জাতির নিন্দা পুরুষের জিহ্বাকে পাপ দেয়! শঙ্কর প্রতি আক্রমণে কখনও অপ্রস্তুত নন : যে স্ত্রী-জাতির দুগ্ধ পান করে মণ্ডন আজ মণ্ডন হতে পেরেছেন। সেই স্ত্রী-জাতির সঙ্গে স্বয়ং মণ্ডন ইন্দ্রিয় চর্চা দ্বারা কি পরিমাণ পাশবিকতার প্রমাণ দিচ্ছেন তা মণ্ডনের না হ'লেও অন্যান্যদের চিন্তার বিষয়।

মণ্ডনকে নিরস্ত করলেন মণ্ডনের শিষ্যমণ্ডল। শঙ্কর অতিথি; অতএব কলহের পরিবর্তে তাঁর যথাযোগ্য আপ্যায়নই কর্তব্য। ক্রোধ সংবরণ করলেন মণ্ডন। শঙ্কর বললেন : আমি ভিক্ষাপ্রার্থী; কিন্তু অন্নভিক্ষার্থী নই। তর্ক ভিক্ষা করি আপনাকে। যে যাকে তর্কে হারাতে পারবে তার কাছে পরাজিতকে গ্রহণ করতে হবে শিষ্যত্ব। মণ্ডন মিশ্র সম্মত হ'লেন। মণ্ডনের স্ত্রী উভয়ভারতী হলেন বিচারক।

[সাধক-জীবনী। শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য। শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সঙ্কলিত]।

তর্কযুদ্ধের অন্তে মণ্ডনের গলায় যিনি স্ত্রী-হিসাবে একদিন মালা

দিয়েছিলেন আজ বিচারকের পদে আসীন হয়ে সেই মণ্ডনমহিলা উভয়ভারতী, শঙ্করের কণ্ঠে স্বয়ং পরিয়ে দিলেন বিজয়মাল্য। তারপর নিজের পরিচয় দিলেন ভারতীর বরকন্যা উভয়ভারতী। শাপভ্রষ্ট স্বর্গচ্যুতা তিনি; মহর্ষি দুর্বাসার ক্রোধই তাঁর মর্ত্যাগমনের কারণ ছিল। এখন শঙ্করের এই বিজয়মুহূর্তে হবে তাঁর শাপমোচন ও প্রত্যাবর্তনের কারণ!

আত্মপরিচয়-প্রদানের পর অবশ্য উভয়ভারতী তাঁর স্বামীকে শঙ্করের শিষ্য হতে দিলেন না; বাধা দিলেন এই বলে যে, উভয়-ভারতী মণ্ডনের অর্ধাঙ্গিনী, তাই তাঁকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত না করতে পারা পর্যন্ত শঙ্করের পরমবিজয় স্বীকৃত হয় না এবং মণ্ডন মিশ্রের চরম পরাজয় অস্বীকৃত হয়। শঙ্কর এবং স্বয়ং মণ্ডনমিশ্র উভয়েই বিস্মিত হয় উভয়ভারতীর প্রস্তাবে, কিন্তু বিস্ময়ের তখনও বাকী ছিল বোধ হয় কিছু।

উভয়ভারতীকে প্রশ্ন করলেন শঙ্কর, কোন শাস্ত্রের ব্যাপারে তর্ক করতে চান উভয়ভারতী। উভয়ভারতী বললেন, কামশাস্ত্র হবে তাঁদের তর্কের বিষয়।

তরুণকিশোর বিচলিত বোধ করলেন। আজন্ম ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সবচেয়ে অপ্রস্তুত বিষয়ে তর্ক করতে প্রস্তুত উভয়ভারতী। উপায়ান্তর না দেখে শঙ্কর সময় নিলেন। এমন বিষয়ে তর্ক যেখানে শুষ্কপাঠ সম্বল করে বসা যায় না দ্বন্দ্বের আসরে।

শঙ্কর বেরিয়ে পড়লেন উদ্দেশ্য-সাধনের উদ্দেশে। কিছুদূর না যেতেই সেই সুযোগ পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়ায় শঙ্করের দরজায়। এক সদ্যোমৃত নৃপতির দেহপ্রদক্ষিণরত রমণীদের কান্না দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর। প্রিয়শিষ্য সনন্দনকে অতঃপর শঙ্কর তাঁর অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করে বলেন যে, তিনি শঙ্কর ওই রাজার মৃতদেহে প্রবেশ এবং রাজাকে পুনর্জীবিত করে কামিনীকুলের কাছে কাম রমণীয়াভিজ্ঞতার পাঠ নেবেন। প্রিয়শিষ্যর সূর্যোজ্জ্বল মুখে বেদনার মেঘের নীলাঞ্জন ছায়া পড়ে। শঙ্কর বোঝেন সনন্দনের প্রাণের বার্তা। বলেন, সনন্দন তবে

শোন মহাভারতের গল্প। দ্রৌপদীর অতিথি হতে আসছেন সশিষ্য দুর্বাসা। নদীপথ পার হতে পারছেন না তাঁরা। পারাবারের কোথাও পারাপারের খেয়া নেই।

দ্রৌপদী কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন ঃ মহামান্য অতিথিকে নদী পার করে দাও, হে শ্রীকৃষ্ণ সখা, হে ভবনদীর কাণ্ডারী! স্মিতহাস্যে সম্মতি দিলেন গোপিনীপরিবৃত রাখালরাজ ঃ নদীর কানে বলো, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণ বলছেন অতিথিকে আসতে দাও; দ্বিধাবিভক্ত হও এই মুহূর্তে। তদ্দণ্ডেই নদী নত হয় পার্থসারথির কথায়; প্রণতঃ হয় নদী ভবনদীর কাণ্ডারীর পায়ে। কৃষ্ণের পায় দুভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া নদীর মধ্যবর্তী শুকনো পথ দিয়ে আসার উপায় হয় দুর্বাসার! চর্বচূষ্যলেহ্যপেয়-র পর রাগী দুর্বাসা অনুরাগী শিষ্য সমেত আবার সমস্যার সম্মুখীন হন। নদী পার করে কে এবার? দুর্বাসা এবারে নিজেই হাল ধরেন; শিষ্যদের বলেন, যাও নদীর কানে তুলে দাও আমার আদেশ ঃ বলো, অনাহারী দুর্বাসা বলছে দুভাগ হতে নদীকে। শিষ্যদের মুখে দুর্বাসা-বাণী উচ্চারিত হওয়া মাত্র নদী পথ করে দেয় আবার যেমন দিয়েছিল সে একবার ভবনদীর যিনি কাণ্ডারী তাঁর কথায়।

হাসিতে খুসিতে উচ্ছ্বসিত গোপবালারা কিন্তু তাদের প্রশ্নের জবাব পায় না। এ কেমন কথা। একজন দিবারাত্র রমণীয় সঙ্গে মজে, অবিরত রমণীমনোহরণে নিরত, সে কেমন করে নিজেকে বলে ব্রহ্মচারী? আর নদী কেমন করেই বা তার কথায় কোথায় সরে যাবে ভেবে পায় না। আবার দুর্বাসা ভোজনের মাত্রাধিক্যে যে দাঁড়াতে পারছে না, শুয়ে শুয়ে পড়ছে, সে-ই কোন্ সাহসে নিজেকে ঘোষনা করে অনাহারী বলে? শুধু তা-ই বা কেন? নদীই বা কেন তার কথায় পথ করে দিতে পথ পায় না।

অন্তর্যামী উত্তর দেন গোপজিজ্ঞাসার, সেই গোপন প্রশ্নের। বলেন ঃ আমি রমণীরঙ্গে মজলেও আমার মধ্যে একজন আছেন যাঁর চেয়ে নরম, যাঁর চেয়ে শান্ত, আবার যাঁর চেয়ে শক্ত নেই কেউ আর।

তিনি নিরাসক্ত। সেই নিরাসক্ত পুরুষ, এই দেহটার কোনও খেলায় আসক্ত হয় না ; শুধু দেখে। সে আদেশ দিলে স্বয়ং শ্রীভগবানকেও বইতে হয় ভাগ্যবানের গুরুভার। শুধু আমার অথবা দুর্বাসার মধ্যে নয় সকলের মধ্যেই তাঁর থাকা ; এবং না থাকা একই সঙ্গে। যে জানে তাঁকে সে জানে সে কে, যে জানে না কে সে, সেই বিস্মিত হয় কৃষ্ণ নিজেকে ব্রহ্মচারী বললে, অথবা আকণ্ঠ আহারের পর দুর্বাসা বললে নিজেকে অনাহারী !

সক্রেটিস সেই একই কথা আরেক ভাষায় বলেন Know thy Self ! Know অথবা No ? 'Know' মানে Self-ই তখন সব ! আর 'No' হলে এই Self তখন শব ! জানলে যিনি সব, না জানলে সে শব ছাড়া আর কি !

গল্প শেষ করে হাসেন শঙ্কর। সেই নিরাসক্ত হাসির রক্তিম ছটা ছড়িয়ে পড়ে সনন্দনের মুখের চিন্তার বাদল মেঘের ওপরে। রামধনুর বিচিত্র রং খেলা করে মুখের আকাশে। সংশয়ের মেঘ কেটে গিয়ে নির্ভয়, নীল, নিঃসীম নিরুপম বিশ্বাসের আকাশে উজ্জ্বল হয় নিঃশঙ্কতার রৌদ্ররাগ।

রাজ শরীরে প্রবেশ করবার আগে প্রিয় শিষ্যকে সতর্ক করেন শঙ্কর : 'কামকলাভিজ্ঞ হয়ে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার এই দেহ গোপনে রক্ষা কোরো। কারণ, রাজার লোকেরা এক সময়ে আমার এই পরিত্যক্ত দেহ খুঁজে বেড়াবে !'

আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার মুহূর্তে ওদিকে অলৌকিক কাণ্ড ঘটে যায়।

সদ্যোমৃত তরুণ রাজচক্ষে পলক পড়ে ; আর রাজার অনুচরবর্গের চোখে বিস্ময়ে পলক পড়ে না আর। সচন্দনপুষ্পমাল্যভূষিত নরদেহ, নরপালের মৃতদেহ যেন কার অমৃতস্পর্শে আবার জেগে ওঠে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অমাত্যদের ঘোর কাটতে সময় নেয়। তারপর এক সময়ে ক্রন্দনরোল থেমে গিয়ে আকাশে বাতাসে বেজে ওঠে বাদ্য, জেগে ওঠে আনন্দ কলরোল !

রাজা ফিরে আসেন রাজধানীতে; রাজতক্তে। অভূতপূর্ব উপায়ে বেঁচে-ওঠা রাজার মধ্যে ভূতপূর্ব রাজাকে কিন্তু খুঁজে পান না দু'জন। একজন রাণী; আরেকজন,—মন্ত্রী। যে রাজা শ্মশানে গেছিলেন, আর যে রাজা সিংহাসনে ফিরে গেছিলেন শ্মশান থেকে,—এরা দু'জন যেন এক নয়। রাজার জগৎ-ও যেন পালটে গেছে; জগতের রাজা যেন এখন হাল ধরেছেন রাজার জগতের। এবং সে পরিবর্তনের পরমাশ্চর্য প্রকাশ পত্রেপুষ্পেপল্লবে; কিশলয়ে-কিশলয়ে। রাজার জগৎ তিরোহিত হয়ে আবির্ভূত না হলে জগতের রাজা, নদীতে এল কি করে এত নতুন জল? আকাশের নীলে এমন নীলোৎপল শোভা জগতের অনিলে এমন পারিজাতবাস?

রাণী ও প্রধানমন্ত্রী অতএব নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এলেন, সুনিশ্চিত প্রত্যয়ে উপনীত হলেন, যে কোনও যোগী কোনও বিশেষ কারণে বর্তমানে অবস্থান করছেন এই রাজ শরীরে। রাজভৃত্যদের ওপর তাই আদেশ হল: 'যেখানেই কোনও সন্ন্যাসী বা যোগী অথবা যে কারুর মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াহীনাবস্থায় দেখবে সেখানেই সে দেহ পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।'

শিষ্যরা শঙ্কিত হন। শঙ্কর ফিরছেন না কেন? রাজানুচরেরা ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে পরিত্যক্ত প্রাণহীন যোগিদেহ। শিষ্যরা শঙ্করকে খুঁজতে খুঁজতে এক রাজ্যে এসে শুনলেন যে সেখানকার রাজা মরে গিয়ে আবার বেঁচেছেন। শুনে শিষ্যরা বুঝলেন, শঙ্কর ছাড়া আর কেউ নন। তাঁরা শুনলেন রাজা সঙ্গীতপ্রিয়। শিষ্যরা গানের মধ্যে দিয়ে তাঁদের বিপদের কথা রাজরূপী গুরুর কানে তুলে দিলেন। শঙ্কর বললেন: কামশাস্ত্র শেখা শেষ হয়েছে আমার; এবার যাবো। তোমরা তৈরী থেক।

রাজসৈন্য তখন দুর্ভেদ্য অরণ্যের অন্ধকারে খুঁজে পেয়েছে শঙ্করের পরিত্যক্ত প্রাণহীন দেহ; তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় নি তখনও। সৈন্যরা সেই দেহ কেড়ে নেবেই আর শঙ্কর শিষ্যরা দেহে প্রাণ থাকতে গুরুকলেবর স্পর্শ করতে দেবে না কিছুতেই। দুপক্ষই দ্বন্দ্বমুখর।

এবং সেই মুহূর্তেই মূর্ত হলেন শঙ্কর মৃতদেহে। এবং রাজার অমৃতদেহ পুনরায় প্রত্যাবর্তন করল মৃতদেহে। উভয়ভারতীর কাছে গেলেন শঙ্কর। উভয়ভারতী তর্ক নিরর্থক বুঝে উভয়কর জোড় করে পরাজয় স্বীকার করলেন। মণ্ডন স্বীকার করলেন তাঁর শিষ্যত্ব। তখন শঙ্কর আবার উভয়ভারতীকে উভয়কর যুক্তাবস্থায় নিবেদন করলেন তাঁর প্রার্থনা ; উভয়ভারতী মর্ত্যলোক থেকে অমর্ত্যলোকে ফিরে যাবার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে শঙ্কর বললেন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত শারদা মঠে অবস্থান করবার জন্যে। উভয়ভারতী বললেন ঃ তথাস্তু।

[সাধকজীবনী ঃ শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সংকলিত]

অন্যের মৃতদেহে প্রবেশ করার এই কাহিনীকে বলা হবে আজকের দিনে, হয় অলীক, নয় অলৌকিক। বলা হবে তার কারণ আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব বিংশ শতাব্দী নয়। বলা হবে তার কারণ শঙ্কর য়ুরোপীয় কোনও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিজ্ঞানে 'চিকিৎসক' অভিধায় ভূষিত নন। বলা হবে, তার কারণ শঙ্কর 'আত্মকথা' প্রচারের পরিবর্তে আত্মার বাণী প্রচারে বেরিয়েছিলেন। আজকের দিনে যখন পশুর অঙ্গ, মানুষের অবশ, অক্ষম অথবা দুষ্টক্ষতে খসে যাবার মতো অঙ্গকে পেনসন দেয় ; যখন অন্ধ দৃষ্টিলাভ করে ধারকরা রেটিনায় তখন কিন্তু তা আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ! বিজ্ঞান যে কেবল এ-যুগের পলিটিক্যাল 'Big Gun'-দের যারা হাতের পুতুল তাদেরই একচেটে। এ যুগের আগে যেন জ্ঞান অথবা বিজ্ঞান বলে কোনও 'আবিষ্কার' মানুষের জানাই ছিল না। ভারত-ধুরন্ধর ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু যে হেতু মহাভারতের সেই হেতু তা ব্যাসের কল্পনা মাত্র ; উইশফুলফিলমেণ্ট ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এ যুগে মৃত কুকুরে প্রাণ সঞ্চারের প্রচেষ্টার সাফল্য থেকে মরা মানুষকে নবজীবনদানের পরীক্ষা যেদিন জয়যুক্ত এবং মানুষ যেদিন স্বেচ্ছায় মরতে পারবে, সেদিন কিন্তু তা আধুনিক কালের বলেই, স্বচক্ষে দেখা যাবে বলেই তা আর কল্পনা নয় ; তখন তা, কোনও পাঁচসালা পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ন মাত্র।

রামায়ণে মেঘনাদ যখন মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী

বলে বিবৃত হন তখন আমরা তাকে কিংবদন্তীর মূল্যও দিই না; কারণ তা স্মরণাতীত এক কালের অবিস্মরণীয় আরেক ঘটনা। কিন্তু আজকে গাগারিণ-এর কাছে আমাদের ঋণ অশেষ। অথচ বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা আসলে মানুষের পরাজয়-বার্তা ছাড়া আর কি! পৃথিবীতে যখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এটমবম্ব ঝাড়া যাচ্ছে না, তখনই তো সুরু হয়েছে এই অদৃশ্য নভোলোক অন্বেষণ; যাতে শত্রুপক্ষ জানবার আগেই তাকে পক্ষাঘাতগ্রস্থ করা যায়। সেকথা থাক। এই যে নভোলোক অতিক্রম,—এ যদি বিশ্বাস্য হয় তো মেঘলোকের আড়াল থেকে লক্ষ্মণ-নিহত মেঘনাদের পক্ষে সে যুদ্ধ করা অবিশ্বাসযোগ্য কেন? যেহেতু তা রামায়ণে আছে, আজকের কারুর লেখা কোনও মোরাভিয়া বা নবোকভের লেখা কোনও 'রামায়ণে' তা নেই,—এই কারণে কি?

সেযুগেই বা শুধু কেন এ যুগেই তো বৈজ্ঞানিক যখন বলেন, নদীর এক জলে দুবার ডুব দেওয়াটা ইলুশান মাত্র কারণ নদীর জল চলিষ্ণু তখন তা বেদবাক্য, কিন্তু কবি যখন বলেন,—

'যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি
তখনি চমকি
উচ্ছিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে;'—

তখন যেহেতু 'কবি'-র উক্তি অতএব তা শুধুই কবিতা! অথবা রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় দৃষ্টিতে যখন ধরা পড়ে,—

'নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু।'

তখন তা কেবল রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে ভুল সুরে গাইবার মাত্র; কিন্তু ওই একই কথা যখন বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে প্রত্যেক অণুতে অনন্ত বিশ্বের, অন্তহীন বিস্ময়ের সম্ভাবনা, তখন তা ট্রু; কারণ তখন তা সায়ান্স। তখন তা 'কন্‌সায়ান্সের' মোহমুক্ত।

॥ চোদ্দ ॥

অষ্টকুলাচল-সপ্তসমুদ্রা
ব্রহ্মা-পুরন্দর-দিনকর রুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥ ১ ॥

[শঙ্করাচার্য বলছেন 'মোহমুদ্গরঃ'-তে ঃ এই জগৎ, তুমি, আমি, দীপ্ত দিনকর, প্রচণ্ড রুদ্র, বিপুল ব্রহ্মা, বিচিত্র সেই পুরন্দর, সপ্ত-সমুদ্রের শেষ বারিবিন্দুটুকু অথবা আট কুলাচল, কিছুই থাকবে না ; তবে কার জন্যে এই শোক।]

গহনকুসুমকুঞ্জ ঘেরা কুটিরে নিশীথ রাত্রে। আজ থেকে সহস্রাধিক বছর আগে, আকাশ-বাণী উচ্চারিত হয়েছিলো দক্ষিণাপথের কেরল জনপদের কাছে 'কালাতি' বলে এক ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে ঃ শোনো শিবগুরু, তুমি যা ইচ্ছা করবে তাই হবে। একটি পুত্র হবে তোমার। সর্বগুণাভরণভূষিত অতি অল্প আয়ু এক দিগ্বীজয়ী সন্তান ; অথবা জ্ঞানকর্মকীর্তিহীন বহুদীর্ঘবাস যাদের সম্ভব হবে বসুমতীতে, এমন একাধিক পুত্র হওয়াও তোমার অসম্ভব হবে না,—কি চাও তুমি ?

শিবগুরু বললেন ঃ বহুগুণসম্পন্ন এক পুত্র চাই আমার ; একমাত্র পুত্রর হওয়া চাই কীর্তি সূর্যোজ্জ্বল ; কৃতবিদ্য। শিবগুরুকে গুরু শিব বর দিলেন ঃ তথাস্তু।

শিবের বরে সরস্বতীর 'বরপুত্র' শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব আচার্যের ভূমিকায় ভুবনমনোমোহিনী ভারতবর্ষকে আর একবার শোনাবার জন্যে ঃ

'যাবজ্জননং তাবন্মরণং,
তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্।

ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ,
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥ ৬ ॥

নিরবধিকাল ধরে এই বিপুলা পৃথিবীতে 'জ্ঞান' এই একবারই অবতীর্ণ হয়েছিল শঙ্করাচার্যরূপে। মানবকণ্ঠে স্বয়ং সরস্বতীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়েছিল একবার। নগাধিরাজ হিমালয়ই যেমন একমাত্র পর্বত। আর সব পাহাড়ই নামে পর্বত ; আসলে ঢিপিব্য ; গঙ্গাই একমাত্র মুক্তিদা, আর সব নদী অথবা নদই জলপূর্ণ কলসী মাত্র ; হিন্দুধর্মই যেমন একমাত্র মানব-তরণ, আর সব ধর্মেই শুধু উপদেশ বিতরণ ; তেমনই শঙ্করাচার্যই এ পৃথিবীর আদি থেকে অনাদিকাল পর্যন্তও হয়ত একমাত্র, বিদ্যার যিনি দ্বার খুঁজে পেয়েছিলেন ঃ

'ব্যবহারিক জগৎ যাদের নিয়ে সেই জীবের জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয় দুয়ের কোনটাই সৎ নয় ; কারণ এ-কে 'বিদ্যা' বলব না ; বলব 'অবিদ্যা-'র কল্পনা মাত্র।

'বেদে'র জ্ঞানকাণ্ডের ব্যাখ্যাকার ছাড়া এ জ্ঞান ত্রিভুবনে আর কে দেবে ?

এই শঙ্করকে মণ্ডন মিশ্র প্রশ্নের ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে বলেছিলেন ঃ পরমাত্মা চিৎস্বরূপ, এ বিষয়ে বেদান্তবাক্য প্রমাণ নয় ; কারণ কার্যের অতীত চিৎবস্তুর পরমাত্মায় সংশ্লিষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। তাই চিৎস্বরূপ পরমাত্মা অসম্ভব।

শঙ্কর তার উত্তরে নিরুত্তর করেন মণ্ডন মিশ্রকে মুহূর্তে ঃ একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যং জ্ঞানমনন্তং বিজ্ঞানমানাদং ব্রহ্ম [ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ; সত্যও জ্ঞানস্বরূপ। অনন্তময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়]। সর্বখল্বিদং ব্রহ্ম [অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সবই ব্রহ্মময়]। তরতি শোকমাত্মবিৎ [নিজেকে সে জেনেছে সে উত্তীর্ণ হয়েছে সব দুঃখ]। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব মনুপশ্যতঃ [ব্রহ্মদ্রষ্টার কাছে শোক বা মোহ সম্পূর্ণ অর্থহীন]। ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি [ব্রহ্মকে জানলেই স্বয়ং ব্রহ্ম]। ন সা পুনরাবর্ততে ন স পুনরাবর্ততে [তিনি যিনিই হন তিনি আবর্তনমুক্ত]।

এই শঙ্করাচার্যও একদিন বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। এবং এই কাশীতেই একদিন গঙ্গাস্নান করে তীরে উঠে আসছেন এমন সময় এক চণ্ডাল কয়েকটা কুকুর নিয়ে পথ আগলে আছে। গঙ্গাস্নানের পবিত্রতা কুকুর স্পর্শে মালিন্যযুক্ত না হয় যাতে তাই শঙ্কর চণ্ডালকে পথ ছেড়ে দিতে বললেন। চণ্ডাল মুহূর্তে রুখে দাঁড়ায় ঃ সে কি ? বেদ বলছেন, আত্মা এক, অনাদি, অদ্বিতীয় ; তাহলে কুকুরের আত্মায় আর আপনার আত্মায় পার্থক্য-বোধ কেন। দাঁড়িয়ে গেলেন সশিষ্য শঙ্কর। নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গের মুহূর্তে চণ্ডালের মুখ মুখর হল বেদ-ব্যাখ্যায় ঃ আর যদি কুকুরের দেহকে দেখে এই সঙ্কোচ, তবে বলি দেহ তো মায়া।

চণ্ডাল নয়। স্বয়ং শঙ্কর শঙ্করের সামনে উপস্থিত। মাতৃগর্ভ থেকে জাত হয়েছিলেন শঙ্কর ; আজ দ্বিতীয়বার জন্ম হলো তাঁর চণ্ডাল-কৃপায়। মহাদ্বিজর অহৈতুকী করুণায় দ্বিজ হলেন অদ্বিতীয় শঙ্কর আজ।

এবং ওই একবার নয় ; আরেকবার। সেবারও এই কাশীতেই, মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করতে যাচ্ছেন সশিষ্য শঙ্কর। এবং সেবারেও পথ আগলে পড়ে আছে এক শব। শবধারক এক রমণী। তাকে বললেন শঙ্কর এবারেও পথ ছেড়ে দিতে। শবকে রাস্তা জুড়ে না শুইয়ে রেখে আড়াআড়ি একটু পাশ দিতে। রমণীয় উত্তরে এবারেও দাঁড়িয়ে যেতে হয়। সেই রমণী বলেন শঙ্করকে ঃ শব-কে বলো ; আমাকে বলছ কেন ? শঙ্কর রমণীর কথায় অবাক হন ঃ শব কখনও কারুর কথায় নিজেকে নড়াতে পারে ? রমণীয় প্রত্যুত্তর আসে তৎক্ষণাৎ ঃ পারা উচিত ! কি রকম ?—শঙ্কর-জিজ্ঞাসা। রমণীয় জবাব হলো তার এবারে ঃ যিনি জগৎকর্তা তিনি শক্তিবিমুক্ত ব্রহ্ম। এইতো আপনার দর্শন ; তাই না ? শঙ্কর বললেন ঃ হাঁ। 'তা'হলে শক্তিহীন শব কেন নিজেকে নড়াতে অক্ষম হবে ?'

শঙ্করের চোখে পলক পড়বার আগেই সেই নারী সশব উধাও হন। আর শঙ্কর মুহূর্তে উপলব্ধি করেন যে শক্তিযুক্ত ব্রহ্মকল্পনাই

সাধারণের সাধ্য ; নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব কয়েকজন বিশেষের জন্যেই কেবল [ভারতের সাধক : শ্রীশঙ্করনাথ রায়]।

শঙ্করাচার্যর বাঁচবার কথা মাত্র ষোল বছর। সশিষ্য মণিকর্ণিকায় একদিন শঙ্কর জপে বসেছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধ এসে প্রশ্ন করেন : ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তুমি সব চেয়ে বেগ পেয়েছ কোথায় ? শঙ্কর বললেন : আপনি কোথায় বুঝতে পারেননি শুধু সেইটুকু জেনে নিন না ; আমি কোথায় অসুবিধেয় পড়েছি তা জেনে লাভ কি ? বৃদ্ধ তখন জানতে চাইলেন : তদনন্তর প্রতিপত্তৌ, বংহতি ইত্যাদি সূত্রটির অর্থ। বৃদ্ধের সঙ্গে শঙ্করের এই সূত্রের অর্থ নিয়ে মহা অনর্থ বেধে গেল। একসময়ে ক্রোধে শঙ্কর আদেশ দিলেন বৃদ্ধকে বার করে দিতে। শিষ্য পদ্মপাদ গুরুর পাদপদ্মে প্রণতি জানিয়ে বললেন : একদিকে গুরু শিব ; অন্যদিকে এ বৃদ্ধ স্বয়ং ব্যাসদেব। কি করব !

শঙ্কর তখন ব্যাসদেবকে প্রণতি জানালেন। ব্যাস বললেন : ব্রহ্মসূত্রের এই ব্যাখ্যা ব্রহ্মাণ্ডে প্রচার কর তুমি। শঙ্কর বললেন : আমার আয়ু ষোল বৎসর মাত্র ! ব্যাসদেব বললেন : আমি বাড়িয়ে দেব তোমার বয়স আরও ষোল বৎসর—[সাধক-জীবনী : শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী]।

আমরা সময়ের অভাবে কখনও, অভাবের সময় বলে অজুহাত দেখাই কখনও, কাজ না করতে পারার কারণে। আজকের চিন্তাশীল বার্ণার্ড শ বলেন : তিনশো বৎসর পরমায়ু চাই অন্তত আংশিক জ্ঞানের জন্যেই শুধু ! শয়ের মতো শয়ে শয়ে আরও অনেক জ্ঞানী-গুণী সময়ের অভাবের কথা সব সময়ই জানিয়েছেন। কিন্তু অভাব সময়ের নয় ; অভাবের সময়টাও সব সময় কেন, প্রায় সময়েই নয় আসল কারণ পূর্ণ বিদ্যা অর্জন করতে না পারার। অভাব 'ভাব'-এর। 'শঙ্করে'র সঙ্গে শঙ্করাচার্যের ভাব না হলে, শক্তির সঙ্গে ব্রহ্মের ভাব না হলে জ্ঞানস্পৃহার সঙ্গে উদ্যমের ভাব না হলে, সাধ-এর সঙ্গে সাধ্যের অভাব ঘটে।

ষোলো বছরে ষোল কলা; বত্রিশ বছরে চৌষট্টি কলা আয়ত্ত করেছিলেন শঙ্কর। কি করে করেছিলেন? করেছিলেন সেই তাঁর কৃপায়, যাঁর কৃপায় খঞ্জ পাহাড় ডিঙোবার দুর্বার শক্তি পায় দু'পায়!

শঙ্করকে তাঁর মা সন্ন্যাস গ্রহণ করতে দিতে চাননি প্রথমে। শঙ্কর তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে তাঁকে না জানিয়ে, তাঁর সানন্দানুমতি ব্যতিরেকে সন্ন্যাস নেবেন না শঙ্কর। শঙ্করজননীর শঙ্কার এবং শঙ্কাহরণের—দুয়েরই উৎস শঙ্কর। স্নানের জন্যে এক সময়ে অনেক দূর যেতে হতো শঙ্করজননীকে। একদিন সেই পথ পরিক্রমায় রৌদ্রাক্রান্তা হন শঙ্করজননী এবং সংজ্ঞা হারান। শঙ্করের প্রার্থনায়, শঙ্করের আজ্ঞায় নদী বইতে থাকে তার পরের দিন থেকে শঙ্করজননীর গৃহের দুহাত দূর দিয়ে। ভগীরথ নামিয়েছিলেন নদীকে মহাদেবের জটা থেকে; শঙ্কর তাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন মহাদেবজননীর পায়ের তলা পর্যন্ত। এই নদীতেই একদিন কুমীর চেপে ধরে শঙ্করের দু'পা; শঙ্করের চীৎকারে এসে পড়েন শঙ্করজননী। শঙ্কর বলেন: সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি দিলে কুমীর আমাকে ছেড়ে দেবে; না দিলে কুমীর আমাকে নেবে! শঙ্করজননী অনুমতি দিলেন পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণে।

মায়ের দেহাবসানের পূর্বে মায়ের কাছে আর একবার আসবেন বলে কথা দিয়েছিলেন শঙ্করাচার্য। এবং সেকথা রেখেছিলেন। মায়ের মৃত্যুশয্যায় শঙ্করবাণী উচ্চারিত হয়: ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। মায়াময় সংসারের কোনও কিছুতে তিনি লিপ্ত নন, যিনি না স্থূল, না সূক্ষ্ম এবং কোনও দেশে-কালে যার নেই কোনও পরিমাপ।

শঙ্কর বাণী নয়; শঙ্কর-বাণী শুনতে শুনতে তাঁর মায়ের আত্মা দেহত্যাগ করে।

আচার্যের শিষ্যরাও আচার্যের যোগ্য ছিলেন। তাঁরাও শঙ্কর অধীন ছিলেন না; ছিলেন শঙ্কর-অধীন। যেমন একবার শঙ্কর তাঁর প্রিয় শিষ্য সনন্দনকে আহ্বান করেন যখন, তখন সনন্দন দেখেন সামনে বিরাট নদী। কি করে এই বিপুল পারাবার পার হবেন, এ চিন্তা তাঁর মনে এলো না একবারও। মনে এল শুধু যে, গুরুর

ডাক এলো এতদিনে জীবনে; সত্যকারের আহ্বান! সে ডাকে সাড়া দেবার মুহূর্তে, সামনে অগ্নিকুণ্ড অথবা অসীম পারাবার সেকথা মনে রাখে কে? সনন্দন ঝাঁপ দিলেন গঙ্গায়। আর প্রতি পদক্ষেপে প্রস্ফুটিত হতে থাকল একটি করে পদ্ম। পদ্মের পরে পদ্মের ওপরে পদস্থাপনা করে উত্তীর্ণ হলেন গুরু-আহ্বানের অগ্নিপরীক্ষায়। তীরে উঠতে শঙ্কর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে শিষ্যের নব নামকরণ করলেন ঃ 'পদ্মপাদ'।

শঙ্করের আরেক শিষ্যর আবিষ্কারও আশ্চর্য করে। শঙ্কর তখন 'শ্রীবল্লী' নামে এক ব্রহ্মণ-পল্লীতে। জড় পুত্রকে নিয়ে এক পিতা শঙ্করের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ঃ আমার এই ছেলে তের বছর বয়সেও কথা বলে না একটা; ব্যবহারে জড়বৎ! শঙ্কর তখন জিজ্ঞেস করলেন সেই বালককে ঃ তুমি এরকম ব্যবহার করছ কেন? বালক উত্তর দিল ঃ যা, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও কর্মেন্দ্রিয় চক্ষু-কর্ণাদির প্রবৃত্তির কারণ, যা আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত, সূর্য্যের মতো পদার্থ-প্রকাশ, আমি সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। বালকের শঙ্কার-বাণী নয়, শঙ্কর-বাণী উচ্চারিত হয় আবার ঃ জড় নন। এই বালক সংসারজ্ঞানশূন্য; আমার শিষ্য হবার যোগ্য এই বালক।

এই বালক-বিস্ময়ের নাম রাখেন শঙ্কর, 'হস্তামলক'।

হস্তামলক, পদ্মপাদ (সনন্দন), সুরেশ্বর (মণ্ডনমিশ্র) ও তোটকাচার্য এই চারজন প্রিয় শিষ্য শঙ্করের সর্বশাস্ত্র-পারদর্শী। অনেকের মতে এঁরাই ব্রহ্মার চতুর্মুখ; ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্বও কেউ কেউ বলেন এই চারজনকে। কারুর মতে আবার এঁরা চারজনই হচ্ছেন ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, এই চার পুরুষার্থ!

॥ পনেরো ॥

সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই বলে যাঁরা হা-হুতাশ করেন তাঁদের কাছে দূরের মাঠ চিরকালই সবুজ দেখায়। রাম এবং অযোধ্যা দুই-ই আমাদের কল্পনার ; কাউকেই আমরা দেখিনি। সম্ভবতঃ কেউই দেখেননি। আদর্শ-মানুষের পরিকল্পনা করতে গিয়েই রামের কল্পনা এবং রামায়ণের পরিকল্পনা। আমি জানি। আমি জানি যে, ধর্মপ্রাণ হিন্দু আমার এই মন্তব্যে বিচলিত হবেন। কিন্তু ধীরে ; রজনী ধীরে। আমি মোটেই বলতে চাইছি না যে, রাম এবং রামায়ণ আগাগোড়া বানানো বা কল্পিত চরিত্র ; আদর্শ-মানুষ চিত্রণের জন্যেই পরিকল্পিত অবাস্তব চরিত্র। না ; তা আমার বক্তব্য না। আমার বলবার এই যে, রামের মতো কেউ সেদিনও ছিলো ; এবং আজও আছে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, কুন্তী, অহল্যারা ছিলেন না কোনদিন বললে যেমন সত্যের অপলাপ হয়, তেমনই আজ আর তাঁদের মতো একজনও নেই একথা বললেও অসৎ এবং অসত্য উক্তি ছাড়া আর কিছুই করা হয় না।

এই কাশীতেই সেই রকম একজনকে আমি দেখেছি ; জেনেছি। তার নাম তারা। তারা কি, আমি বলতে পারব না। 'জানি কিন্তু বলব না',—নয় ; সত্যিই জানি না। আমি বলে নয় ; কেউই জানে না তারার পদবী কি। কারণ, এমন এক সমাজ আজ আমরা অনেক দিন ধরে অনেকতর অবিদ্যায় গড়ে তুলেছি, যে সমাজে চরম উত্থিত এবং চরম পতিতদেরই কেবল পদবীর প্রয়োজন হয় না। তারা শুধু যে পতিত তাই নয় ; তারা পতিতাও। ভারতের যাঁরা শাশ্বত কালের বরণীয়া নারী, তাঁদের প্রসঙ্গে এক বারনারীর অবতারণায় যাঁদের নাসিকা কুঞ্চিত হবে, তাঁদের জানাই—শেষ বিচারের ভার যাঁর হাতে, তিনি যেমন বরনারীতে আছেন তেমনিই আছেন

বারনারীতে। তিনি যেমন উত্থিত, প্রাপ্য বরাভিবোধতের, তিনি তেমনই অধঃপতিতের তিনি 'পতিত'পাবন!

কোনও এক সময়ে তারার পদবীও ছিলো। তারার নাম তখন তারা ছিলো না নিশ্চয়ই; তারার তখন মা-বাবা ভাই-বোন ছিলো। তারা ছিলো সকলের মধ্যে সব চেয়ে ফুটফুটে। তারা নয়, শুকতারা। বয়সের তুলনায় অনেক বাড়ন্ত সেই শরীরে বসন্ত আসবার সময় হবার অনেক, অনেক আগেই ডেকে উঠেছিল বসন্তের কোকিল। দুটি দুরন্ত চোখে দপদপ করতো দুরন্ত বুদ্ধি। মেধা নিয়ে এসেছিলো মাদাম কুরির। ব্যতিক্রম ঘটেছিলো রূপের সঙ্গে যোগে অপরূপের। সুন্দর কান্তি আর দীপ্ত মনীষায় প্রদীপ্ত তারা জ্বলে উঠেছিলো যৌবনস্বপ্নে আচ্ছন্ন আকাশে সন্ধ্যা হবার অনেক, অনেকক্ষণ আগেই। লেখাপড়ায় প্রতিভা বলে গণ্য হয়েছিলো শহরের মোটামুটি প্রখ্যাত স্কুলে অচিরকালের মধ্যেই। তার সঙ্গে গান আর নাচ। এক অঙ্গে এত রূপ নিয়ে এসেছিলো সে দরিদ্র নিম্নবিত্ত ঘরে যে, তার মায়ের প্রতিমুহূর্তে ভয় হতো এ কি থাকবার জন্যে এসেছে!

মায়ের মন মিথ্যা বলে কদাচ। থাকলো না; থাকতে দিলো না তারাকে তার বিরূপ ভাগ্য বাপ-মা ভাই-বোনের সংসারে। না। মারা গেলো না তারা কোনও অসুখে; মারা গেলেই বোধ হয় বেঁচে যেত সে। তার বদলে 'সুখের মধ্যে' বেঁচে মরে রইলো তারা। একটু একটু করে মরলো! তুষের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে যখন তারার সব আলো, তখনই তার সঙ্গে আমার দেখা কাশীর দশাশ্বমেধ-ঘাটে। এ কাহিনী তার মুখেই শোনা। একটি কথাও আমার নিজের নয়। সে যেমন বলেছিলো তার মৃত্যুর জীবন্ত ইতিহাস, আমার এ লেখা তার অবিকল নকল মাত্র। অবান্তর বলে একটি অক্ষরও বাদ দিইনি; যোগ করিনি প্রয়োজন মনে করে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন পর্যন্ত।

তারার বয়স যখন তের এবং দেখায় ষোলো কারুর চোখে, কারুর আঠারো, ঠিক তখনই তারার বাবার প্রথম স্ট্রোকে এলো পঙ্গুত্ব;

সাময়িক পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী তারার বাবা মণিবাবু তিন মাস পুরো মাইনে পেলেন ; তিন মাস অর্দ্ধেক ; তারপর বিনা মাইনের ছুটি সুরু হলো যথারীতি। কলকাতার সব চেয়ে চালু থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন তিনি। পৌনে তুশো টাকার মতো মাইনে ছিলো তাঁর। তখনকার দিনের হিসেবে খুব খারাপ টাকার অঙ্ক নয়। কিন্তু হলে কি হবে, থিয়েটারের ম্যানেজার। সঙ্গদোষে থিয়েটারের সব গুণই বর্তেছিলো মণিবাবুতে। ঢুকঢুক ; স্ত্রীলোক ; এবং রেস। থিয়েটারের ম্যানেজারের স্ত্রীলোক এমনই জোটার কথা। কিন্তু মণিবাবু সেরা মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। তাঁর তরুণতর প্রণয়ীর সঙ্গে নীলামের দর হাঁকাহাঁকিতে মেয়েটার পায়ে ঢালতে হয়েছিল সুরা ছাড়াও বেশ কিছু নগদ। প্রতি মাসে সেই টাকা জোটাবার আশায় রেসের মাঠে ঘোড়ার তামাসায় আরও ঋণ বাড়তো বই কমতো না। তবুও টাকা জুগিয়ে যেতে বিরত হতে দেখেনি কেউ ম্যানেজার মণিকে।

কোথা থেকে আসতো সেই টাকা, তার হিসেব পাওয়া গেলো মণিবাবু ষ্ট্রোকের ধাক্কায় বিছানা নিতে। মণিবাবুর এবং থিয়েটারের মালিক এলেন অসুস্থ ম্যানেজারকে দেখতে নয় ; ক্যাশের কয়েক হাজার টাকার গরমিলের কৈফিয়ৎ চাইতেও নয়। ম্যানেজারের মেয়েকে থিয়েটারের হিরোইন করে নিয়ে যেতে। তিনশো টাকা মাইনে সুরুতেই ! প্লাস, ম্যানেজারের আধা-মাইনে অসুস্থ থাকা-কালান আরও ছ'মাস ; এবং তারও পরে ক্যাশের গরমিল-মামলায় বেকসুর খালাসের লিখিত স্বীকৃতি।

মেয়ের মৃত্যু এবং নিজের বাঁচার মধ্যে টাগ-অফ-ওয়ার লাগিয়ে দিয়ে ম্যানেজারের মনে মালিক বিদায় নিলেন এক সময়ে। মালিক বড়লোক হলেও সহৃদয় ব্যক্তি। সময় দিলেন তিনদিন। যাবার সময় মনে পড়লো আপেল এনেছিলেন ম্যানেজারের জন্যে। গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ফল।

ফল ফলতে দেরী হলো না। মেয়ের মৃত্যুতে অনেকগুলো প্রাণ বাঁচবে।

তারা গেলো ষ্টেজে প্লে করতে। ম্যানেজারের জায়গায় বসলেন মালিক। তাঁর প্লে-ও সুরু হতে দেরী হলো না। ম্যানেজারের বয়স ছাপ্পান্ন। তারার বয়স ষোলও নয়। কিন্তু তাতে এসে গেলো কার? ষ্টেজের ওপর ষাট বছরের বুড়ির ষোড়শীর অভিনয় এবং ষ্টেজের পেছনে ষোড়শীর, ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে অভিনয়,—রঙ্গমঞ্চের চিরকালের মঞ্চরঙ্গ তো এই-ই।

ম্যানেজার মণি বাড়িতে চোখ বুজে রইলেন। সংসার যেমন চলছিলো তার চেয়ে অনেক স্বচ্ছল চলতে লাগলো। ছ'মাস বাদে ঘরের মধ্যে ; তারপর ঘরের বাইরেও বেরুতে সক্ষম হলেন তিনি। কিন্তু থিয়েটারে ঢুকতে পারলেন না আর। চাইলেনও না অবশ্যই। বিকল্প ব্যবস্থা করে দিলেন থিয়েটারের মালিক নিজে থেকেই। মিল ছিলো তাঁর একটা ; সেইখানে মোটামুটি মাইনেয় বসিয়ে দিলেন ম্যানেজার মণিকে! সংসারের চাকা ঘুরতে লাগলো আগেকার চেয়ে অনেক সহজে। তারার পরের দু'ভাই লায়েক হয়ে উঠলো। তাদেরও জুটে গেলো কাজ। এবং ঠিক তখনই তারার পরের বোন সন্ধ্যার বিয়ের বয়স আসবার আগেই এসে উপস্থিত হলো পাত্র স্বয়ং। বাধা হয়ে দাঁড়ালো তারার থিয়েটারের চাকরি। যার দিদি থিয়েটারে প্লে করে ও এক বাড়িতে থাকে, সে বাড়ির মেয়েকে ঘরে তুলতে পাত্র-পক্ষের ইজ্জতে লাগলো। লাগাবারই কথা! ইজ্জত যে আমাদের সমাজে কখনও কখনও কাচের চুড়ির চেয়েও ঠুন্‌কো!

একদিন রাতে। তারা তখনও থিয়েটার থেকে ফেরেনি। তারার বাবার ঘরে তারস্বরে সেই কথাই আলোচিত হচ্ছিলো। সকলেই একমত হয় শেষ পর্যন্ত। যাকে বলে য়ুন্যানিমাস ভার্ডিক্ট তা পাওয়া গেলো সহজে বটে, কিন্তু তা জানানো শক্ত মনে হলো স্বয়ং ম্যানেজার মণির পক্ষেও। সকলের মতেই ঠিক হলো মুহূর্তে যে, তারা এবাড়িতে থাকলে সন্ধ্যার বিয়ে হওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু তারাকে সেকথা স্পষ্ট করে বলতে তারার বাবারও সেদিন আটকালো। ঘরের মধ্যে যারা মাথা ঘামাচ্ছিলো কি করে পাড়া যায় কথাটা, তারা কেউ

জানতোই না যে তারা ততক্ষণে থিয়েটার থেকে ফিরে দরজার ওদিকে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে। আসর ভাঙবার আগেই অবশ্য তারা যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো সরে গেলো নিঃশব্দে। শুধু দরজার ওপার থেকে নয় ; পরের দিন আকাশের আলো, কাকপক্ষী জাগবার আগেই তারা সরে গেলো তার বাপ-মা-ভাই-বোনেদের ভিটে থেকে,—যে ভিটে টিঁকিয়ে রেখেছিলো এতকাল তারা নিজেকে বিক্রয় করে। যাবার আগে বাবার নামে রেখে গেলো ছোট্ট একটা চিঠি :

'—আমি চলে যাচ্ছি এ বাড়ি থেকে চিরকালের মতো। সন্ধ্যার বিয়ে আর আটকাবে না। সন্ধ্যার জন্যে আমার সব গয়না আর তার বিয়ের পণের টাকা রেখে গেলাম। এ টাকা আর গয়না নিতে শুধু 'না' কোরো না। সন্ধ্যার বিয়েতে যেন ত্রুটি না হয়। এ ছাড়া তার জন্যে রইলো তার দিদির অযাচিত আশীর্বাদ।' ইতি—তারা।

এর পরের ঘটনাটুকু অনুমান করি সহজেই।

চিঠি পড়ে শুকনো চোখ মুছতে মুছতে তারার বাবা তারার মা-কে গয়না আর টাকা সাবধানে রাখতে নির্দেশ দিয়ে ছেলেদের দিকে ফিরে বললেন : এ টাকা আর গয়না না নিলে তারা মা আমার মনে দুঃখ পাবে।

ছেলেরা দেখা গেলো এবারেও একমত !

এই তারার আলোয় আমি দেখেছি কাশীকে। এই তারার মধ্যেই আমার সীতা-সাবিত্রী তাঁরা সবাই মিলিয়ে আছেন।

তারার আলোয় দেখেছি কাশীকে, আর দেখেছি কাশীর দিদিমার ক্লান্ত চোখের অক্লান্ত দৃষ্টিতে।

কাশীর দিদিমা সেবারে তাঁর বড় নাতনীর বিয়েতে এসেছেন মেয়ের বাড়িতে কয়েকদিন বাদে। কাশীর দিদিমার জামাইয়ের মা দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহিলা। জামাই তাঁর ইঙ্গিতে তখনও ওঠেন-বসেন। নাতনীর ঠাকুমা এই মহিলা কাশীর দিদিমাকে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। তার প্রথম কারণ, বিবাহের পরেই জামাই ব্যবসায় বিপর্যস্ত

হন। দ্বিতীয় কারণ, কাশীর দিদিমার কাছে থাকাকালীন তাঁর দুই নাতি কলেরায় মারা যায়। সব দোষ পড়ে কাশীর দিদিমা আর তাঁর মেয়ের ওপর। এবং ওই দুর্ঘটনার পর কাশীর দিদিমার সঙ্গে এঁদের সাক্ষাৎ যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘকাল বাদে বড় নাতনীর বিবাহ উপলক্ষে কাশীর দিদিমাকে সেবারে আনানো হয়েছে কলকাতায়।

ঠাকুমা কিন্তু ভোলেননি পুরাণো দিনের ঝাল। মনের সুখে ঝাল মিটিয়েও যখন যথেষ্ট সুখ হলো না, তখন ইচ্ছে করে কাশীর দিদিমার ভাত রাঁধতে গিয়ে পুরিয়ে ফেললেন ভাত। এবং পোড়া ভাত খেতে দিলেন কাশীর দিদিমাকে। দিদিমার মেয়ে অর্থাৎ ঠাকুমার পুত্রবধূ, যে এ সংসারে এত বচ্ছরের মধ্যে মুখ ফুটে কোনও কথা বলেনি আজ সে প্রথম প্রতিবাদ জানালো। কাশীর দিদিমাকে ভাতের পাত থেকে তুলে এনে বললো : তোমার কি অপমানজ্ঞান হয় না কিছুতেই ?

ঠিক হলো পরের দিনের গাড়িতে কাশীর দিদিমা ফিরে যাবেন কাশীতে। পরের দিন ভোরবেলা ঠাকুমার গোঁঙানি শুনে উঠে দেখলো সবাই বহুদিনের পোষা কলিক ব্যথা চাড়া দিয়েছে ঠাকুমার পেটে। তিনি চেঁচাচ্ছেন আর নীরবে তাঁর পেটে হোমের পবিত্র ছাই মাখাচ্ছেন কাশীর দিদিমা। যন্ত্রণা কমতে ঠাকুমার সামনে বসে পোড়া ভাত সেই আগের দিনের খাচ্ছেন কাশীর দিদিমা।

হোমের ভস্মের গুণে অথবা কাশীর দিদিমাকে পোড়া ভাত খাওয়াতে পারার আনন্দে কে বলবে,—যন্ত্রণা-উপশমিত ঠাকুমার ততক্ষণ নাক ডাকছে।

কাশীর দিদিমাকে কেবল তাঁর মেয়ে বলে : যথেষ্টই তো হোলো ; এবার কাশী ফিরে গেলে হয় না ? ফোকলা বুড়ি একগাল হেসে জবাব দেয় : গেলে ভালো। তারপর পোড়া ভাতের শেষ দানাটা মুখে দিতে দিতে কাশীর দিদিমা এবার তাঁর নিজের কথা শেষ করেন : না গেলে আরও ভালো।

গোটা রামায়ণের চেয়ে একা রাম যেমন, নবদ্বীপের চেয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যেমন, তেমনই কাশীর চেয়েও আমার কাছে আমার কাশীর দিদিমা অনেক বড় !

শুধু লৌকিক নয়। অলৌকিক ঘটনা আজও সমানই ঘটে। কেবল তারা কাছের বলে মনে হয় অলীক ; আচার্য শঙ্কর অতীতের বলে মনে হয় অলৌকিক। কাশী নয়, কলকাতাতেই অলৌকিক ঘটনা ঘটতে দেখেছি আমরা অনেকেই। বুদ্ধির অতীত সেই ঘটনার পরে বুদ্ধিমান আমরা বলেছি হ্যালুসিনেশান। যেমন সেই চাকরে ভদ্রলোক, যিনি আজ জীবিত নেই, তবু যাঁর আত্মী-স্বজন জীবিত থাকার কারণে এখানে যাঁকে উপস্থিত করছি বানানো নামে ঃ হরি দত্ত। হরি দত্তকে আমার সামনে একজন একদিন এসে বললো—'কি তন্তর মন্তর করেন মশাই ; একটা বাচ্চা মারা যাচ্ছে। বিধবার একমাত্র সন্তান ; বাঁচাতে পারে আপনার মন্তর ?'

'পারে।' সংক্ষিপ্ত উত্তর আসে হরিমুখ থেকে।

আমাকে নিয়ে হরি দত্ত বেরোন সেই বাড়ী দেখতে, যেখানে বাচ্চা মেয়েটি শেষ প্রহর গুণছে। বাড়িটা পেরিয়ে যায় আমার গাড়ি। তারপর আবার ফেরবার মুখে বাড়িটার উল্টো মুখে গাড়ি থামাতে বলেন হরি দত্ত। গাড়ি থামলে নেমে যান। মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো কি শুঁকতে শুঁকতে উঠে আসেন তিনি। গাড়ি চলতে সুরু করলে বলেন, 'এই উল্টো দিকের ফুট পেভমেণ্টে যদি রক্তপাত হয়ে কালকের মধ্যে মারা যায় কেউ, তাহলে বেঁচে যায় মেয়েটা।' শুনে রাগ হয়ে যায় আমার ; বলি ঃ খুব সুবিধে হয় রক্তপাত না ঘটলে কিন্তু ! অবাক হন হরি দত্ত ঃ কেন ? আমার প্রত্যুত্তর তৎক্ষণাৎ। 'মেয়েটা না বাঁচার একটা অজুহাত তাহলে তৈরী থাকে ; আপনি বলতে পারেন স্বচ্ছন্দেই। কি বলেছিলাম কি না যে রক্তপাত ঘটলে তবে বাঁচবে ; রক্তপাত ঘটলোও না, মেয়েটা বাঁচলোও না—।'

হরি দত্ত অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন : না হে ; রক্তপাতও ঘটবে, মারাও যাবে কেউ, এবং মেয়েটাও বাঁচবে !

পরের দিনের ঘটনা। ঘটনা নয় ; দুর্ঘটনা—আমার মতো আপনাদেরও জানা। ভবানীপুরে বড় রাস্তার ওপর কন্‌স্‌টেবলের বন্দুক থেকে গুলী বেরিয়ে মারা যায় একজন নাপিত। এই দুর্ঘটনার নেপথ্যের ঘটনাই শুধু আপনাদের অজানা। নাপিতটা মারা যায় একজনের দাড়ি কামানোর সময়ে এবং প্রচুর রক্তপাত। আর ? আর ভালো হয়ে উঠতে থাকে মেয়েটা সেই মুহূর্ত থেকে।

কাশীর সেই গুণতে জানা উকীলবাবুর সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতাই কি কম অলৌকিক ? কিন্তু তাকে অলীক বলে উড়িয়ে দিই কি করে ? আমার চোখের সামনেই ঘটেছে যে সে ঘটনাও। কাশীতেই একজনের যথাসর্বস্ব চুরি যাওয়ায় উকিল ভদ্রলোকের কাছে গোণাতে গিয়েছিলাম, যদি জানা যায় চোর কে। চোরের নাম, ধাম, এবং লুক্কায়িত অলঙ্কার ও টাকার অকুস্থল পর্যন্ত গুণে বলে দিলেন উকীল। থানার ও-সিকে বললাম সব। তিনি আপত্তি করলেন। গণনাকে গণনার মধ্যে আনতে চাইলেন না প্রথমে। আমি তাঁকে বোঝালাম যে, গণনানুযায়ী চোরকে ধমকালেই হয়ত কাজ হয়ে যেতে পারে ; সার্চের প্রয়োজন নাও হতে পারে। রাজি হলেন ও-সি এবং আমার অনুমান মিথ্যে হলো না। চোরাই মালের পাত্তা সুড়্‌সুড় করে বেরিয়ে এলো।

কিন্তু বিপদে পড়লেন উকীল, যখন সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে এই চুরির মামলা উঠলো। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রশ্ন করলেন ও-সিকে, লোকটার সন্ধান কোন্ ক্লু-এর ওপরে নির্ভর করে পেলেন তিনি। ও-সি বললেন কৃতিত্ব তাঁর নয় ; কৃতিত্ব উকিলবাবুর গণনার। সাহেব বললেন, গণনা নয় ; এই উকীলও এই চুরির মধ্যে আছে। আদালত সুদ্ধ সবাই হাহাকার করে উঠলো। প্রবীণ উকীল চোর হলো পরের উপকার করতে গিয়ে। উকীলকে বললেন ম্যাজিষ্ট্রেট—তুমি গুণে বলতে পার ভবিষ্যৎ ? পারি,—জবাব্ দেন ব্যবহারজীবী।

'গুণে বলো আমার ইমিজিয়েট ভবিষ্যৎ।' উকীল একটু নীরব থেকে বললেন, 'তোমার স্ত্রী বিলাতে সাংঘাতিক অসুস্থ।' হো হো করে হেসে উঠলো গৌরবর্ণ আনন, "কালকের মেলে জেনেছি, সি ইস হেল এণ্ড হার্টি।" "তিনদিনের মধ্যে কেবল্ পাবে, সি ইস সিয়েরাসলি ইল"—উকীলের গণনা। 'বেশ'; তিনদিনের মধ্যে খবর না পেলে তোমাকে আবার আসতে হবে আমার কোর্টে? 'হাকিম নড়লেও হুকুম নড়বে না'-র মেজাজে ম্যাজিষ্ট্রেট কথা শেষ করেন।

তিনদিন পর উকীলকে নয়,—ম্যাজিষ্ট্রেটকেই পায়ের ধূলো দিতে হলো উকীলের বাড়ীতে।

আমরা চিঠি এবং মুখে আশীর্বাদ করি এবং চাই আজও; যদিও কেউ বিশ্বাস করি না। না আশীর্বাদে, না অভিশাপে। কিন্তু অভিশাপ যে আজও ফলে, তার প্রমাণ আমার এক প্রতিবেশী। এই ভদ্রলোকের বাবা যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তার ফলে তাঁর ঠাকুর্দা সেই যে শয্যা গ্রহণ করেন, আর ওঠেন না। তিনি তাঁর ছেলেকে এত ভালবাসতেন যে, ছেলের প্রথম হস্তাক্ষর থেকে পরবর্তী রচনা পর্যন্ত যত্ন করে রক্ষা করে এসেছেন। মৃত্যু-শয্যায় সেই বাপ অভিশাপ দেন ছেলেকে এই বলে যে, তিনি যেমন মরবার সময় ছেলের হাতে শেষ জলটুকুর আশা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, তেমনই তাঁর ছেলেও মরবার সময় তাঁর নাতির হাতে জল পাবে না। এই অভিশাপের কথা জানতেন আমার প্রতিবেশী। জানতেন বলেই দেশের বাড়িতে বাপের খবরাখবর করতেন রোজই কলকাতা থেকে।

কলকাতায় ভদ্রলোক অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করে দু'পয়সা করছিলেন। এই সময়ে একটা বড় অর্ডারের টাকা জোগাড় করতে স্ত্রীর গয়না বিক্রী করে অপেক্ষা করছিলেন বিল পাস হবার। তখনই খবর এলো বাবার অসুখের। একটা পয়সা নেই ভদ্রলোকের পকেটে। তিরিশ চল্লিশটা টাকার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছেন, এমন

সময়ে একজনের কথা শুনলেন, সে দূর থেকে বলে দিতে পারে অনেক দূরে কি ঘটছে। তাকে ডেকে আনলেন বাড়িতে। সে খানিকক্ষণ চোখ বুজে কি দেখে যেন বলতে লাগলো—আপনার বাবা যে ঘরে আছেন, সে ঘরের উত্তর দেওয়ালে ৺কালীর ছবি ; পশ্চিমে মাছের আঁশের কাজ ফ্রেমে বাঁধানো। আপনার মাকে দেখছি ; আরও কয়েকজন মহিলা এবং একজন ডাক্তারকে দেখছি। এখনই ভয়ের নেই কিছু।'

পর পর তিনদিন এরকম চললো। চতুর্থ দিনে বললেন : আজ ভয় আছে ; 'চারজন ডাক্তার ঘরে। আপনি আর দেরী করবেন না।' সেইদিনই ভদ্রলোকের বিল পাস হলো ; কিন্তু চেকে। চেকের বিনিময়ে টাকা পেলেন না কোথাও ; ত্রিশটা টাকাও নয়।

চেক ভাঙ্গিয়ে যখন দেশের বাড়িতে উপস্থিত হলেন, চেকের মূল্য নেই তখন আর। তাঁর বাবা তার কয়েক ঘণ্টা আগে ছেলের হাতে শেষ জলের ব্যর্থ প্রতীক্ষায় থেকে মুক্তি নিয়ে চলে গেছেন।

এ ঘটনা কাশীখণ্ডে নেই বলেই কি এ অলীক ? না কি এ অতীত ভারতের কোনও ঘটনার চেয়ে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কম অলৌকিক ?

কাগজে ছাপার অক্ষরে কোনও ঘটনা না উঠলে আজকের যুগে স্ত্রীলোকেও কিছু বিশ্বাস করে না। এখন যে ঘটনাটি বলতে যাচ্ছি, সেটি পুলিশের মুখ থেকে শোনা। মুসলমান সেই পুলিশ-অফিসার এখনও পুলিশেই কাজ করেন। যখনকার কথা—তখন তিনি শ্যামপুকুর থানায় ; তাঁর কাছে এক অসাধারণ রূপ ও অনন্য-ব্যক্তিত্ব এক বর্ষীয়সী মহিলা সন্ধ্যাবেলায় গরদ এবং রক্তিম সিন্দুর টিপে থানার অন্ধকার ঘর আলো করে এসে দাঁড়ান। সে রূপ দেহের আলো নয় শুধু ; আত্মার অপরূপ এক সৌরভ-সমাচ্ছন্ন সেই আবির্ভাব থানার সন্দেহের পাঁকে মুহূর্তে জন্ম দিলো নিঃশঙ্ক অরবিন্দের। তাঁর ঠাকুরের মাথার মুকুট, হাতের বালা চুরি গেছে। পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি ঘুরে এসেছেন পূজার ঘরে,—দশ

মিনিটও হয় নি অন্তর্বর্তী সময়; এর মধ্যেই ঘরের বাইরে টর্চ ছিলো, যেটা জ্বালিয়ে তিনি ঘরে ঢুকতেন সেটা, একটা গামছা এবং ঠাকুরের সব গয়না, দাম দিয়ে যার মূল্য নয়—ঠাকুরের বলেই যা অমূল্য, তা অন্তর্হিত হয়েছে। এক বিশ্বাসী নেপালী চাকর, যাকে বাল্যকাল থেকে বিশ্বস্ত বলেই পালন করে আসছেন, উধাও হয়েছে সে ও!

মুসলমান সেই পুলিশ অফিসার বললেন : মা, আপনার গয়নার কোনও বিশেষ চিহ্নের কথা আপনি বলতে পারছেন না; নেপালী চাকরের নাম বলছেন বাহাদুর। সব নেপালীরই কলকাতায় ওই এক নাম; কি করে তদন্ত সুরু করি বলুন তো?

ভুবনমনমোহিনী পবিত্র পূত দিব্যচ্ছটায় দিগন্ত উদ্ভাস সেই মা বললেন : না, বাবা, তদন্ত করতে হবে না; যাঁর অলঙ্কার, তিনিই তা উদ্ধার করবেন। তার জন্যে ভাবনা বা কোনও চেষ্টা কোরো না তুমি। শুধু দিয়ে গেলে গয়নাগুলো কেউ, আমাকে খবর দিও।'

রাত সাড়ে এগারোটার সময় থানায় খবর এলো হাওড়া থেকে চোর ধরা পড়েছে গয়না, গামছা টর্চসমেত। মুসলমান অফিসার তাকে নিয়ে এলেন থানায়। কেস লেখালেন না তিনি; কেস হলে ঠাকুরের গয়না প্রত্যর্পণে বিলম্বের হেতু হবেন তিনি।

মাকে ফিরিয়ে দিলেন সব। মা বললেন; বাহাদুরকে মেরো না বাবা; মায়ের এই কথাটা রেখো।

চোরকে হাতেনাতে ধরে না-মারার ইতিহাস রচিত হয় থানায়। মা'-র এই সত্য ঘটনার কাহিনী কোন্ 'সিনেমা'র গল্পের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর বলতে পারেন?

॥ ষোলো ॥

আকাশে সেদিন এক ফোঁটা আলো নাই; কেবল অন্তহীন অমা। বর্ষণমুখরিত শ্রাবণ রাত্রির নিশ্চিহ্ন অন্ধকারে এক চোর এসেছে সাধুর আশ্রমে। চোর এবং সাধু এক জায়গায় যে এক সেকথা বোধ হয় ওই বেচারা চোর জানতো না। চোর এবং সাধু নিশাচর দুজনেই। চোর ঘুরে বেড়ায় ধনসিদ্ধ হবার আশায়; সাধু জেগে থাকে যোগের আসনে ধ্যানসিদ্ধ হবার দুরাশায়। বেচারা চোর যখন সেই সাধুর সামান্য যা কিছু অপহরণ করে পোঁটলা বেঁধে যাত্রার উদ্যোগ করছে, ঠিক তখনই গুপ্তস্থান থেকে কি কারণে কে জানে, বোধ হয় তস্করের কুষ্ঠি সেদিন বেজুত বলেই এমন হয়ে থাকবে, সাধু এসে পড়েছেন সপোঁটলা প্রস্থানোদ্যত চোরের একেবারে সামনাসামনি। চোর ও সাধু দু'জনেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একটুখানি সম্বিৎ ফিরে পেতে না পেতেই পোঁটলা-পুঁটলি সব ফেলে দিয়ে চোর মুহূর্তে ভোঁ দৌড় দেয়। একটু পরে, খুব বেঁচে গেছে আজ মনে করে অন্ধকারে হাঁফ ছাড়বার জন্যে যেই দাঁড়িয়েছে সেই বিদ্যুতের আলোয় চোর দেখে সর্বনাশ, সাধু দৌড়ে আসছেন তার পেছন-পেছন চোরের ফেরৎ দিয়ে আসা সেই পোঁটলা বগলে করে। আবার দৌড় সুরু হয়ে যায় চোরের। গন্তব্য-অনির্দিষ্ট এই দৌড়পাল্লায় কে জেতে কে হারে শেষ পর্যন্ত বলা শক্ত হতো যদি না হঠাৎ বিদ্যুতের মতোই চোরের পক্ষে আশ্চর্য এক চিন্তা না খেলে যেত সেই তস্করের মাথায়।

হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তেই সেই চোরটার মনে হলো, সাধু যদি তাকে ধরবে বলেই তার পিছু নিয়েছেন তাহলে তাঁর বগলে চুরি করতে না পারা পোঁটলা কেন? মনে করার জন্যে মুহূর্তের শ্লথগতির ফলেই হবে, ততক্ষণে সাধু এসে পড়েছেন চোরের নাগালের মধ্যে।

আর একটু তফাৎ থেকেই ছুঁড়ে দিলেন সাধু চোরের ফেলে রেখে যাওয়া সাধুর অমূল্যবান তবু অমূল্য সম্পত্তি। এবং জোড়হাত করে অসাধুকে বলতে লাগলেন সেই সাধু : এগুলি আমার নয় ; তোমার। দয়া করে তুমি তোমার জিনিষ নিয়ে আমাকে করো পাপমুক্ত। এগুলি নেবার সময় আমি অজান্তে তোমার বাধা পাবার এবং শূন্য হাতে যাবার কারণ হয়েছিলাম,—এজন্যে আমার অপরাধের শাস্তি দাও তুমি এগুলিকে গ্রহণ করে।

শ্রাবণাকাশের চেয়েও মানুষের চোখ থেকে যে উদ্গত হতে পারে অনেক বেশি জল,—একথা সাধুর সামনে দণ্ডায়মান সেই অসাধুকে কেউ দেখতে পেলে কেবল সে-ই সৌভাগ্যবানই তা দেখতে পেত হয়তো।

সে সাধু মুহূর্তের মধ্যে এক অসাধুকে রূপান্তরিত করেন সাধুতে, তিনি গাজীপুরের সিদ্ধযোগী পওহারী বাবা। তাঁর কথা বলবার আগে সেই চোরের কথা বলে নি আরেকটু।

নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হননি তখনও। নিজের দেশটাকে নিজের চোখে চেখে চেখে বেড়াচ্ছেন তখন চিরভ্রাম্যমান সেই অদ্বিতীয় ভারতীয় সন্ন্যাসী, মেরামত করবার আগে ইঞ্জিনীয়ার যেমন করে দেখে নেয় উল্টেপাল্টে ক্ষয়ে আসা যন্ত্রদানবকে। স্বদেশের বেদনায় তাঁর বুক বিদীর্ণ হয় বারবার। বইয়ে পড়া ভারত নয় ; চোখে দেখা ভারতের দুঃখ, দৈন্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য চোখে দেখা যায় না বুঝি। দামাল ছেলে যেমন দাপাদাপি করে বেড়ায় ঘরময় ; উল্টেপাল্টে নেড়েচেড়ে তছনছ করে জানতে চায় কি, কেন, কবে, কখন, কোথায় ; তেমনই রামকৃষ্ণের দুর্নিবার শক্তি মূর্তিমান ভারত নরেন্দ্রনাথ ভারতমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করে বেড়াচ্ছেন নরেন্দ্র-থেকে অনাথের দ্বারে দ্বারে দুরন্ত বেগে অফুরন্ত আবেগে মুহুর্মুহুঃ মথিত হতে হতে।

সেই সময় হৃষীকেশে এক সাধু তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সাধুই সেই চোর, যাকে একজন্মে পওহারী বাবা চোর থেকে সাধুতে

উত্তীর্ণ করে দিয়ে যান। নরেন্দ্রনাথের কাছে সাধু তাঁর চোরজীবনের অপরূপান্তরের কাহিনী অকপটে বিবৃত করবার পর বলেন : "তিনি (পওহারী বাবা) যখন আমায় নারায়ণ জ্ঞানে অকুণ্ঠিত চিত্তে সর্বস্ব দান করিলেন, তখন আমি নিজের ভ্রম ও হীনতা বুঝিতে পারিলাম এবং তদবধি ঐহিক অর্থ ত্যাগ করিয়া পরমার্থের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলাম।

—[স্বামী বিবেকানন্দ : প্রথম খণ্ড : প্রমথনাথ বসু]।

স্বামীজী এই সাধুর কথা স্মরণ রেখেই ম্যারিকায় একবার বলেছিলেন 'পাপীর মধ্যেও সাধুর অঙ্কুর দেখা যায়। রত্নাকরের বাল্মীকি হবার ইতিহাস রামায়ণের যুগের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়নি।' বিবেকানন্দর মতো ভারতপথিক সেই ইতিহাসের দেখা রামায়ণের দেশ ভারতবর্ষে বারবার পেয়েও বিস্মিত হননি কখনও!

আমি এর আগে বলেছি যে ভারতবর্ষের যতেক ধ্যানী ঈশ্বরান্বেষক আজও পর্যন্ত এসেছেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেককেই কখনও না কখনও কাশীতে আসতেই হয়েছে। কেউ কেউ আবার শেষ পর্যন্ত এখানেই থেকে গেছেন চিরকালের মতো। মর্ত্যলীলা প্রকট এবং সংবরণও তাঁরা কাশীতেই করেছেন। এখন আমি যাঁর কথা বলতে যাচ্ছি তিনি কাশীতেই আবির্ভূত হন। বারাণসীর অন্তর্গত গুজীর কাছাকাছি এক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে এইসাধকের আবির্ভাব। দীর্ঘকাল ধরে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত গুহার মধ্যে অনাহারে অকাতর এই যোগীকে কিছু খেতে না দেখে লোকে তাঁকে পও (ন)-আহারী অর্থাৎ বায়ুভূক বলে জানতো। তার থেকেই সাধকের নাম দাঁড়িয়ে যায় পওহারী বাবা।

পওহারী বাবা কাশীতে জন্মান ; কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও সাধনার ক্ষেত্র ছিলো গাজীপুর। ১৮৯০-এর জানুয়ারী মাসে নরেন্দ্রনাথ গাজীপুরে আসেন। পওহারী বাবাকে দর্শন করবার জন্যে আশ্রমের খুব কাছে এক লেবুবাগানে তিনি আশ্রয় নিলেন। পওহারী বাবার

দেখা পাওয়া তখন ভগবানের দেখা পাওয়ার পরেই সব চেয়ে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিলো। রোজ ধর্ণা দিয়ে নরেন্দ্রনাথ পড়ে থাকতেন বাবাজীর দরজায়। একদিন এরই মধ্যে দর্শন হলো না বটে, তবে আলাপ হলো। দরজার এপারে নরেন্দ্রনাথের প্রশ্ন জাগে ; দরজার ওপার থেকে উত্তর আসে পওহারী বাবার। নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন—তিতিক্ষা জাগে কি করে? পওহারী বাবার জবাব তৎক্ষণাৎ ঃ গুরুর কাছে নৌকার মতো পড়ে থাকো। পওহারী বাবা নরেন্দ্রনাথ না জিজ্ঞেস করলেও যে কথাটা বারবার নিজে থেকে বলতেন সেটি তাঁর জীবনের পরীক্ষিত সত্য ঃ 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি'।

পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ স্বয়ং পওহারী বাবার একটি ছোট জীবনচরিত রচনা করেন। সেই পুস্তিকার উপক্রমণিকায় স্বামীজী পওহারী বাবা এবং ওইরকম যোগীদের জীবনের এবং জীবনীর কি প্রয়োজন সে কথাই বোঝাতে গিয়েই বোধ হয় বলেছেন ঃ যাঁহাদের বাক্যতুলিকা আদর্শকে অতি সুন্দর বর্ণে অঙ্কিত করিতে পারে অথবা যাহারা সূক্ষ্মতম তত্ত্বসমূহ উদ্ভাবন করিতে পারে, এরূপ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি অপেক্ষা এক ব্যক্তি, যে নিজ জীবনে উহাকে প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছে—সেই অধিক শক্তিশালী।

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত যোগী জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সকলের উদ্দেশ্য এবং সাধনাই এক। সে উদ্দেশ্য এবং সাধনার মর্মবাণী হচ্ছে ঃ দর্শন ছাড়া দর্শনের কোনও অর্থ নেই জীবনে।

পওহারী বাবার পিতৃব্য আজন্ম ব্রহ্মচারী পওহারী বাবাকে গাজীপুরের উত্তরে নিজের জায়গায় নিজের কাছে এনে রাখেন। তাঁর এই সময়ের এবং কিছু পরের সঙ্গীরা যে সাক্ষ্য দেন তাঁর কিশোরকালের তা থেকে জানা যায়, তিনি যেমন অধ্যয়ন, তেমনই রঙ্গপ্রিয় ছিলেন। কখনও কখনও তাঁর রঙ্গপ্রিয়তার মাত্রাতিরিক্ততার কারণে সঙ্গীরা সাঙ্ঘাতিক নাজেহাল হতেন। এর অল্পকালের মধ্যেই পিতৃব্যের পরলোকগমণে শোকাহত অধ্যয়ন ও রঙ্গরত যুবক যিনি শেষ জীবনে পওহারী বাবা নামে খ্যাত হন তিনি

বিবেকানন্দর ভাষায় সেই সময় এই ভাবে উপস্থিত হয়েছেন : 'তখন সেই উদ্দাম যুবক, হৃদয়ের অন্তস্তল শোকাহত হওয়ায়, ঐ শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য এমন বস্তুর অন্বেষণে দৃঢ়সংকল্প হইলেন, যাহার কখন পরিণাম নাই।'

ভারতীয় দর্শন পাঠের পর অতঃপর এই সময়েই পওহারী বাবা ভারত দর্শন করতে বেরুলেন।

ভারত পরিক্রমার পথে গিরনার পর্বতের শীর্ষে তাঁর অন্বেষণের প্রথম পর্ব শেষ হয় বলে তাঁর বাল্যবন্ধুদের ধারণা। গিরনারে তাঁর বন্ধুদের মতে যোগসাধনার রহস্যে দীক্ষিত এই যুবক এর পর বারাণসীর গঙ্গাতীরে এক যোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর ভ্রমণপর্বের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত আজ আর কোথাও পাবার উপায় নেই ; তবে বিবেকানন্দের অনুমান : 'তাঁহার সম্প্রদায়ের অধিকাংশ গ্রন্থ যে ভাষায় লিখিত সেই দ্রাবিড় ভাষাসমূহে তাঁহার জ্ঞান দেখিয়া এবং শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের প্রাচীন বাঙলা ভাষার সম্পূর্ণ পরিচয় দেখিয়া আমরা অনুমান করি, দাক্ষিণাত্যে ও বাঙ্গালাদেশে তাঁহার স্থিতি বড় অল্পদিন হয় নাই।' এই সময়েই তিনি আবার বারাণসীতে আরেক সন্ন্যাসীর কাছে অদ্বৈতবাদের পাঠ নিচ্ছিলেন বলেও জানা যায়।

ভ্রমণ, অধ্যয়ন, সাধনার পর ব্রহ্মচারী সেই অন্বেষক ফিরে এলেন তাঁর প্রতিপালক পিতৃব্য-ভূমিতে। তাঁর বাল্যবন্ধুর দল ফিরে আসা বন্ধুর মধ্যে আর সেই পুরানো দিনের ভাব ফিরে পেলেন না। সেই মুখে তখন যে সংকেত, সে ভাষা যিনি পড়তে পারতেন সেই পিতৃব্য তখন ইহলোকে নেই। বিবেকানন্দ বলেছেন, পওহারী বাবার প্রতিপালক বেঁচে থাকলে সন্তানতুল্য ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখে তিনি নিশ্চয়ই সেই আলো দেখতে পেতেন যার জ্যোতিচ্ছটা দেখে স্মরণের অতীত এক কালে ঋষি তাঁর শিষ্যের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন : 'ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্যভাসি।' [ব্রহ্মজ্যোতিতে তোমার মুখ আজ জ্যোতির্দীপ্ত দেখছি, সৌম্য !]

পিতৃব্য-ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের পর সাধনোন্মত্ত ব্রহ্মচারী বারাণসীবাসী তাঁর যোগগুরুর মতো মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে গুহাবাসী হলেন। নির্মম নিভৃত তপস্যার জন্যে তৈরী হলেন তিনি। প্রথমে কয়েক ঘণ্টা বাস করতে এবং উপবাস করতে আরম্ভ করলেন সেখানে। কয়েক ঘণ্টা সেখানে কাটানোর পর উঠে আসতেন ভূমির উপরে আশ্রমে। রামচন্দ্রের পূজারী রন্ধনবিদ্যায় অসাধারণ পটু এই জীবনযোগী ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে বন্ধু এবং দরিদ্রনারায়ণকে বিলিয়ে দিতেন ভোগরাগ। আশ্রমে আর যারা ছিলো তারা নিদ্রিত হলে চলে যেতেন সাঁতরে গঙ্গার ওপারে। সেখানে অরণ্যসাধনা শেষ করে যখন ফিরে আসতেন ফের আশ্রমে, তখনও আশ্রমবাসী বন্ধুদের নিদ্রাভঙ্গ হয়নি।

খাওয়া এবং গঙ্গার ওপারে যাওয়া যত কমতে থাকে, ততই বাড়তে থাকে মাটির নীচে থাকার সময়। এক মুঠো তেতো নিম পাতা বা কয়েকটা লঙ্কা হলো সারাদিনের আহার। তারপর সুপবন বইলো অনুকূল পরিবেশে। গুহার মধ্যে কেটে যেতে লাগলো দুশ্চর তপস্যায় রত বিনিদ্র রাত। এই সময়ই তিনি কি খেয়ে থাকেন এই জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রশ্নকর্তারা নিজেরাই নির্ধারণ করলেন : পও [ন] অর্থাৎ শুধু বায়ু বলে। তাই থেকেই তাঁর নতুন নাম হলো পওহারী বাবা। জীবনে কখনও যোগ এবং এই গুহা-সংযোগ ত্যাগ করেননি তিনি। এবং অন্তত একবার, বিবেকানন্দর কথায় : 'তিনি এত অধিকদিন ধরিয়া ঐ গুহার মধ্যে ছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে মৃত বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কিন্তু অনেকদিন পরে আবার বাবা বাহির হইয়া বহু সংখ্যক সাধুকে ভাণ্ডারা দিলেন।'

বিবেকানন্দ যখন নরেন্দ্রনাথ তখন পওহারী বাবাকে তিনি প্রশ্ন করেন যে বাবা কেন গুহার বাহিরে এসে জগতের উপকারের জন্য কিছু কাজ করেন না? জীবনরসরসিক নিত্যযোগী হাসতে হাসতে এক গল্প বলেন। গল্পটি এক নাককাটা সাধুর। কোনও এক সময়ে কোনও এক অপকর্মের কারণে এক দুষ্ট প্রকৃতির লোকের নাক কেটে

দেয় অন্য লোকে। কাটা নাক নিয়ে সমাজে বেরুতে লজ্জা হওয়ায় সে বনে গেলো। সেখানে বাঘের ছাল পেতে, গায়ে ছাই মেখে বসলো। কারুর পায়ের সাড়া পেলেই চোখ বুজে ধ্যানের ভারণত নাককাটাকে মস্ত সাধু মনে করে প্রথমে ছ'একটি, পরে দলে দলে সেই অরণ্যসন্নিকট গ্রামের লোকেরা আসতে আরম্ভ করলো। এবং অনেকেই সাধুদর্শনে শূন্য হস্তে যেতে নেই বলে বেশ কিছু দক্ষিণহস্তের উপযুক্ত উপকরণ উপঢৌকন হিসেবে দিয়ে যেতে থাকলো। জীবিকানির্বাহের ভয় রইলো না আর নাককাটার।

'তাবচ্চ শোভতে মূর্খ যাবৎ ন ভাষতে,'—এই অনুজ্ঞানুযায়ী নাককাটা মৌনী থাকার ফলে সিংহচর্মাবৃত গর্দভের ধরা পড়বার সময় সুদূরপরাহত ছিলো। কিন্তু কালে দুঃসময় ঘনিয়ে এলো নাককাটা নির্বাক সেই অসাধুর। নিত্য আগন্তুক ভক্তদের মধ্যে একজন দীক্ষার জন্য এমন পীড়াপীড়ি করতে লাগলো যে তখন আর কিছু একটা না বললে অথবা না করলে এতদিন নীরব প্রতিষ্ঠা সব যায়। নিরুপায় হয়ে নাছোড়বান্দা সেই দীক্ষাকাতর ভক্তকে নাককাটা একদিন দীক্ষা দিতে রাজি হলো। অথবা বলা উচিত হবে যে রাজি হতে বাধ্য হলো। শুধু বললো : আগামীকল্য একখানি ধারালো ক্ষুর নিয়ে এসো দীক্ষার সময়ে। দীক্ষোন্মত্ত যুবক পরের দিন প্রাক্-প্রত্যূষেই তীক্ষ্ণধার ক্ষুর হাতে এসে দাঁড়াল। নাককাটা [অ]-সাধু তাকে অরণ্যের আরও অন্তঃস্থলে নিয়ে গেলো এবং সেই ক্ষুর নিজের হাতে নিয়ে তার তীক্ষ্ণধার পরীক্ষা করবার পর এক কোপে যুবক দীক্ষেচ্ছুর নাক কেটে দিলো যুবক জানবার আগেই। তারপরে ইষ্টমন্ত্র দিলো এই বলে যে : হে যুবক, আমি এইভাবেই এই আশ্রমে দীক্ষিত হয়েছি। সেই দীক্ষাই আমি তোমাকে দিলাম। এখন তুমিও সুবিধে পেলেই অনলস হয়ে এই নাককাটা-দীক্ষাই দিতে থাকবে; কারণ তোমার না দিয়ে উপায় থাকবে না আর।

গল্প শেষ করে পওহারী বাবা বলেন নরেন্দ্রনাথকে : এইভাবে

এক নাককাটা সাধু সম্প্রদায় দেশকে ছেয়ে ফেললো। তুমি কি আমাকেও এরূপ আরেকটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা দেখতে চাও ?

একই সঙ্গে জীবনরসিক এবং জীবনধ্যানী পওহারী বাবার মুখে রঙ্গের রামধনু মিলিয়ে যেতে না যেতে দেখা দিলো চিন্তার তরঙ্গ। এবারে তিনি বললেন : তুমি কি মনে কর, স্থূলদেহ দ্বারাই কেবল অপরের উপকার সম্ভব ? একটি মন শরীরের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া অপর মনসমূহকে সাহায্য করিতে পারে, ইহা কি সম্ভব বিবেচনা কর না ?

পওহারী বাবাকে আরেকবার জিজ্ঞেস করা হয় যে তিনি এত বড় যোগী হয়েও প্রথম শিক্ষার্থীর করণীয় মূর্তিপূজা হোম ইত্যাদি এখনও কেন করেন। এর জবাবে জীবনযোগী বলেন : সকলেই নিজের কল্যাণের জন্যে কর্ম করে, একথা তুমি ধরে নিচ্ছ কেন ? একজনের কি অপরের জন্যেও এসব করতে বারণ ?

বিবেকানন্দ অতঃপর তাঁর পওহারী বাবা-চরিতে পওহারী-চরিত্রের আরেকটি দিক্ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পূজা যে মন নিয়ে করতেন ঠিক সেই মন নিয়েই, সেই শ্রদ্ধা নিয়েই পুজার তাম্রকুণ্ডও মাজতেন। তার কারণ তাঁর জীবন ও বাণী এক ও অভিন্ন : যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি। অর্থাৎ সিদ্ধির উপায়কেও এমন ভাবে আদর-যত্ন করিতে হইবে, যেন উহাই সিদ্ধিস্বরূপ। [পওহারী বাবা : তৃতীয় অধ্যায়]

গোখরো সাপের কামড়ে মৃতবৎ পওহারী বাবা বেঁচে উঠে বলেন একবার : পাহন দেবতা আয়া। শুধু সাপের নয়, রোগের আক্রমণকেও তিনি তাঁর প্রিয় পাহন দেবতার দূত জ্ঞান করে গেছেন বারবার। একথা ঠিক নয় যে পওহারী বাবার সাপের কামড়ে বা রোগের জ্বালায় দেহে কোনও যন্ত্রণা হতো না। না। বরং এর উল্টোটাই সত্য। অর্থাৎ তাঁরও নিদারুণ যন্ত্রণা হতো ; তবুও। তাঁর ধ্যানের দেবতার দেওয়া এই দুঃখের আশীর্বাদকে কেউ অসুখ বলবে এ তাঁর অসহ্য ছিলো। তাই দুঃখের বরষায় চক্ষের জলকে

কবি যেমন বন্ধুর রথ জীবনের দরজায় থামা বলে মনে করেছেন, এই মহাত্মাও বিষধরের কামড়কে মনে করেছেন ধনুর্ধর জীবনদেবতার মঙ্গল দূত।

দীর্ঘ, মাংসল এক চক্ষু মানুষ পওহারী বাবার অসাধারণ বিনয়ের উৎস যে ভাব, পওহারী বাবা তার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দর রাজসিক ভাষায় তা ঃ 'হে রাজন্, সেই প্রভু, ভগবান অকিঞ্চনের ধন—হাঁ, তিনি তাহাদেরই যাহারা কোন বস্তুকে, এমন কি, নিজের আত্মাকে পর্য্যন্ত 'আমার' বলিয়া অধিকার করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছে।'

শেষ দশ বছর পওহারী বাবা লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে চলে যান। তাঁর গুহার উপরে স্থিত আশ্রম থেকে হোমের পবিত্র পাবকের ভাষা ধোঁয়ার আগুন উঠলেই বোঝা যেত তিনি সমাধি থেকে উঠে এসেছেন। একদিন সেই ধোঁয়ার সঙ্গে ভেসে এলো পোড়া মাংসের গন্ধ। দরজা ভেঙ্গে কৌতূহলীরা দেখলো সব শেষ, পওহারী বাবার শব পর্যন্ত তাঁরই জ্বালা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

বিবেকানন্দর অনুমান তাঁর প্রিয় এই আচার্যের আগুনে পুড়ে শেষ হবার সম্পর্কে তাঁর ভাষাতেই এখানে উদ্ধার করে দিই ঃ 'আমাদের বোধ হয়, মহাত্মা বুঝিয়াছিলেন তাঁহার শেষ সময় আসিয়াছে। তখন তিনি, এমন কি মৃত্যুর পরেও যাহাতে কাহাকেও কষ্ট দিতে না হয়, তজ্জন্য সম্পূর্ণ সুস্থ মনে আর্য্যোচিত এই শেষ আহুতি দিয়াছিলেন।'

আত্মার বাণী এক মহৎ জীবনের আহুতিতে তার আলোর ভাষা পেয়েছে আর একবার,—আমরা এই মাত্র বলতে পারি।

পওহারী বাবার কাছে নরেন্দ্রনাথ দীক্ষাপ্রার্থী হয়েছিলেন একবার, পওহারী বাবার জীবনে এটি যেমন, রামকৃষ্ণের কাছে দীক্ষা পাবার পরেও পওহারী বাবার কাছে ভিক্ষা পাবার প্রচেষ্টাও তেমনই নরেন্দ্রনাথের জীবনেও অদ্বিতীয় ঘটনা। যোগমার্গে বিচরণশীল বিচারশীল সাধু পওহারী বাবার কাছে নরেন্দ্রনাথের দীক্ষা প্রার্থনার

কারণ পওহারী বাবার মতো ওই পথের পথিক হবার ও দীর্ঘকাল এক জায়গায় বসে সমাধিস্থ থাকবার রহস্যাবগতির দুর্বার বাসনা ছাড়া আর কিছু নয়। স্বামীজীর জীবনচরিতকারেরা আরও জানাচ্ছেন যে স্বামীজি রাজযোগ-প্রার্থী মাত্র হয়েছিলেন পওহারী বাবার কাছে। একটি চিঠিতে অখণ্ডানন্দের কাছে তিনি লিখছেন : Our Bengal is the land of Bhakti and Jnana, Yoga is scarcely mentioned there. What little there is but the queer breathing exercises of the Hatha Yoga—which is nothing but gymnastics. Therefore I am staying with this Raja-Yogin—and he has given me some hope. [Life of Swami Vivekananda : by His Eastern and Western Disciples : Vol 1] পওহারী বাবার কাছে যোগপ্রার্থনা রামকৃষ্ণের প্রতি অভক্তির সূচনা মনে করতে পারতেন যে হতভাগ্যেরা, তাদের উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ ওই চিঠিতেই লিখেছেন : My motto is to learn to recognise good, no matter where I may come accross it. This leads my friends to think that I may lose my devotion to the Guru. These are ideas of lunatics and bigots. For all Gurus are one, fragments and radiations of God, the Universal Guru.

কিন্তু পওহারীবাবার কাছে শেষ পর্যন্ত কিছু পাওয়ার নেই যে বিবেকানন্দর, তা বোঝাতে নরেন্দ্রনাথের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের শ্রীরামকৃষ্ণ। দীক্ষার দিন নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তখন ; চিঠিতে তিরস্কার করা সত্ত্বেও প্রেমানন্দ নরেন্দ্রনাথকে প্রতিনিবৃত্ত করতে এসে ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন তখন ; নরেন দৃঢ়সঙ্কল্প,— পওহারী বাবার কাছে দীক্ষা নেবেই সে। লেবুবাগানের নির্জন অন্ধকারে বিনিদ্র নরেনন্দ্রনাথ প্রতীক্ষা করছেন দীক্ষাদিবসের। আর তখনই বিজন ঘরের নিশীথ রাতের দরজায় নিঃশব্দ চরণে এসে

দাঁড়িয়েছেন তিনি, যিনি নরলোকে একদিন নরেনকে টেনে নিয়েছিলেন অন্ধকার থেকে আলোকে ; মরলোকের কানে উচ্চারণ করেছিলেন অমরলোকের ভাষা,—সেই রামকৃষ্ণ। তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে শিষ্যের দিকে, সন্তানের দিকে সেই চোখে যে চোখ-এর জন্যে অন্ধ পৃথিবীর আকুল প্রার্থনা উচ্চারিত কবিকণ্ঠে : জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এস।

অর্জুন যখন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরপ্রান্তে ক্ষণকালের চিত্তবৈকল্যে ফেলে দিয়েছিলো গাণ্ডীব, তখন তাঁকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। নরেন্দ্র যখন নরের মতো ব্যবহার করতে উদ্যত হলো, তখন দেখা দিলেন অপরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ। রাম এবং কৃষ্ণ বার বার এসেছেন নরের জন্যে মরলোকে অমরলোক থেকে। জন্মমুহূর্তেই মায়ের কাছে বলিপ্রদত্ত নরেন্দ্রনাথের জন্যে এসেছেন শুধু রামকৃষ্ণ। চিরশিষ্যের সঙ্গে চিরন্তন গুরুর চারি চক্ষের শুভদৃষ্টিমাত্র অশুভযোগ কেটে যায় নরেন্দ্রর। তাঁর মুখ থেকে হৃদয় বিদীর্ণ করে বিস্ফোরিত হয় জয়ধ্বনি : জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ !

পৃথিবীতে মধুগন্ধবহ যত পুষ্প তাদের প্রত্যেকের বাতাসে হেলেদুলে অধিকার আছে এ-মুখো সে-মুখো হবার। নেই শুধু সূর্যমুখীর ; কি সূর্যোদয়ে, কি সূর্যাস্তে;—কারণ সূর্যমুখী কেবল সে-ই যে সদাই সূর্যোন্মুখ !

ঈশ্বর কোথায় নেই। তিনি উর্ধ্বে আছেন; অধে আছেন ; সর্বভূমিতে আছেন ভূমা। ঈশ্বর বামে আছেন ; দক্ষিণেও আছেন প্রতি নরের জন্যে ; কিন্তু নরেন্দ্রনাথের জন্যে জেগে আছেন দক্ষিণেশ্বরে।

॥ সতেরো ॥

বিধবা, ষাঁড়, সিঁড়ি এবং সন্ন্যাসীর কবল থেকে রক্ষা পেলে তবেই আসল কাশীর সাক্ষাৎ পাবেন আপনি, এমন কথা কেবল কাশীতে যাদের বাস, নানা বিধিনিষেধের কারণ তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে তিনশো দিনের ওপর যাদের কখনও দুবেলা, কখনও একবেলা উপবাস, তাদের মুখেই না, যারা কাশীমুখো হয়নি কখনও এ জীবনে তাদের সুমুখেও কাশীর কথা তুলে দেখবেন, ওই এক জবাব বাঁধা। কিন্তু তারপরেও যদি জিজ্ঞেস করেন আসল কাশী বলতে বক্তা কি বোঝেন তাহলে তার আর উত্তর নেই। লোকসভায় বেকায়দা প্রশ্নের সম্মুখে গত্যন্তরবিহীন মন্ত্রী মহোদয়কে বাঁচাবার জন্যে 'নোটিশ চাই'-এর কবচ অথবা স্পিকারের নাকচ করে দেবার ক্ষমতা প্রয়োগের রক্ষাকবচহীন আসল কাশীর টিকাকারকে কাজ আছে, পরে হবে-র ছুতোয় আশু প্রস্থানের উদ্যোগ করতে দেখবেন অতঃপর। কাশী অথবা পৃথিবীর কোনও জায়গা বললেই যাঁরা কেবল ধর্ম, ব্রহ্মচর্য, মালা জপা বোঝেন তাঁরা আসল থেকে ততদূরে থাকেন যতদূরে রামকৃষ্ণ মিশান নয় রামকৃষ্ণ থেকে। কাশী বলো, হরিদ্বার বলো, বলো নির্জনাত্মা হিমালয়, যে কেবল কৈবল্যের আশায় এসব জায়গায় জীবনভোর যাওয়া-আসায় কাটিয়ে দিলো তার মন বৈকল্য ছাড়া আর কি পেলো।

গাইড দেখে দেখে যে কেবল কাশীর ঘাটে হতিহাস আর কাশীর মন্দিরে কিংবদন্তীর মরীচিকায় মুখ থুবড়ে মোলো সেই মিসগাইডেড হতভাগ্য মিস করলো জীবন্ত কাশীকে; পাপে-পুণ্যে গলাগলির অসংখ্য গলি আর তার চেয়েও সংখ্যায় বেশি বিধবা, ষাঁড়, সিঁড়ি এবং সন্ন্যাসীর কাশীকে। বিশ্বনাথের আবাস যেখানে বিশ্বের যত পিতৃপরিচয়হীন অনাথের আবাসে সেই আসল কাশী গাইডে নেই;

নেই এক টাকায় বারো কি ষোলখানা ছবির পোষ্টকার্ডে। ট্যুরিষ্ট-ক্যামেরার লেন্স আছে; তার চোখ নেই। কাশীখণ্ডে কিংবদন্তীর রোমাঞ্চ আছে; নেই কেবল সেই মুহূর্তের মধ্যে মূর্ত রক্তমাংসের কাশীর এই মুহূর্তের বিচিত্র বিস্ময়। যার ভগবান কেবল আকাশে বিরাজ করেন তাঁর সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছেন 'শ'। যার বিশ্বনাথ কেবল কাশীর বিশ্বনাথের গলিতে বাস করেন তার সম্বন্ধে সাবধান হতে বলি শতবার। বিশ্বের যত অনাথের গলি যে দেখেনি তার বিশ্বনাথের গলি দেখা হয়েছে হয়ত, কিন্তু বিশ্বনাথদর্শন আজও অসমাপ্ত সেই ভাগ্যনিহতের; সেই দুর্ভাগ্যপীড়িতের।

এই বিশ্বের যিনি নাথ তিনি নিঃস্বেরও নাথ; ঈশ্বর তিনিই যিনি বিশ্বের, যিনি নিঃস্বের; নিঃস্বেশ্বর যিনি তিনিই বিশ্বেশ্বর!

কোনও জায়গায় নবাগত কেউ যেমন স্টেশানে পা দিয়েই প্রশ্ন করে, এখানে কোনও ভালো হোটেল-টোটেল আছে? তেমনই কাশীতে তার চেয়েও ক্যাসুয়ালি জিজ্ঞেস করে: কাশীতে এখন ভালো সাধু-টাধু আছে? যেন, গাড়ি, বাড়ি, গয়না, শাড়ি, ভালো খাবার, কি ফ্রিঞ্জ, না কি রেডিওগ্রাম, অথবা ট্রানসিষ্টারের মতো সাধু-ও কোনও কোমোডিটি, হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। এরাই, এই সব অন্তঃসারশূন্য, দম্ভে পরিপূর্ণ অর্বাচীন-প্রবীণরাই কেউ যে-কোনও সাধু গায়ে ছাই মেখে গেরুয়া পরে বসে থাকলেই তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেয় ভণ্ড বলে। ডাক্তার হবার আগেই মেডিক্যাল ষ্টুডেণ্ট ষ্টেথিসকোপ ঝোলায়, কোর্টে যায় দাবা খেলতে যে. ব্রিফলেস ব্যবহারজীবী, সে-ও যায় কালো কোট চাপিয়ে। লোকে কখনও অবাক হয় না; কারণ এটাই ওই দুই পেশার 'রিডিক্যুলাস' জীবন-সঙ্গত; সাংঘাতিক রকমে স্বাভাবিক। কিন্তু ছাইমাখা সন্ন্যাসী দেখলে, ছাই উড়িয়ে দিয়ে দেখবার সময় নেই কারুর, অমূল্য রতন মেলে কি না; কিন্তু বলবার পণ্ডিত-মূঢ়তা আছে 'দূর ছাই'!

ডাক্তারের কাছে যেতে হলে টেলিফোন করে, রেকমেণ্ডেশান জোগাড় করে, ধর্ণা দিয়ে, কিউ-তে অপেক্ষা করে দেখা পায় কখনও;

কখনও পায় না। উকিলের কাছেও তাই। কিন্তু সাধুর বেলায় উল্টো; কাশীর বেলায় আলাদা। কাশীতে পা দিয়েই তাই আশা, সাধু-সন্ন্যাসী সব সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আগন্তুকের জন্যে; প্রত্যেকের গায়ে সাঁটা থাকবে তার দাম কত এবং সেইটে ফেলে দিলেই সাধুর সঙ্গে সঙ্গে সুড় সুড় করে যেতে হবে ক্রেতার পেছন-পেছন। না গেলেই ক্রেতার অনিবার্য সিদ্ধান্ত, কাশীতে আর 'সাধু-টাধু' নেই; সব ভণ্ড; সবাই সেই পাগলা মেহের আলীর মতো সমবেত সোচ্চার মুহূর্তেঃ 'সব ঝুট হায়! সব ঝুট হায়!'

এই 'সাধু-টাধু' খোঁজার দল জানে না আজও যে পৃথিবীতে রাজা, পণ্ডিত, ব্যবসাদার, দরিদ্র, সবাই আজ অথবা কাল বিক্রীত হবার অপেক্ষায়। পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত যা অবিক্রীত তা হচ্ছে মা এবং মাতৃসাধক!

কে চিনবে, সাধুকে? সাধু কে, কে অসাধু একথা বলবে কে? ভক্ত ছাড়া ভগবান আর কার? ভক্ত ছাড়া ভাগ্যবান কে আর? এবং ভক্তকে, ভক্ত কে একথা ভগবান ছাড়া বলবে আর কে?

একজন গেছে হরিসভায়;—আরেকজন, বাঈজী-আলয়। হরি-সভায় যে গেছে তার কান হরিনামে সাড়া দিলেও প্রাণ পড়ে আছে বাঈজী-আলয়ে। বন্ধু কেমন মজা লুটছে সেখানে, আর, আমি পড়ে আছি শুষ্ক ধর্মতত্ত্বের মরুভূমিতে; মরাভূমে। আর সুরসভায় সুরাশোভায় বিচ্ছুরিত রক্তিমবদন বাঈজীর গানে কান আছে আরেকজনের; কিন্তু তার প্রাণ পড়ে আছে হরিসভায়। তার অনুতাপ হচ্ছে কেন সে মরতে এল এই মরভূমের প্রেতনৃত্যের আসরে অমরভূমের নিত্যবাসর ত্যাগ করে। তার বন্ধুর মতো সেও কেন গেল না ক্ষুরের ধারের চেয়েও দুর্গম সেই বন্ধুর পথে,—যে পথ চলে গেছে নশ্বর থেকে ঈশ্বরের দিকে; যে পথ নরলোককে মরলোক পার করে পৌঁছে দিয়েছে অমরলোকে; যে পথ রাগে নয় নয় বিরাগে রাঙানো; অনুরাগে রাঙা মাটির যে পথ অনিত্যের মরু-পর্বত, কান্তার-পারাবার পার হয়ে নিত্যকালের উৎসবলোকে নিয়ে গেছে;

যেখানে নব নব আলোকে আলোকে অবিনশ্বরের আরতির জ্বলছে অনির্বাণ জ্যোতির্শিখা!

এই তুজনের মধ্যে কে পাবে হরিকে? হরিদ্বারে যে আছে জপের মালা হাতে লোভের থালার দিকে তাকিয়ে সে নয়; হরিদ্বার থেকে দূরে আছে যে, কিন্তু খুলে গেছে যার অন্তর্দ্বার সে পাবে তাঁকে যাকে জ্ঞান পায়নি, বিজ্ঞান চায়নি; ধর্ম যাকে খুঁজছে; তত্ত্ব ঢুঁড়ছে যাঁকে আদিকাল থেকে; অনাদিকাল থেকে যিনি তাকিয়ে আছেন তার দিকে যে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই চায়নি, চেয়েছে কেবল তাঁকে। অক্ষৌহিণীর বদলে চেয়েছে অক্ষয়কে; অসংখ্যের বিনিময়ে সেই শঙ্খকে যাঁর মুখে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীহরি স্বয়ং বলেছেন: ত্যাগ করো অধর্মকে; তারপরে পরিত্যাগ করো ধর্মকেও। স্মরণ করো আমাকে; বিস্মরণ করো সব অকর্ম, সব কর্মকে। জীবন মরণ সব আমি; শরণ নাও আমার!

তাই শ্বাস নয়; বিশ্বাস! তাই রণ নয়; চরণ! মরণ নয়, শ্রীহরি স্মরণ! তাঁর তুপায় পড়া ছাড়া তাঁকে পাবার আর উপায় কি? বোধি কেমন করে পাবে তাঁকে যাঁর অবধি নেই, নদী কেমন করে পায় সমুদ্রকে, তেমন করে ছাড়া?

কে বলবে তাই বিশ্বনাথ বন্দী হয়ে আছেন কেবল বিশ্বনাথের গলিতে? কে বলবে, তিনি নেই মধুলোভী অলিতে; তিনি আছেন কেবল প্রসাদলোভী অঞ্জলিতে? কে বলবে, 'মরা'-র মুখে যিনি অমরার বাণী, মারের সুমুখে রামের মূর্তি ফোটান, কলসীর কানায় যখন রক্তধারা গা বেয়ে পড়ছে তখনও ভালোবাসায় অন্ধ যিনি রাগে অচৈতন্য-কে চৈতন্য দিচ্ছেন, কে বলবে তিনি কোথায় আছেন আর কোথায় নেই?

নারদ এসে প্রশ্ন করলো শ্রীভগবানকে: মুমুক্ষু জিজ্ঞেস করেছে তার মুক্তির দেরী কত আর? শ্রীভগবান উত্তর দিয়েছেন তার প্রশ্ন করে: আর আমার ভক্ত তার কথা তুমিও ভুলে গেলে? নারদের মনে পড়ে; রাগত স্বরে সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কর্তা অবিনাশী সত্ত্বাকে

তিনি বলেন : হ্যাঁ, আরেকজনও আমাকে প্রশ্ন করেছিল বটে, জিজ্ঞেস করেছিল কতদিনে সে পাবে তোমার দেখা ? কিন্তু সে তোমার নাম করেনি ; গাল দিয়েছিল তোমায় ! সে হল তোমার ভক্ত ? শ্রীভগবান হরি বললেন : 'দুজনকেই গিয়ে বল, আমার হাতে অনেক কাজ, উত্তর দেবার সময় নেই এখন ; তারপর তারা কি বলে তা শুনেও যদি বুঝতে না পারো আমি কার ভক্ত, তবে এসো আবার আমার কাছে।'

নারদ গিয়ে মুমুক্ষুকে বললেন আর বললেন শ্রীহরিনিন্দুককে, দুজনকেই জানালেন ভাগবৎবার্তা। প্রথমজন নিরাশ হল ; দ্বিতীয়-জন গালাগালের রাশ আলগা করল আবার, একগাল, একরাশ গালাগালের পর অতঃপর বলল : 'তুমিও যেমন বিটলে, সে-ও তেমনই ! যাঁর দৃষ্টিপাতে কোটি কোটি ভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ঘটার ব্যাঘাত নেই, তার কাজের ঘটা দেখ একবার ! যাও যাও, নিজের কাজে যাও এখন। বুঝেছি, আমার সময় হয়নি এখনও— !'

বুঝলেন নারদও। বুঝলেন, কার দুঃসময়ের ধারা ফুরোতে দেরী আছে আর কার 'সময়' হয়েছে সন্নিকট। আর, বুঝলেন, আরও বুঝলেন মুনিশ্রেষ্ঠ, যে, কেন অসময়ে ডাকলে সাড়া দেন না শ্রীহরি, আর সময় হলে কেন তিনি এসে দাঁড়ান নিজে থেকেই, সময়ের অতীত যিনি সব সময়েই।

রাগের স্বর নয়, বৈরাগ্যের সুর নয়, অনুরাগের শর যাঁকে স্পর্শ করে তিনিই ঈশ্বর। উর্ধ্বে বা অধে নয় ; নয় উত্তরে কিংবা দক্ষিণে ; জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ধর্মতত্ত্বে নয় ; কিছুতেই নয় উপবাসে ; আর সমাজের বিধিনিষেধ নয় বিধির নিষেধ ; ভক্তের ভালোবাসা যাঁর সব চেয়ে ভালো বাসা, তিনিই ভগবান।

হরণ করতে করতে কোন সময়ে তাই রত্নাকর মনোহরণ করেছিলেন শ্রীহরির ; মরা মরা বলতে বলতে রাম রাম বলে উঠেছিলেন তিনি, রত্নাকর থেকে যিনি বাল্মীকি হ'য়ে উঠেছিলেন একদা। রমণীকে ভালোবেসে ভালোবেসে ছিলেন আরেকজন

রমণীমোহনকে। এই কাশীতেই তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন সেই 'সংকট মোচনের'। সেই 'আরেকজনের' নাম সাধু তুলসীদাস ; যাঁর সম্বন্ধে মধুসূদন সরস্বতীর মুখে স্বয়ং সরস্বতীই যেন বলেছেন :

আনন্দকাননেহ্যস্মিন্ জঙ্গমঃ তুলসী তরুঃ।
কবিতা মঞ্জরী যস্য রাম-ভ্রমর-ভূষিতাঃ॥

কথাটা তাই সত্য। কাশী হচ্ছে সেই নিত্যানন্দের কানন যেখানে জেগে আছে জীবন্ত-তুলসী যাঁর কাব্যমঞ্জরী সেই ভ্রমরভূষিত যে ভ্রমরের নাম রাম। প্রথম যৌবনে রামনাম নয়, যে নাম তাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল সে তাঁর স্ত্রীর নাম রত্না। বাল্মীকির মতো তিনিও ছিলেন রত্নাকর সেদিন। পথিকের ধনরত্ন অপহরণ করত যে একদা সেই আরেকদিন মানবচরিত্ররত্নের শ্রেষ্ঠ আকর যে রাম তাঁরই জীবনকাব্য রচনায় ভাষাকে দিলেন ছন্দ। মরা মরা বলতে উচ্চারণ করলেন, রাম, রাম। আর রমণীরত্ন থেকে আরেকজন রমণীয়তর রত্নের অন্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রচনা করলেন রামচরিত। রত্না রত্না করতে তিনি শরণ নিলেন রত্নাকর রামের। স্ত্রীনাম নয় ; শ্রীরাম হল তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

হিমাদ্রিশৃঙ্গে আসন্ন হয়ে এলে আষাঢ়, মহানদ ব্রহ্মপুত্র ক্ষিপ্ত ধূর্জটির মতো আপনার তীর উপকূল খুঁজতে উন্মত্ত হলে তমসাচ্ছন্নতম অরণ্যে শরাহত ক্রৌঞ্চ মিথুনের বিচ্ছেদে বাল্মীকির বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে জন্ম নিল ছন্দ। ভূচর ভাষার অঙ্গে যুক্ত হল খেচর পক্ষ। সেই ছন্দে কার বন্দনা গাইবেন প্রশ্ন করলেন গুরুকবি ; নারদ যাঁর নাম করলেন তিনি শুধু বীর নন, তিনি রঘুবীর। এমনই অন্ধকারাছন্ন এক রাতে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে খুঁজে পেলেন না স্ত্রৈণ তুলসীদাস। ঝড়, জল, অন্ধকার উপেক্ষা করে শ্বশুরালয়ে গিয়ে পেলেন স্ত্রী, রত্নাকরকে। ক্ষণিক অদর্শনে অস্থির স্বামীকে শান্ত করতে ভর্ৎসনার সুর ধ্বনিত হল সে ধনী মানিনীর মুখে :

'লাজ না লাগত আপুকো,
ধীরে আয়েছ সাথ।

ধিক ধিক আয় সে প্রেমকো,
কহা কহোঁ যে নাথ ॥
অস্থিচর্মময় দেহ মম—
তামো জৈসী প্রীতি।
তৈসী জৌ শ্রীরামমহ—
হোত ন তত্ত্ব ভবভীতি ॥

[সাধক-জীবনী ঃ শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।]

যৌবনস্বপ্নে আচ্ছন্ন তুলসীদাসের আকাশে মদিরাক্ষীর তীব্র তিরস্কারের অগ্নিআখরে ফুটে উঠল স্ত্রীনাম নয়; শ্রীরাম। লালাবাবুর কানে এসে বেজেছিল মেছুনির মুখে না জেনে উচ্চারিত সতর্কবাণী ঃ 'বেলা যায়।' জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় সেই বাণী বুকে এসে বিঁধেছিল। বাণী নয়; মোহপাশ ছিন্ন করবার সেই বাণই যেন বলেছিল আরেক কবির, জগতের সকল কালের সকল দেশের শ্রেষ্ঠ কবির কথায় ঃ

'আরও বড় হবে না কি যবে অবহেলে
ধরার ধূলার হাট হেসে যাবে ফেলে

সংসারে যে ছিল সং সেজে, বেরিয়ে গেল সে 'সার' খুঁজতে। প্রস্তুতি ছিল লালাবাবুর, বহু জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা ছিল পাথর চাপা। খুলে গেল মুহূর্তে তার মুখ। মেছুনির ডাক তার নিমিত্ত মাত্র; তার বেশি কিছু নয়। মন প্রস্তুত ছিল তুলসীদাসেরও। তাই স্ত্রী রত্না যখন তাকে বলল যে, স্ত্রীনামে তোমার যে আগ্রহ তার কণামাত্র যদি হত শ্রীরামে, তাহলে চলে যেত কাম, সেখানে জেগে উঠত নবদূর্বাদল শ্যাম। স্ত্রীর সেই ক'টি কথায়, কোটি কথায় যা ঘটে না, ঘটে গেল সেই অঘটন। স্বধর্ম-বিস্মৃত নদী দাঁড়িয়েছিল দুদণ্ডের জন্যে ডোবা-র ছদ্মবেশে; তার কানে এসে পৌঁছল সমুদ্রের ডাক। রাধার কানে এল কৃষ্ণের বাঁশী। অন্তহীন দূরের। অনন্তের অভিসারে জীবন নদী যখন বেরোয় সিন্ধুর উদ্দেশে, তখন তার দুর্বার দুর্নিবার গতিরোধ করে এমন সাধ্য কার! স্ত্রীনামও আর পথ আটকে দাঁড়াতে পারল না শ্রীরাম-ভক্তের। স্ত্রীনামের দেয়াল দিয়ে ঘেরা সং

পিছনে পড়ে রইল ; সুরু হল শ্রীরাম সার নবজীবনের। স্ত্রীনামের অসারঅভিমান থেকে জাত হল শ্রীরাম-অভিসার ; শ্রীরাম-অভিযান।

বরুণা থেকে অসি ; ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর। পাথরে নিস্ফল মাথা কোটে। শ্রীনাম ধ্যান করে, শ্রীনাম জ্ঞান। কিন্তু শ্রীরাম কোথায় ? শাস্ত্রজ্ঞ সনাতন দাসের কাছে গিয়ে পড়েন শাস্ত্র অজ্ঞ তুলসীদাস। কিন্তু শাস্ত্রে সে সান্ত্বনা পাবে কোথায় শাস্ত্রের অতীত অবাঙমানসগোচরকে যে চাইছে জানতে ; বিদ্যা তাকে কি দেবে যে খুজে বেড়াচ্ছে বিদ্যা যে দেয় তাকেই। দর্শন না হলে দর্শন পড়ে কি হবে লাভ। টোল থেকে দূরে অনন্ত নিভৃতে, মধুকরগুঞ্জরণে যেখানে কাঁপছে ছায়াতল সেখানে চলে শ্রীনাম জপ ; শ্রীরামধ্যান। জ্যোতির্ময় সূর্যের আলো এসে পড়ে পায়ের কাছে তৃণাসনের ওপর তির্যকরেখায় রাত্রির তিমির অন্তে। ভঙ্গ হয় না তখনও নবদূর্বাদল-শ্যাম সেই ধ্যান। কত সূর্যোদয়ে, কত সূর্যাস্তে অধীর অপেক্ষা ব্যর্থ হয় বুঝি অসীম উপেক্ষায়। নয়নের সম্মুখে কেন সে এসে দাঁড়ায় না নয়নের মাঝখানে যে নিয়েছে ঠাঁই। শ্যামল যে শ্যামল সেই নব-দূর্বাদলশ্যাম কেন এসে দাঁড়ায় না একবার, ধনুর্বাণ হাতে সেই ধনুর্ধর?

তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপে জ্বলে সেই জিজ্ঞাসা ঃ পূর্ণচন্দ্র তুমি কি জানো শ্রীরামচন্দ্র কোথায় ? সকালবেলায় রোজ জল ঢালেন এক বৃক্ষমূলে তুলসীদাস। সেই বৃক্ষে এক অতৃপ্ত আত্মার বাস। বুক জ্বলে যায় তার তৃষ্ণায় ; তুলসীর দেওয়া জলে গলে যায় তৃষ্ণার পাষাণ রোজ। অসীম কৃতজ্ঞতায় সে একদিন শ্রীরামদর্শনলাভের নিশানা দেয় শ্রীরামাভিলাষীকে। তার নির্দেশমতো, দশাশ্বমেধ ঘাটের ধারে রামায়ণকথার আসর শেষ হয়ে গেলে অনুসরণ করে তুলসীদাস বৃদ্ধের বেশে আবির্ভূত মহাবীর রঘুবীরভক্ত স্বয়ং হনুমানকে।

নিভৃততম একস্থানে তাঁর পায়ে পড়ে জানতে চান তুলসী শ্রীরাম-দর্শনের উপায়। বৃদ্ধের বেশ পরিত্যাগ করে বীরের বেশে আত্মপ্রকাশ করেন রঘুবীরভক্ত ভক্তরাজ মারুতি। শ্রীরামভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় 'শ্রীরামভক্তি'র।

॥ আঠারো ॥

মহাবীর রঘুবীর ভক্ত পবননন্দন বললেন, তুলসীদাসকে চিত্রকূট পাহাড়ে যেতে। শ্রীরামপদস্পর্শে পবিত্র চিত্রকূট; সাধনার বিচিত্র কূট রহস্য অবগত হবার উপযুক্ত পরিবেশধন্য স্থান। সেইখানে সাধনাসনে অবস্থান করতে করতেই তুলসীর স্থূলদৃষ্টির সামনে আবির্ভূত হবেন পরমসাধ্য পদ্মলোচন সীতাপতি; রঘুপতি রাঘব রাজারাম। চিত্রকূট পর্বতের দিকে চললেন সাধক-কবি গোস্বামী তুলসীদাস। পথ চলেন রাম নাম করতে করতে; শ্রীরাম প্রণাম করতে করতে চলেন কবিকুলচূড়ামণি। শ্রীরাম নামে, শ্রীরাম প্রণামে মধু ক্ষরিত হতে থাকে আকাশে বাতাসে। মধুময় হয় দ্যুলোক, ভূলোক। কত সূর্যোদয়, কত সূর্যাস্ত রাম নামে রাঙা হয় সেই ভক্ত কবির করুণ রঙীন পথ।

চিত্রকূট পর্বতে পৌঁছন সাধক; শ্রীরামসিন্ধুর সন্নিকট হয় শ্রীতুলসী নদ।

চিত্রকূট পর্বতের এক কোণে তপস্যায় আসিন হলেন তুলসীদাস। একদিন চন্দন ঘষছেন ভক্ত, এমন সময় এক দুর্নিবার আকর্ষণযুক্ত দুরন্ত বালক এসে দাঁড়ায় দ্বারপ্রান্তে। প্রভাতের প্রথম আলো এসে পড়েছে পায়ের কাছে। সেই আলোয় যেন এসে দাঁড়িয়েছে আলোর চেয়েও আলোকময় এক শতদল। কি আশ্চর্য বরতনু সেই বালকের। দিব্য বিভায় জ্যোতির্দীপ্ত সেই আনন। কমলফুল বলে ভুল করে যে মুখে এসে বসছে মধুলোভাতুর অসংখ্য অলি। কি চায় এই নবদুর্বাদলশ্যামাঙ্গ? তুলসী তাকান: 'কি চাও তুমি, বাচ্চা?' হাসিতে ভুবন আলো করে বালক হাত বাড়ায় চন্দনের থালার দিকে। তড়িৎগতিতে থালা সরান তুলসী। শ্রীরামথাল্য থেকে চন্দন তুলে নিতে চায়, এ কে। তড়িতালোকে স্মৃতির আকাশ

থেকে অপসারিত হয় বিস্মৃতির যবনিকা। মনে পড়ে যায় এমনই একবার তাঁর আরাধ্য দেবতা রঘুপতি রাঘব রাজারাম তাঁকে দেখা দিয়েও দেখা দেননি। ভক্ত হনুমান সেবারে বলেছিলেন, যে রামনবমীর পুণ্য তিথিতে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং দেখা দেবেন শ্রীরামভক্তকে।

সেই পুণ্য রামনবমীতে যখন শ্রীরামচন্দ্রের দেখা না পেয়ে নিভৃত কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন তুলসীদাস তখন তাঁর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল একদল যাযাবর। বাঁদর নাচ দেখাবে তারা সাধককে। ক্রুদ্ধ, কুপিত কবি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বেদের দলকে। তার পর পবননন্দন ভুল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন তুলসীর। তাঁরাই গিয়েছিলেন বেদের বেশ ধরে,—শ্রীরাম, সীতা, লক্ষ্মণ এবং হনুমান সেদিন ভক্তের কুটীরপ্রান্তে। সেই ছলনার কথা আজ আবার মনে পড়ে তুলসীর। তুলসীতলায় জ্বলে ওঠে জীবনদেবতার দীপ। সেই দীপালোকে চিনতে পারেন যেন বালককে ; এই সেই নবদুর্বাদলশ্যাম রাম। সেই চেনার আলোকে অচেনার আরতি করেন কবি ঃ

বালক শুনহু বিনয় মম এহুঁ।
তুম্ শ্রীরামচন্দ্র কি দুসর কেহুঁ ?

কমল আঁখির কোণে অমরাবতীর হাসি ছড়িয়ে পড়ে ; বাঁধ ভেঙ্গে উছলে পড়ে আলো ঃ সকল শ্রীরাম অবতার ! বালক বিদায় নিলে ধ্যানাবিষ্ট তুলসী লিখলেন চোখের জলে ঃ

চিত্রকূট কে ঘাট পর ভাই সন্তন কী ভীড়।
তুলসী দাস চন্দন ঘসৈ তিলক দেই রঘুবীর।

[—ভারতের সাধক ঃ তৃতীয় খণ্ড]

সাধক তুলসীদাসের রামায়ণ, রামচরিতমানস,—সেই শ্রীরামদর্শন।

চিত্রকূট থেকে বৃন্দাবনের পথে পা বাড়ালেন কবি। বৃন্দাবনে মদনগোপালের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে রামদর্শনাভিলাসী তুলসীদাস যুক্ত করে নিবেদন করেন ঃ

কহা কহোঁ ছবি আজকী তালের নেহো নাথ।
তুলসী মস্তক তব নোয়ে ধনুষ বাণ লেও হাত ॥

হে মুরলী-মুকুটরাজ মদনগোপাল, তুমি একবার ধনুর্বাণ হাতে দাঁড়াও আর একটি নমস্কারে তুলসীদাসের মরদেহ লুটিয়ে পড়ুক অমরদেহর পায়ে!

বাঁশী ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন মদনগোপাল; হাতে তুলে নিয়েছিলেন তীরধনুক! শ্রীরামপাদপদ্মে চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল 'তুলসী'-পত্র!

বৃন্দাবন থেকে অযোধ্যায়। স্ত্রীনাম ধ্যান থেকে তখন জন্ম নিয়েছে শ্রীরাম-গান; শ্রীরামচরিত মানস।

দয়া ধরমকি মূল হেঁয়
নরক মূল অভিমান।
তুলসী মৎ ছোড়িয়ে দয়া
যও কণ্ঠাগত জান॥

তুলসীর দোঁহা তখন উত্তর ভারতের পথে প্রান্তে বিকীরণ করছে আশ্চর্য আলো। সে আলোয় নিদ্রিত হৃদয়ের কলুষ মোচন হচ্ছে; জেগে উঠছে ভক্তির দলের পর দল মেলে ভক্ত শতদল। সেই ভক্তদের দেওয়া মূলবান দান অপহরণ করতে এসেছে একদিন একজন তস্কর। রৌপ্যনির্মিত পত্রের দিকে হাত বাড়াবার আগেই, নবদূর্বাদলশ্যাম একজন ধনুর্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান; নিত্যপ্রহরায় নিরত। তুলসীদাসকে প্রভাতে সেই তস্কর সাধু সেজে এসে জিজ্ঞেস করে ধনুর্ধারীর পরিচয়। সেই চোরের মুখে ধনুর্ধারীর রূপের কথা শুনে তুলসী বলেন: আমি যাঁর দর্শন পাইনি আজও, তুমি পেয়েছ তাঁর রূপের সাক্ষাৎ! সেই অপরূপের দর্শনধন্য কে তুমি ভাগ্যবান জানি না ভাই; তোমার আলিঙ্গনে আজ আমাকে পূত কর, পবিত্র কর, যোগ্য কর, তাঁকে দর্শনের যোগ্য; যোগে অথবা যজ্ঞে যিনি নেই।

তুলসীদাসের আলিঙ্গন-বাক্যে দস্যু রত্নাকর মুহূর্তে স্বীকার করে নিজের অপরাধ; আর করে মার্জনা। তুলসীর মন তখন চলে গেছে অনেক দূরে। তাঁর সামান্য বিত্তের রক্ষণাবেক্ষণ করতে স্বয়ং প্রভু রামচন্দ্রকে পাহারা দিতে হয় সারা রাত জেগে,—এ দুঃখ

তুলসী রাখবেন কোথায়। 'জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই; ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে'। যতক্ষণ রাম ছাড়া আরও কোনও উপকরণের আছে প্রয়োজন, ততক্ষণ দেখা দেবে কেন সেই ধনুর্ধারী? যতক্ষণ সামান্য বাঁকাচোরাও ঘরেতে আছে পোরা ততক্ষণ পোরাবে কেন মনোবাঞ্ছা সেই ধনুর্ধর? দ্রৌপদী যতক্ষণ কাপড়ের খুঁট চেপে ধরে, ততক্ষণ কৃষ্ণের দেখা নেই। যখন সম্পুর্ণ নিঃসহায় দ্রৌপদী হাত তুলে দিলেন শূন্যে, হা কৃষ্ণ তুমি কোথায় বলে, তখনই শূন্যকে পূর্ণ করে দেখা দিলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মভূষণ। যে সব ত্যাগ করেছে, সর্বত্যাগী যে সেই পায় গীতার পুরুষোত্তমকে। কুন্তীকে বর দিতে স্বীকৃত শ্রীকৃষ্ণ যখন জানতে চাইলেন কুন্তী কি চায়, তখন কুন্তি বললেনঃ আমার জীবনাকাশ থেকে কখনও দুঃখের কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দূর কোরো না তুমি। কারণ দুঃখ দূর হলেই দুঃখহরণও বহু দূর হবেন। আরামে হারাম হায়। আরাম ত্যাগ করে, হারাম জ্ঞানে পরিত্যাগ করে আরামের উপকরণ। 'হা রাম' বলে শ্রীরাম সর্বস্ব হলে তবেই দর্শন দেন, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।

তুলসী বিলিয়ে দিলেন সব সঞ্চয়। শুধু হাতে-লেখা রামচরিত-মানসের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত হলো তুলসীর বন্ধু-গৃহে। তুলসীতলায় শ্রীরামশঙ্খে ফুঁ পড়ল এতদিনে জীবনতুলসী মুঞ্জরিত হবার শুভ মুহূর্ত হলো সমাগতপ্রায়।

সিদ্ধবাক শ্রীরামসাধক তুলসীর কাছে এলো এক অমোচনীয় পাপদাহের অন্তর্জ্বলায় অহরহ দগ্ধ একজন। ব্রাহ্মণবধের পাপ তার কোন্ প্রায়শ্চিত্তে হবে নির্মূল। তুলসী বললেনঃ শ্রীরাম নাম নাও! সব পাপ হবে পূন্য; পূর্ণ হবে শূন্য। সমাজ আর শাস্ত্র, পুঁথি আর পণ্ডিত বললেঃ রামনামের যদি এত জোর, এত জাদু যদি রামপ্রণামে তবে মন্দিরের মধ্যে রয়েছে এই যে পাথরের ষাঁড়—এ গ্রহণ করুক নাম উচ্চারণে পাপমুক্ত এই পাতকের হাত থেকে তৃণগুল্ম। তুলসী বললেনঃ তবে তাই হোক। রাম নামে প্রকম্পিত মন্দির-প্রাংগণে চৈতন্য লাভ করলে স্থূলচক্ষে জড়,—সেই

বৃষ। প্রকম্পিত হলো তার প্রস্তর-কলেবর। পাথরের বুক বিদীর্ণ ক'রে বইল ক্ষুধার জাগ্রত নদী; বসুধারা বুক বিদীর্ণ ক'রে যেমন উচ্ছসিত হয় সুধার ঝর্ণাধারা! অহল্যার পাষাণে যদি প্রাণ সঞ্চার হয় শ্রীরামচন্দ্রের পদস্পর্শে, তবে কেন শিলায় শিলায়, বৃষস্কন্ধে তার শিরায় শিরায় বইবে না রাম নামে, রামপ্রণামে প্রবল প্রাণ বন্যা? রৌদ্ররুক্ষ শাস্ত্রের অকৃপায়, রুদ্রসূক্ষ্ম শাস্তির অকরুণায় 'জীবন যখন শুখায়ে যায়' তখনই যদি না তুমি, 'করুণাধারায় এস' তবে তুমি কেমন ভক্তের ভগবান?

রঘুবীরজনক এমনই কোনও পাপের দুঃসহ জ্বালা জুড়োতে গিয়েছিলেন, জানতে গিয়েছিলেন ত্রিকালজ্ঞ ঋষির কাছে প্রায়শ্চিত্তের উপায়। শ্রীরাম নাম করতে বলেছিলেন ঋষির অবর্তমানে ঋষিপুত্র সেদিন। তিনবার রাম নাম করলেই, শ্রীরাম-চন্দ্রের পিতার সব কলুষ মুক্ত হবে,—এই অমৃতবাণী দশরথের মৃত উৎসাহে আশার সঞ্চার করলেন। ফিরে গেলেন হৃতচিত্তে ঋষির আলয় থেকে রাজালয়ে। ঋষি আশ্রমে ফিরে শুনলেন তাঁর পুত্র তিনবার রাম নামে কলুষমুক্তির সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের কথা। প্রসন্নচিত্র, সৌম্যদর্শন ঋষিচিত্ত জ্বলে উঠল দাবানলের মত; ঋষির আনন আদিত্যবর্ণ ধারণ করল ক্রোধে। তিনি বললেন, যে নাম একবার করলে একাধিক জন্মের সমস্ত পাপ অবসান হয় চক্ষে পলক পড়বার পূর্বেই, সেই পুণ্য পবিত্র, পূর্ণতার প্রতীক রাম নাম তিনবার করতে বলে যে অন্যায় করেছেন তাঁর আত্মজ তার জন্যে পিতা হয়ে তিনি দিচ্ছেন পুত্রকে অভিশাপ।

রাম নামে যদি মুক্তি না আনে, ভগীরথ প্রণামে যদি না নামে শিবের জটামুক্ত হয়ে জাহ্নবীর মুক্তধারা, ভগবানের পায় যদি না বাজে অমৃতের উপায় তবে ভক্ত নিরুপায়!

দিল্লীশ্বর সাজাহান যোগী তুলসীর সম্বন্ধে প্রচলিত বহু উপাখ্যানে আকৃষ্ট হয়ে ডেকে পাঠান তুলসীকে; বলেন, অলৌকিক শক্তি দেখাতে। জগদীশ্বরের সেবক দিল্লীশ্বরের কথায় অলৌকিক ক্ষমতার

অপব্যবহার করতে অসম্মত হন। সম্রাট তাঁকে কারাগারে বন্দী করেন। শ্রীরামভক্ত বন্দী হলে, দিল্লী জুড়ে সুরু হয়ে যায় হনুমানের লংকাকাণ্ড। জগতের যিনি সম্রাট তিনি যাঁকে পাঠিয়েছেন মুক্ত-পুরুষ করে সে পুরুষকে দিল্লীর সম্রাট বন্দী করবে কেমন করে। অবিলম্বে সভাসদদের সুপরামর্শে, হনুমানের আবির্ভাবে ভীত প্রজাদের আর্তনাদে অশুভের আশংকায় সাজাহান মুক্ত করে দেন শ্রীরামভক্তকে।

এই তুলসীদাসই আবার সামান্য লোকের, অতি সাধারণ স্ত্রীলোকের দুঃখে তাদের শত অনুরোধ উপরোধ এড়াতে না পেরে অলৌকিক শক্তিপ্রয়োগ করতে বাধ্য হতেন; যেমন সেবার মণিকর্ণিকার ঘাটে সদ্যবিধবার প্রণামের উত্তরে আশীর্বাদ করেন ঃ পতিপুত্রবতী হয়ে সৌভাগ্যসুখ ভোগ কর। স্বামীর শবের দিকে সাধকের দৃষ্টি পড়া মাত্র, শবের ওপর আরম্ভ হয় আবার জীবনের উজ্জ্বল উৎসব।

এমনই হয়; এমনই হবার কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি বলেন তবে একই গাছের একই ডালে সাদা এবং লাল দুই রংএর, দুই রূপের, দুই অপরূপ ফুল ফুটবে। প্রকৃতির নিয়ম পালটে যাবে পরমা প্রকৃতির নির্দেশে।

তুলসীর কাব্য-জীবনের বাণী ঃ দয়া ধরমকী মূল হেঁয়, তুলসীর জীবন-কাব্যের বাণীও নিঃসংশয়ে!

কাশীর অতি দীন-ব্রাহ্মণ এসে কেঁদে পড়ে তুলসীর দু'-পায়; উদ্দেশ্য দাঁড়াবার, মাথা গোঁজবার জন্যে তার এক টুকরো জমির উপায়। রাম নামে রত তুলসীদাস গঙ্গাকে বলেন নিরুপায়ের উপায় হতে। গঙ্গা সরে যান তীর থেকে। মুক্ত জমি পায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ সাধকেরই সাহায্যে। এই একবার নয়; বার-বার। চিত্রকূটেও তাঁর দেওয়া দারিদ্র্য-হর কবচে এক চিরদরিদ্রের দুঃখ মোচন হয় অচিরেই।

[ভারতের সাধক ঃ তৃতীয় খণ্ড]।

জীবনকাব্য এবং কাব্যজীবনের সাধনায় অভিন্ন অপরাজিত তুলসীদাসের রামায়ণকে না জানলে কাশীকে জানা যাবে না। রামায়ণ আর মহাভারতের দেশ এই ভারতবর্ষ, তার আত্মার স্থূলমূর্তি এই কাশী। ট্রেন থেকে নেমেই কানে আসবে পূজাধ্বনির; শঙ্খ-ঘণ্টা কাঁসরের। তার অলিতে-গলিতে, গংগার ঘাটে-ঘাটে চলেছে রামায়ণ-পাঠ; রামায়ণ কথা। সেই রামায়ণ-পাঠের উচ্চারণ শাস্ত্রসম্মত কি না জানি না; তার ব্যাখ্যা পণ্ডিত-সংগত কি না, তা-ও না। শুধু জানি, এর উৎস অনাদিকালের ভারত-জিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসার উত্তর জ্ঞানে নেই; নেই বিজ্ঞানে। আছে। রাম-গানে। এই গানের সুর অবিশ্বাসের অসুরকে বলে বার-বার: সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ! বিদেশী পর্যটকও বিস্মৃত হননি সে বার্তা:

'You may spend hours on the ghats and in the streets and temples watching the old-world customs and the simple faith of the common people, who, however misguided, show an earnestness and deep religious feeling which many conventional christians might study with advantage.'

[Benares, the sacred city: E. B. Havell.]

এই কাশী সেই কাশী যেখানে 'অন্বেষণের' পালা আজও শেষ হয় নি; 'অশেষ'কে অন্বেষণের।

॥ উনিশ ॥

রামায়ণ আর মহাভারতের দেশ এই ভারতবর্ষ ; কাশী সেই অনাদিকালের ভারতাত্মার প্রাণময় প্রতীক। ট্রেণ যত কাশীর কাছাকাছি হয়, তত খসে পড়তে থাকে দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ। মোসাহেবরা তত হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট ছেড়ে সুরু করে দেশী পোষাক পরতে। হ্যাভেল সাহেব তারই ছবি তুলে ধরছেন তাঁর Benares, the Sacred City গ্রন্থে :

'Europeans, and the great majority of Hindus, now come to Benares by the railway. It is amusing to see sometimes at Mogul Sarai, the Junction for the East Indian line, how the up-to-date Indian arriving from Calcutta, Bombay or some other large Anglo-Indian City, will in an incredibly short time divert himself of his European Environment and transform himself into the orthodox Hindu.'

ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের এই সব সাহেবি পোষাক পরা মোসাহেবের, ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের দল ভারতাত্মা কাশীর পরিচয় পায়নি কোনও দিন। এরা কাশী বলতে কেউ বোঝে বেনারাস ক্যাণ্টনমেণ্ট ; কেউ রাবড়ি, মালাই ; কেউ জর্দা-বেনারসী ; কেউ বাঈজী-বাজনদার ; কেউ স্থাপত্যবিদ্যা, সূক্ষ্ম কারুকার্য পিতলের ওপর। এরা বিশ্বনাথের মন্দিরে যায়, যেখানেই দেখে দেবদেবীর মূর্তি সেখানেই মাথা ঠোকে, পয়সা ছুঁড়ে দেয় বিধবা, প্রত্যাশী বা পাণ্ডার উদ্দেশে, শিবের মাথায় বেলপাতা চাপায়, নিজের কপালে তিলক আঁকে, উন্মুক্ত বক্ষদেশে চন্দন লেপে। কলকাতায় ফিরে এসে ছমাস ধরে এক কথা বলে বেনারস ঘুরে এলাম ; গ্যাঞ্জেস ইভনিং-এ বোটে করে ঘোরা, হাউ লাভলি !

আর আসে বিদেশী পর্যটকের দল ; জেট্টিং পাইলট। এক মাসে পৃথিবী ভ্রমণের পথে ভারতবর্ষে নামাতেই হয় একবার উড়ো পা-কে। কারণ ভারতবর্ষ তাদের ছেলেবেলা থেকে কল্পনার চোখে দেখা। সে দৃষ্টিতে এদেশ হচ্ছে সাপুড়ে আর ভোজবাজির দেশ, দরিদ্র, অশিক্ষিত, আর বিপুল বিত্তবান বোকা রাজরাজড়ার খামখেয়ালের তুঙ্গস্থান ; এখানে শহরের রাস্তায় দিনের বেলায় বাঘ বেরোয় ; এরা গোরুকে ভগবতী বলে এবং পুতুলপূজো করে প্রায় সবাই। এই ভারতবর্ষ দেখতে আসে এই মন নিয়ে, কাজেই দেখবার সময় চোখ খোলে না এদের ; দেখবার পর বইতে যা লেখে, তা ভারতবর্ষ দেখবার আগেই, অনেক আগে থেকেই কল্পনার রংলাগা চোখে যা দেখে আসছে ছেলেবেলা থেকে, তারই পুনরাবৃত্তি হয় ছাপার অক্ষরে :

Time passed. The serpent went on nibbling imperceptibly at the Sun. The Hindus counted their beads and prayed, made ritual gestures, ducked under the sacred slime, drank, and were moved on by police to make room for another instalment of the patient million. We rowed up and down, taking snapshots. West is West.

Inspite of the serpent, the sun was uncommonly hot on our backs. After a couple of hours on the river, we decided that we had enough, and landed. The narrow lanes that lead from the ghats to the open streets in the centre of the town were lined with beggars, more or less holy. They sat on the ground with their begging bowls. By the end of the day the beggars might, with luck, have accumulated a quare meal. We pushed our way slowly through the thronged alleys. From an archway in front of

us emerged a sacred bull. The nearest beggar was dozing at his post—those who eat little, sleep much. The bull lowered its muzzle to the sleeping man's bowl, made a scouring movement with its black tongue and a morning charity had gone. The begger still dozed. Thoughtfully chewing, the Hindu totem turned back the way it had come and disappeared.'

—Aldous Huxley'

ওয়েষ্ট ইস্ ওয়েষ্ট নেই আর। ওয়েষ্ট এখন Waste-এর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে East-এর দিকে, ইষ্টের প্রতি লক্ষ ঘোরাচ্ছে। ইষ্ট ইস নট ইষ্ট আর। EAST এখন নিজের ইষ্টবিস্মৃত ; Waste অভিমুখী চিন্তা গ্রাস করছে EAST-কে, তার ইষ্টকে ক্রমশঃই।

এই দৃষ্টি নয়। এ দৃষ্টি দিয়ে অনাদিকালের এই ভারতবর্ষকে দেখা যায় না ; এ দৃষ্টিতে অদৃশ্য থেকে যায় ভারতাত্মা কাশীর দুঃখ-দারিদ্র্য, মৃত্যুমহামারী, অশিক্ষা, কুসংস্কার-এর অন্ধকার আড়ালে সে ভারত প্রথম এই পৃথিবীর কানে উদাত্ত আশ্চর্যকণ্ঠে বলেছিল ঃ শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ,—সে ভারতকে দেখেছেন বিবেকানন্দ। রুদ্র, দীপ্ত, প্রভঞ্জনের মত বয়ে গেছেন ভারতবর্ষের বুকের ওপর দিয়ে। খাপ খোলা এই বাঁকা তলোয়ার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,—প্রত্যক্ষ করেছেন সেই দৃষ্টিতে, যে দৃষ্টিতে সামনে দারিদ্র্যের আর ঐশ্বর্যের আবরণ হয়েছে উন্মুক্ত। পাশ্চাত্য দেশ নিয়ে গেছেন অমৃতের বাণী। প্রাচ্যের কানে শুনিয়েছেন আলস্য ত্যাগের আহ্বান। পাশ্চাত্যকে দিয়েছেন ধর্মের, প্রাচ্যকে কর্মের মন্ত্র। দেশকে জেনেছেন, বইয়ের পাতায় নয়, মানচিত্রের বিচিত্র রংএর হিজিবিজিতে নয়। পায়ে হেঁটে, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তর পর্যন্ত মহা-মানবের সাগরতীরে ঘুরে বেড়িয়েছেন এক মহত্তম মানব। রাজার প্রাসাদ থেকে পর্ণকুটীর পর্যন্ত ; শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ থেকে অশিক্ষিত

ইতরদের মধ্যে; দ্বিজোত্তম থেকে বর্ণাধম,—সকলের কাছে গেছেন ভারতবর্ষকে জানতে। জ্ঞানে জেনেছেন, ধ্যানে জেনেছেন; ধনে জেনেছেন, নির্ধনে জেনেছেন, বিজ্ঞানে জেনেছেন, গানে জেনেছেন; প্রাণে জেনেছেন সুখদা মোক্ষদা মাতৃভূমি মোক্ষভূমি, কবির আর প্রেমীর, ধ্যানী ও কর্মীর, জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর এই ভূমিকে,—কিন্তু সবার উপরে, সবার 'পরে ভূমির নয়।

যে ভারত, ভূমার যে ভারতভূমি তাঁকেই জেনেছেন বিবেকানন্দ। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দুই ভূমিকেই জেনেছেন বলেই, ভারতকে ডেকে বলতে পেরেছেন, হে ভারত ভুলিও না……! ভারতবর্ষকে, অনাদি-কালের ভুবনমনোমোহিনী ভারতবর্ষকে তিনি তার আদর্শ বিস্মৃত হতে বারণ করেছেন। সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীকে না ভুলতে বলেছেন; কারণ তাঁরাই ভারতীয়াদের আদর্শ। পাশ্চাত্য দেশকে নেড়েচেড়ে ঘেঁটেঘুঁটে ওলটপালট করে দেখে এসে বলেছেন বিবেকানন্দ যে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে বর্তমান ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। শঙ্কর চেয়ের অনেক কঠিন এই নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর মধ্যেই শেষ-বারের মত, অশেষবারের মত জ্বলে উঠেছে ভারতাত্মার জ্যোতির্দীপ্ত জয়বাণী। ভারতবর্ষের পথ আর পাশ্চাত্যের পাথেয় সম্বল করে হওয়া যায় না পার। কারণ ক্ষুরের চেয়ে দুর্গম এই পথ চলেছে মানুষকে নিয়ে ভূমি থেকে ভূমায়; অন্ধকার থেকে আলোয়। দুঃখের বন্ধুর যে পথে গেছে মৃত্যুহীন আত্মার সারথ্যে মরদেহের রথ যে পথ ধরে গিয়ে পৌঁছেছে মোক্ষের দ্বার প্রান্তে। এই পথেই বারবার দেখা দিয়েছেন তাঁরা যাঁদের শক্তি সাধনার মধ্যে দিয়ে নিরাসক্তির আরাধনা। বুদ্ধির ক্ষেত্র থেকে বোধির ক্ষেত্রে নিত্য বিরাজ সেই ভগবানের দূতেরা বার-বার বলেছেন: ভূমিতে সুখ নেই; সুখ ভূমায়!

বুদ্ধির বিচারে রাম তাই ভিখারী রাঘব; বোধির আলোকে শ্রীরাম হচ্ছেন, 'কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক।' স্ত্রী স্বাধীনতার ঝাণ্ডাধারীদের দৃষ্টিতে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী নয়

আদর্শ। কারণ তারা স্বামীকে পরিত্যাগ করেনি ; আদালতে মামলা রুজু করেনি ; বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা ! অনায়াসে এ মামলা করা যেত, কারণ নববিবাহিতাকে বনে যেতে বাধ্য করা পিতার কথা রাখতে এর চেয়ে ক্রুয়েলটি আর কি হতে পারে 'উওম্যান ইম্যান-সিপেসানের মানদণ্ডে !' কিন্তু স্ত্রী যে কেবল স্ত্রীলোক মাত্র নয় ; সহধর্মিণীও সে,—এ বার্ত্তা ভুলবে কি করে জন্মমুহূর্তে বলি প্রদত্ত যে 'ভারত'-এর কাণে এই বিবেক ও আনন্দযুক্ত অবিনশ্বর বাণী স্মরণের অতীত কাল থেকে বারম্বার উচ্চারিত যে, সুখের জন্যে বিবাহ নয়।

বিবেকানন্দ এই চিরন্তন ভারতের বাণী মূর্তি ; আর কাশী সেই জন্মমৃত্যুর অতীত ভারতাত্মার স্থূল প্রকাশ।

এক হিসেবে এই কাশীর চেয়ে দুর্গম, কাশীর চেয়ে রহস্যাচ্ছন্ন আর কিছু নেই ভারতভূমিতে। কাশীর বহিরঙ্গে পৌঁছতে, ট্রেণে করে একটা রাত ; উড়োজাহাজে গেলে কয়েক ঘণ্টা। কিন্তু কাশীর অন্তরের অন্তঃপুরে পৌঁছতে কোটি বছরও কিছুই না ! কোটিকে গোটিক, ভাগ্যবান কেউ কাশীতে সেই ভারতাত্মাকে প্রত্যক্ষ করে। কাশীর ইতিহাস,—তার ঘাটে, তার আরতির আলোয়, শংখ-ঘণ্টা-ধ্বনিতে, ধর্মের ষণ্ডের সঙ্গে অধর্মের পাষণ্ডের গলাগলি করা অসংখ্য অন্ধকার গলিতে শুধু লেখা নেই ; কাশীর ইতিহাস সেই কোটিকে গোটিক যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন অপ্রত্যক্ষকে, যাঁরা স্পর্শ করেছেন স্পর্শের অতীতকে, অজরা, অমরা অবাঙমানসগোচরের দিব্যানুভূতিতে যাঁরা চিরদীপ্ত তাঁদের ইতিহাসই ভারতাত্মা কাশীর ইতিবৃত্ত।

'কোটিকে গোটিক' এমন একজনের কথাই আজ বলতে বসেছি যাঁর কথা না বললে কাশীকাণ্ড অসম্পূর্ণ থাকে কাশীর জীবনে তাঁর জীবন এবং তাঁর জীবনে কাশীর জীবনে অবিচ্ছেদ্য যুক্ত। তিনি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বিজয়কৃষ্ণের প্রথম জীবন, রবীন্দ্রনাথের সেই গান : দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—।

শুধু বিজয়কৃষ্ণ কেন ; সব সাধকেরই প্রথম জীবন কেঁদে ওঠে

রবীন্দ্রনাথের কথায়ঃ আমার সুরগুলি পায় চরণ আমি পাইনে তোমারে। ঠাকুর কেঁদেছিলেন, রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমাকে দেখা দিবি না মা ?—বলে ; বালকের বেশে নবদূর্বাদলশ্যাম শ্রীরাম যখন 'সকল শ্রীরাম অবতারা' বলে, প্রভুর জন্যে চন্দন ঘর্ষণরত তুলসীদাসকে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যান তখন তুলসীও কেঁদে ওঠেন ; সেই কান্না গাঁথা আছে কাব্যের অক্ষরে ; শ্লোকের হীরা পান্নায় তুলসীদাস চন্দন ঘসৈ তিলক দেই রঘুবীর !

অনন্তের জন্যে অন্তের, অসীমের জন্যে সীমার, মুক্তের জন্যে বদ্ধের কান্নাই বিজয়কৃষ্ণের জীবন ও বাণী।

সেই আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে ধরায় এসেছিলেন এই এক মুক্তি পাগল ভক্তিসিদ্ধি,—যে আলো আমরার ; যে আলো অধরার। লৌকিক জগতে অলৌকিক শক্তিরা আসেন দিব্য কর্তব্যের কারণে। বিজ্ঞান বলে বিরাট পুরুষেরা যখন পৃথিবীর নানা প্রান্তে আসেন তখনই যখন তাঁদের ঐতিহাসিক প্রয়োজন থাকে। বিজয়কৃষ্ণ যখন বঙ্গদেশে আবির্ভূত হন তখন একটি নতুন আন্দোলনের জন্ম ও জয় যাত্রারম্ভ হয়েছে যার নাম ব্রাহ্মধর্ম। উনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগরণের ঢেউ যখন ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মত করেছে ভারতীয় সাধনাকে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে হিন্দুধর্মের কেতন শূন্যে ওড়াতে নতুন করে। আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন রামমোহন প্রদর্শিত পথে চালনা করছেন ভারতীয় সত্য দর্শনের আর একটি বিজয়রথ যার বাণী হচ্ছেঃ 'বেদান্ত প্রতি-পাদ্য সত্যধর্ম।'

প্রতীচ্যের সঙ্গে প্রাচ্যের সাক্ষাৎ সংঘর্ষে ধর্মজগতে উন্মাদনা এসেছিল। এসেছিল উন্মত্ততাও! একদল উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষ বিদেশী শিক্ষাগুরুর প্রভাবে মদ্য ও গোমাংস আর ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখার পথ ধরে উঠল গীর্জায়। তারা হল খৃষ্টান। যা কিছু সাহেবের তাই উত্তম বলে গ্রহণ করল কিছু মোসাহেবের দল। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রয়োজন ছিলো এমন একজনের যিনি কেবল ৺কালীর

কথা শোনাতে পারেন যে তাই নয়, যিনি দর্শন করাবার ক্ষমতা রাখেন ৺কালীকে। সেই এক জনই, দিব্যানুভূতির প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদীপ্ত পুণ্যবান শ্রীরামকৃষ্ণ। এরই মাঝে তরঙ্গ সংঘাতে তুলে উঠলো আর একটি দ্যুতি যার নাম রামমোহন। যাঁর সত্যানুসন্ধান বৃত্তি প্রতিমার মধ্যে খুঁজে পেল না ঈশ্বরকে, কিন্তু বেদান্তের মধ্যে খুঁজে পেল তাঁকে জ্যোতির্ময় নিরাকার যিনিই একমাত্র সৎ যিনি সত্য।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই আন্দোলনের সব চেয়ে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া।

বিদেশী পর্যটকমাত্রই যে ভারতকে বিকৃত দৃষ্টিতে দেখেছেন, তা নয়। ম্যারিকার সব চেয়ে ম্যারিকান লেখক মার্ক টোয়েন বিদেশী বিকৃতদৃষ্টি পর্যটকদের মধ্যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ভারতবর্ষে এসেছিলেন এই অশ্রুসিক্ত হাস্যরসের অফুরন্ত নির্ঝর; গভীর বেদনার রঙে রাঙা যার সুগভীর আনন্দের রামধনু সাহিত্যের আকাশে চিরন্তন মহিমায় বারে বারে দেখা দিয়েছে সাহিত্যের সেই ট্রাজিক কমিডিকার মার্ক টোয়েন এসেছিলেন মহামানবের সাগরতীরে, পৃথিবী পর্যটনের পথে! তখনকার ইংরেজি কাগজ এই তরবারির চেয়ে তীক্ষ্ণ কলমের অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; ভারতবর্ষ দেখবার পর ভারতবর্ষের কে বা কি তাঁকে আশ্চর্য করেছে, অভিভূত করেছে সব চেয়ে বেশী তারই খবর করতে। বন্ধুকৃত্য করতে বদ্ধপরিকর, ঋণগ্রস্ত মার্ক টোয়েন জীবনের অপরাহ্ণে বেরিয়েছেন তখন দেশে দেশে বক্তৃতা দিয়ে উপার্জন করতে; ঋণমুক্ত হতে। ব্যঙ্গের ছদ্মবেশে মানুষের প্রতি সীমাহীন সমবেদনার উৎস এই মানুষটির কাছে নতুন কিছু শোনা যাবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই আশাতেই দৈনিকপত্রের প্রতিনিধি গিয়েছিল যাঁর কাছে তিনি রাজার বিদূষক নন; বিদূষকের রাজা। কৌতুকোচ্ছল বেদনার নীলাঞ্জন ছায়া মাখানো দুটি চোখে সেদিন যা পরমাশ্চর্য বলে মনে হয়েছিল তা ভূস্বর্গ কাশ্মীরের হ্রদে নৌকা বিহার নয়; নয় পাথরের বুকে প্রেমের কবিতা তাজমহল।

একটি উলঙ্গ মানুষ,—এই নগ্ন সত্যের উদ্‌ঘাটনকারী প্রতিভার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল ভারতবর্ষের পরমাশ্চর্য। পরম পবিত্র। পূত এক অভিজ্ঞতা বলে।

সেই আকাশ-গঙ্গার মতো নির্মম নগ্ন পরমাশ্চর্য ভারতীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় কাশীতেই; যার সন্ন্যাস-নাম ঃ ভাস্করানন্দ সরস্বতী।

আমি আগে বলেছি যে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা না বললে কাশীকাণ্ড অসম্পূর্ণ থাকে; এখন বলছি আরেক জনের কথা যাঁর কথা না বললেও কাশীকাণ্ড সম্পূর্ণ হয় না। তিনিই বিদেশী পর্যটকের বিস্ময়। ভাস্করানন্দ স্বামী। কাশীর কথা অনেকের কথাই; আবার তার মধ্যে বিশেষ যাঁদের কথা এঁরা দুজনই তাঁদের অন্যতম।

এবং কাশীতে এই দুই সিন্ধুগামী নদের সাক্ষাৎ হয়েছে; জন্ম নিয়েছে সেই মুহূর্তে জীবন গঙ্গা-যমুনার প্রয়াগ; যাঁরা সেদিন এই সাক্ষাতের সময়ে উপস্থিত ছিলেন। সেই সৌভাগ্যবানদের প্রয়াগের পুণ্যবারিতে অবগাহন সার্থক হয়েছে তদ্দণ্ডেই।

এই দুজনের কথাই এখন বলব।

॥ কুড়ি ॥

দূরের বন থেকে তুরন্ত হাওয়ায় ভেসে আসে মাতাল করা সুবাস। মৃগনাভির গন্ধে মাতাল মৃগ জানে না যে দূরের নয়; নিকটের। নিজের সঙ্গেই সে বহন করছে সেই অনঙ্গকে। সুরভিমাখা নাভিদেশ তার; সবাই জানে। জানে না শুধু যে তার ধারক, সে। মানুষ এই মৃগনাভির গন্ধে মাতাল মৃগের মতোই 'ক্ষ্যাপা; খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর'। সেই পাথর যার স্পর্শে তামা হয়ে যায় সোনা, রত্নাকর হয় বাল্মীকি, জগাই-মাধাই হয় উদ্ধার; তার উৎস যে মানুষের মধ্যে থেকেই হয় উৎসারিত,—নির্বোধ মানুষ তার খবর রাখে না। তাই সে বনে যায়, এক মনে বসে যায় গাছের তলায়, পথের ধূলায় মধ্যদিনে যখন গান বন্ধ করে পাখী তখন যে রাখালের বেণু বাজে তার দেখা পাবে বলে। সাধনায় গলে যায় পাষাণ; দেখা দেন কখনও শংখচক্রগদাপদ্মপাণি; কখনও কংসবধের কারণে নৃসিংহ মূর্তি। কখনও নৃমুণ্ডমালিনী নগ্না; ভয়ংকর বেশে অভয়ংকরের ধ্যানমগ্না। দেখবার পর ধ্যানভঙ্গ হয় সাধকের। সে বলে, একি, একে তো অনন্ত কাল ধরে বুকের মধ্যে দেখে আসছি। তবে কি মানুষের মনই সেই অবাঙ মানসগোচরের মন্দির!

তা-ই। সত্যই তা-ই। এই একমাত্র সত্য।

যিনি অসীম তিনিই সসীম। যিনি অনন্ত তিনিই অন্ত। যিনি নশ্বর তিনিই অবিনশ্বর। যিনি মর তিনি অমর। যিনি পরমাত্মা তিনিই জীবাত্মা। উপনিষদ তাঁকে প্রত্যক্ষ করে বলছে, পরমাত্মা আর জীবাত্মা, দুটি পাখীর মতো। ডানায়-ডানায় যুক্ত তাদের একজন পিপ্পল আস্বাদ করছে; অনাহারী আরেক জন অনাসক্ত, শুধু তার সাক্ষী। মানুষের মধ্যেও একজন চাকরি করছে, মামলা করছে, বাড়ি করছে, গাড়ি করছে; ছেলে চাকরি পেলে ডিনার

দিচ্ছে ; ছেলের কিছু হলে মাথা খারাপ করছে ভেবে ভেবে। আরেক জন সে কিছুই করছে না। সহস্র লোকের ভীড়ের মধ্যে দেবালয়ে অনালোকিত অন্ধকারে অনন্ত কাল ধরে যিনি অপেক্ষা করছেন মূর্তির মধ্যে মূর্ত সেই দেবাদিদেবের মতো মানুষের মধ্যে সেই আর একজন ওই একজনের মতোই অনিত্যের মধ্যে নিত্য। যিনি নূতন নন ? নন পুরাতন। যিনি অপরিবর্তনীয় সেই অসীমের কৌতুক এই সসীম।

সকল কালের সকল মানুষের মধ্যে নয় কেবল ; জড়ে এবং চেতনে, পদার্থে এবং অপদার্থে জীবাত্মার বাস এবং পরমাত্মার উপবাস কেবল প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরাই যাঁরা বলতে পেরেছেন সময়ের সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে সৃষ্টির উষাকালে ঃ নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায় !

লোকে বলে, স্ত্রীলোকেও বলে ঃ প্রমাণ চাই ; প্রমাণ দাও !

কি প্রমাণ চাও তুমি ? আর কি প্রমাণ দেব অন্ধকে যে আশ্বিনের নিঃসীম নিরুপম নীলে, মৃগনাভির গন্ধে মাতাল অনিলে প্রমাণ মেলে না তাঁর ? কি প্রমাণ পেলে না তাঁর ? কি প্রমাণ দেব তাকে, যে হতভাগ্য মহামারী, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লবে তাকিয়ে দেখল না সেই অভয়ংকরকে ভয়ংকরবেশে ? প্রতি অণুতে সে পরমকে দেখল না, পরমাণু তার বিপজ্জনক বোমা আর কি !

এই লোকেই, এই স্ত্রী-লোকেই ডাক্তারের কাছে প্রমাণ চায় না। ডিগ্রি আর ষ্টেথিসকোপ দেখেই তুলে দেয় ছেলের জীবন-মরণ তার হাতে। অসুখ সারলে বলে ধন্বন্তরী ; অসুখ না সারলে বলে, ভগবান কি নিষ্ঠুর। এরাই ভক্তের কপালে চন্দনের তিলক দেখলে বলে ভণ্ড। ডাক্তার সারাতে না পারলেও তার ফি দেয় ; কিন্তু দেবার পরেও যদি পুত্র না বাঁচে তাহলেই কালাপাহাড়ের মতোই করতে চায় সব লণ্ডভণ্ড !

এইসব ভাগ্যনিহতেরা জানে না যে, যে বাঁচাতেও পারে না, মারতেও পারে না, সে-ই হচ্ছে ধন্বন্তরী, যে বাঁচায় এবং মারে সে-ই হচ্ছে শ্রীহরি !

চারশো ভোল্‌ট মাত্র বিদ্যুত-বিচ্ছুরণ যেখানে সেখানে মড়ার মাথা-আঁকা সতর্কবাণী : সাবধান ! ছুঁইলেই মৃত্যু ! ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হাতে নন-কণ্ডাক্টর বর্ম পরে ; কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করে ভয়ে ভয়ে। অথচ মানবদেহ যা সেই দেবালয়ের প্রদীপ, সেই দুর্লভ দেহকে মানব গঠিত করছে না অনির্বচনীয়ের আবির্ভাবের জন্যে। বরং বলছে পণ্ডিত মূর্খের দল, যে যিনি দেহাতীত, দেহের সংঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি ? না। যিনি দেহাতীত, তিনি দেহেই স্থিত আবার। এবং এই দেহ কেবল রতি-র জন্যে নয় ; মানব দেহ অনির্বচনীয়ের আরতির দেহকে না বাঁধলে দেহাতীতের সে তার যে বাজে না ! রমণের আস্বাদের চেয়ে পরার্দ্ধগুণ শিহরণ যাতে সেই রমণীয়ের আস্বাদ অযোগ্য দেহে বহন করবে কে ?

বিবেকানন্দ যখন নরেন, তখন রামকৃষ্ণ-স্পর্শে কেঁদে উঠেছিলেন তিনি : আমার মা আছে ; ভাই আছে। সংসার আছে। এ কি করলে তুমি ? রামকৃষ্ণ সংবরণ করেন শক্তি মুহূর্তে ; সেই শক্তি যা নরদেহ সহ্য করতে পারে না। পারে কেবল নরেন্দ্রর বীর্য-অক্ষয় দেহ বরণ করতে ; বরণ করতে পারে যে মনোহরণকে !

এবং তখনই পারে কেবল, যখন সে দেহ হয় নিঃসন্দেহ-নিষ্পাপ !

সেই লৌকিক জগতে অলৌকিক বলি আমরা যাকে, আমরা যারা কেউ নানা মত, নানা পথভ্রান্ত, জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুমান প্রমাণ-মান-অভিমান-তর্ক-বিচার-বিশ্বাস-অবিশ্বাসের গোলকধাঁধায় উদ্‌ভ্রান্ত তাদের প্রয়োজনে তিনি আসেন না। তিনি আসেন তাঁর নিজের প্রয়োজনে। কংসের যখন সময় হয়, আমাদের নির্বোধ বিচারে যা দুঃসময় তখন মেলে কৃষ্ণের দর্শন ! নৃসিংহমূর্তিতে ভয়ংকরের বেশে হয় অভয়ংকরের আগমন। পার্থ যখন গাণ্ডীব ফেলে দেন মিথ্যা অহংকারে, তখন হুঙ্কার দেন পার্থসারথি ! মামেকং শরণং ব্রজ ! দুঃখের বরষায় চক্ষের জল নামলে আসেন তিনি ; বক্ষের

দরজায় থামে বন্ধুর রথ। দ্রৌপদী যতক্ষণ কাপড়ের প্রান্ত চেপে ধরে আছে ততক্ষণ নয়; যতক্ষণ না উর্ধ্ববাহু হয়ে বলছে কৃষ্ণসখা হা কৃষ্ণ! ততক্ষণ দেখা নেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাণির!

আবার 'পরধর্মো ভয়াবহ স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়।' বলবার জন্যে এই পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে তাঁর উদয় দেখেছি আবার কতবার! রামের বেশে আসেন যিনি রাবণ উদ্ধারে; নৃসিংহের বেশে হিরণ্যকশিপু-মুক্তির কারণে; শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হয়ে আসেন যিনি চৈতন্য দিতে অচৈতন্যকে, তিনিই আসেন আবার রামকৃষ্ণ হয়ে, কৃষ্ণের কথা রাখতে, 'সম্ভবামি যুগে যুগে!' যুগে যুগে তাই সম্ভব হয় অসম্ভব, অসম্ভব হয় সম্ভব! যখন মনে হয় বৌদ্ধধর্ম ভাসিয়ে দিয়ে যাবে ভারতবর্ষকে; আসমুদ্র-হিমাচল যখন কেঁপে ওঠে, কেঁদে ওঠে: বুদ্ধং শরণ গচ্ছামি। তখন আসেন মুণ্ডিতমস্তক মহাযোগী দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণপাণিতে নিয়ে অদ্বৈত ঐশ্বর্য, আসেন শংকর! চির পুরাতন মন্ত্র চির নূতন কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ভুবনমনোমোহিনী ভারতবর্ষের পথে প্রান্তে; কিং করোমি ক্ক গচ্ছামি, কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিম্।

ঠিক এমনই আবার আরেক দিন যখন মনে হয়েছিলো খৃষ্টধর্ম ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ভারতভূমি, যখন মনে হয়েছিলো, হিতবাদের অবিত, জড়বাদের অবিশ্বাস নড়িয়ে দেবে ভারতের বিশ্বাসের ভিতকে তখন এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে রাম এবং কৃষ্ণ একাধারে যিনি রামকৃষ্ণ শুধু এই বিবেকানন্দময় বাণী গুঞ্জরণ করতে কুম্ভ-কর্ণে যে ভারতবর্ষ কেবল ভূমির নয়; ভূমার।

বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিলে রাত্রি প্রভাত হবার আগেই ভারতের বিশ্বাসের প্রভাত আবার অবিশ্বাসের অমারাত্র হয়ে দিলো দেখা! শ্বেতদ্বীপ থেকে যারা এলো শাসনের নামে শোষণ করতে তারা আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং ধর্মকে আঘাত করলো। অল্প ব্যয়ে, সামান্য জঙ্গীশক্তি সম্বল করে রাজত্ব করবে বলে এত বিরাট দেশের ওপর, তারা দেখল সব চেয়ে সহজ রাস্তা

হচ্ছে ভারতীয়দের মনে নিজের দ্বেষ সম্পর্ক বিদ্বেষ জাগানো। ইংরেজি শিক্ষা, ইরেজি চাল, সাহেবদের মোসাহেবে পরিণত করে তুলল দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষাকে। আশার ছলনে ভুলে ভারত হলো 'ক্যাপটিভ লেডি' সে প্রকাশ্যে বললো : ইংরেজীতে বলো, ইংরেজিতে লেখো, স্বপ্ন দেখো যদি, তাও দেখো ইংরেজিতে।

স্বপ্নের নয়; উনবিংশ শতাব্দী স্বপ্নের যত তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃস্বপ্নের কাল!

সেই সময়ে, সেই দুঃসময়েই এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। একা নয়; একের পর এক এলেন তাঁরা। রামকৃষ্ণ থেকে বিজয়কৃষ্ণ সেই, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'-র প্রতিশ্রুতি রাখতেই, পরিশ্রুত রাখতে স্মরণের অতীত কাল থেকে অবিস্মরণীর অবিনাশী বিশ্বাস : নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে ঢেউ এসেছিলো; নবজাগরণের ঢেউ; পুরাতনের সঙ্গে নবীনের প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চত্যের, ভক্তির সঙ্গে যুক্তির ভাববিরোধের যুগসন্ধিক্ষণে এসেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। সন্ধি করতে আসেননি; এসেছিলেন যুদ্ধ করতে! মিথ্যার সঙ্গে যুদ্ধ; যুদ্ধ কুসংস্কারের সঙ্গে! কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ-বিজয়ী কৃষ্ণের মতোই এ যুদ্ধেও জয়লাভ করেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ!

কি পরিমাণ যুদ্ধ তাঁকে সেদিনকার সমাজের সঙ্গে করতে হয়েছিলো; শুধু সমাজের সঙ্গে কেন, আত্মীয়র সঙ্গে, 'আত্ম'-র সঙ্গেও। তারই পরিচয়ে এই দিব্যজীবন, এই দীপ্ত, উদ্দীপ্ত জীবন আদ্যন্ত প্রদীপ্ত।

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত বিজয়কৃষ্ণ উপবীত ত্যাগ করেন এক সময়ে। আত্মীয়-পরিজনরাও তাঁকে ত্যাগ করেন প্রায়। কিন্তু তাতে বিচলিত হবার পাত্র নন বিজয়কৃষ্ণ। কিন্তু মাঝে মাঝে মূর্তিতে অবিশ্বাসীর মনে নতুন করে বিশ্বাসের জন্ম দিতে যখন স্বয়ং গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর আবির্ভূত হন সম্মুখে তখনও কোন্ ধর্ম, কোন্ শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে অস্বীকার করেন তাঁকে। এবং শ্যামসুন্দরও আশ্চর্য সুন্দর! তিনি

বেছে বেছে তাকেই কি দেখা দেবেন যে তাঁর দেখা পেলেও বলবে, এ দেখা ঠিক দেখা নয়, তার সঙ্গেই কি যত কথা তাঁর, যে তাঁর কথা শুনেও বলবে, এ শোনা খাঁটি সোনা নয়!

সারাদিন তৃষ্ণায় জল দেয়নি শ্যামসুন্দরকে। সেই তৃষ্ণার বার্তা স্বয়ং শ্যামসুন্দর তোলেন বিজয়কৃষ্ণের কানে। বিজয়কৃষ্ণ যখন সে কথা বাড়ীর কর্ত্রীর কানে তুললেন, তখন তিনিও প্রথমে অবিশ্বাস করেন; পরে আবিষ্কার করেন বিজয়কৃষ্ণের কানে শ্যামসুন্দরের অভিযোগ সত্য!

তাই পরবর্তী জীবনে একদিন কাশীতে ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণকে তাঁর গুরুদেব পরমহংসজী বলেছিলেন: এসব খোলস সময় হলেই খসে যাবে!

খসে গিয়েছিলো বিজয়কৃষ্ণের অলৌকিকে অবিশ্বাস! ধ্বসে গিয়েছিলো যুক্তির অচল পাহাড়; ভক্তির যুক্তধারা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো অহং-এর অচলায়তনকে। ঈশ্বর নির্দিষ্ট পুরুষ বহু মত, বহু পথের শেষে যেখানে এসে পৌঁছলেন, সেখানে ব্রাহ্ম বা হিন্দু নেই; আছে কেবল ব্রহ্ম। নদী যত পথেই ঘুরে আসুক তার মৃত্যু, তার মুক্তি ওই সিন্ধুতেই। বিজয়কৃষ্ণ হিন্দু না ব্রাহ্ম কি ছিলেন, কোন্‌টা কত দিন ছিলেন তার চুলচেরা হিসাব জানি না; জানি কেবল, তিনিও সেই নদী যার জীবনসিন্ধু হচ্ছে ব্রহ্ম!

ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ; বিশ্বাস করেন না প্রতিমায়। মূর্তি ধরে তবু এসে দাঁড়ান শ্যামসুন্দর; বলেন: আমায়-অলংকার গড়িয়ে দিতে বল তোর কাকীকে। তার কাছে টাকা আছে। অলংকার উপলক্ষ্য মাত্র: লক্ষ্য,—বিজয়ের অহংকার চূর্ণ করা! অবিশ্বাসের অহংকার। বিজয় বলেন: আমাকে কেন? কাকীকেই বল না কেন? শ্যামসুন্দর হাসেন: সেই ক্ষমাসুন্দর হাসি: তাকেও বলেছি কাল; জিজ্ঞেস কর কাকীকে। কটি টাকা লুকোনো ছিলো কাকীমার কাছে। লুকোনো রইলো না সেই অর্থ; তাই দিয়ে তৈরী হলো শ্যামসুন্দরের সোনার চুড়ো! কাকীমার লুকোনো সামান্য

টাকা নয় ; বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে লুকোনো অসামান্য ঐশ্বর্য,—তাকেই বাইরে টানছেন শ্যামসুন্দর। সোনার চুড় পরতে চাইছেন না শুধু; বিজয়কৃষ্ণ সেই বিশ্বাসের স্বর্ণ চূড়ায় নিয়ে যেতে চাইছেন তুলে ; দেখাতে চাইছেন চোখ খুলে দিয়ে সে নিখিল বিশ্ব এক বিশ্বনাথের প্রতিমা !

বিজয়ের দিক্ বিজয়ের সেই সুরু। সেই দিগ্বিজয় যা সুরু আছে ; সারা নেই !

নবদ্বীপে জ্বলে ওঠে নতুন দীপ। উপবীত ত্যাগী বিজয়কৃষ্ণকে দেখেন চৈতন্যদাস। বলেন : তোমার ললাটে তিলক আর গলায় কণ্ঠি দেখছি অদূর ভবিষ্যতে !

ঠিকই দেখা যায় ; ঠিকই দেখেছেন চৈতন্যসিদ্ধ মহামানব। স্থূল দুই চোখে দেখলে, শিব তো শ্মাশানচারি, নেশাসক্ত, ভিখারী মাত্র। কিন্তু তৃতীয় দৃষ্টি খুলে গেছে যার সে তো দেখবেই সেই জটা, সৃষ্টির প্রাণগঙ্গাকে সেখানে ধরে রেখেছেন গঙ্গাধর ! তার দৃষ্টি এড়াবে কি করে উমানাথ, সূক্ষ্ম দৃষ্টির সামনে যার আবির্ভূত সেই ত্রিশূল,—সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের পরমাশ্চর্য প্রতীক ! প্রতিমায় বিশ্বাস আর অবিশ্বাস এসে যায় কি, অপরূপের আলো লেগেছে যাঁর চোখের কালোয় তার কলমে তো উচ্চারিত হবেই, 'হে ভয়ঙ্কর ! ওহে শঙ্কর, হে প্রলয়ঙ্কর !'

উপবীত নেই বিজয়গাত্রে ; বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য, শুনে, কালনার ভগবানদাসজী হাসেন : শ্রীঅদ্বৈতেরও বালাই ছিলো না উপবীতের ; শ্রীঅদ্বৈতের সন্তানের নেতৃত্ব যায়নি তাতে ; ব্রাহ্ম সমাজেই গোঁসাই আমার সেই আচার্যপদেই আসীন !

তবু বিদ্রূপ করে কেউ ! জুতো-জামা-পরা আধুনিক আচার্য ! চরমের করুণা-প্রাপ্ত, পরমভাগবত, ভগবানের দাস, ভগবানদাসের চোখে এবার অশ্রুর মুক্তো টলমল করে : নিজের সজ্জা নিজেকে করতে হয়েছে সে গোঁসাইপ্রভুর,—এর লজ্জা তো আমাদের ভাই—[ভারতের সাধক : তৃতীয় খণ্ড]।

চৈতন্যদাস প্রথমে; তারপর এই ভগবানদাস। এঁদের কটি কথায় ঘটে যায় সেই অন্তর্বিপ্লব; কোটি কথায় যা ঘটেনি এতকাল। চাতক শুনতে পায়, মেঘের গুরু গুরু!

'বৈশাখের উদাসী আকাশে অকস্মাৎ আসে ভৈরবের হাঁক।'

শানবাঁধানো কলকাতার পাষাণ হৃদয়ও গলে যায় বিজয়কৃষ্ণের পায়ের তলায়। ছেঁড়া চটি সারাতে দিয়েছিলেন একদিন এক মুচিকে; মেছোবাজার ষ্ট্রীটে। জুতো সেলাই হয়ে গেলে বিজয়কৃষ্ণ পয়সা বার করে দিলেন। তার থেকে দুটি মাত্র পয়সা নিয়ে মুচি গুটিয়ে ফেললো তার ব্যবসার সাজ-সরঞ্জাম; তারপর গুটি গুটি চললো গঙ্গার দিকে। বিজয়কৃষ্ণ অনুসরণ করতে করতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন সেই মুচি জাতিতে ব্রাহ্মণ; মন্ত মহান্ত! রহস্য অবগত হলেন সেই চর্মকর্মেতর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে। মহান্ত বললেন: অতিথিসেবার আগে একদিন খেয়ে ফেলেছিলাম বলে, গুরু বলেছিলেন! তুই কিসেই সাধু! তুই চামার—! গুরু-বাক্য যাতে মিথ্যা না হয় তাই আজও আমি চামারবৃত্তি ত্যাগ করিনি!

সাধু নাগ মশায়কে ঠিক এমনই একদিন বলেছিলেন: কাজকর্ম ছেড়ে দিলি; এখন ন্যংটো হয়ে মরা ব্যাং ধরে খা! পিতৃসত্য পালনের জন্যে শ্রীরামচন্দ্র গিয়েছিলেন বনে; পিতৃবাক্য পালন করতে সাধু নাগ মশাই মুহূর্তের মধ্যে বস্ত্রত্যাগ করেন; উঠোনের ওপর পড়ে থাকা মরা ব্যাং মুখে দেন নিজের!

গুরু-তিরস্কারের মান রাখতে অভিমান ত্যাগ করেন যে চামার তার চেয়ে বড় ব্রাহ্মণ আর কে?

তবু গুরুতে বিশ্বাস হয় না জগদ্গুরুর দর্শনাভিলাষী বিজয়কৃষ্ণর। জগদ্গুরুর কাছে পৌঁছতে হলে গুরু চাই,—একথা তাঁকে বলেন কলকাতার রাস্তায় আরেক সাধু; গুরু হচ্ছে সেই ভিৎ যার ওপর বিশ্বাসের ভিত্তি গড়ে না উঠলে কেউ জগৎগুরুর হতে পারে না প্রত্যক্ষকার।

সেই গুরুর অপেক্ষায় ঘুরে বেড়ান বিজয়কৃষ্ণ ! শ্রীরামপদ স্পর্শের জন্যে প্রতীক্ষা করেন অহল্যা !

ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে যেতেই হয় কাশীতে। বিশ্বপরিক্রমার পরে যেতে হয় বিশ্বনাথ-এর পরিক্রমায়। বিশ্বনাথের ভূমি বারাণসী ; বিশ্বাসের জ্বলন্ত পটভূমিকা ! কাশীতে তখন দুই বিশ্বনাথ ; মন্দিরে অচল আর গঙ্গার ঘাটে সচল বিশ্বনাথ তৈলঙ্গ স্বামী !

সেই অচল বিশ্বনাথের ভূমিতে সচল বিশ্বনাথ কালীর মন্দিরে মূত্রত্যাগ করে বলেন: গঙ্গোদকং ; মা কালীর গায়ে তা ছিটিয়ে বলেন, পূজা !

মূত্রধারায় আর মুক্তধারায় ভেদ জ্ঞান লুপ্ত যেখানে সেই কাশীতে শেষ পর্যন্ত আসতেই হলো বিজয়কৃষ্ণকে ; আসতে হবেই ! বিশ্বের সবাইকেই আসতে হবে আজ অথবা কাল, যৌবনে কিংবা বার্দ্ধক্যে ; এজন্ম বা পরজন্মে জন্ম-মৃত্যুর এই ভূমিতে। বিশ্বের মধ্যে থেকেও যা বিশ্বের ভূমি নয় ; বিশ্বাসের ভূমি, বিশ্বনাথের ভূমি।

॥ একুশ ॥

নিজের দেহখানি তুলে ধরেছেন বিজয়কৃষ্ণ বারবার, দেবালয়ের প্রদীপ করতে হয়েছেন উন্মুখ। সেই দেহ-প্রদীপে ভক্তির তেল হয়েছে ঢালা; জ্ঞানের সলতে রয়েছে পাকানো। তবুও অন্ধকারে জ্বলেনি আলো সেই জ্যোতির্ময়ের। দুরন্ত তৃষ্ণায়, মাতালের মতো জল ভেবে মুখ থুবড়ে পড়েছেন মরীচিকায়। চোখ যায় যতদূর ধূ ধূ করছে বালি আর রোদ্দুর। বালির অথৈ সমুদ্দুর! যাকে মনে করেছেন আলো অনেক দূর থেকে, কাছে গিয়ে দেখেছেন সে আলেয়া। ব্রহ্মোপাসনার মন্দিরে ধরে নিয়ে গেছেন সাধুকে। ব্রহ্মোপাসনা কেমন লাগলো শুধিয়েছেন তাঁকে। সাধু বলেছে: সবই সুন্দর! বেদবাণীও সেই চরমের পরম সুন্দর উক্তি! তবু বিজয়কৃষ্ণের প্রশ্ন নিরুত্তর থেকে যায়: প্রাণের অশান্তি যাবে কি সে! এই অশান্তির বিষের যন্ত্রণা কি সে যাবে বলো? সন্ন্যাসী ব্রাহ্মোপ্রশান্ত হাসি। অনন্ত গগন উদ্ভাসে সেই হাসিতে সীমাহীন বেদনার নীলাঞ্জন ছায়া আর অসীম অনন্তের রৌদ্রাভা মেলেছে ছিটিয়ে দিচ্ছে করুণ-মধুর রামধনুর রং! হাসতে হাসতে বলে সন্ন্যাসী: গুরু ছাড়া কি করবে আর এই গুরুতর সমস্যার সমাধান? আপন গুরুকো পুছো—

গুরুকে মানেন না ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ। জগদগুরু ছাড়া আর করেন না স্বীকার। সন্ন্যাসীকেও বলেন সেকথা। বলা মাত্র অগ্নির মুখে যেন উচ্চারিত হয় আহুতির ভাষা! আগ্নেয়গিরির সম্মুখে আবির্ভূত হয় পাবকবাণী: ইস্‌ ওয়াস্তে সব বিগড় গিয়া! আসমানসে ইমারৎ বনানে কোই নহি সক্‌তা! গুরু করনেই হোগা!

গুরু করতেই হবে তোমাকে! জগদগুরুর কাছে পৌঁছতে হলে! সুরে সুরে তালে তালে যত বাঁধো সেতার, সে তার যাবে ছিঁড়ে! গুরু-ই সেতু তোমার আর তাঁর মধ্যে বিরহের পারাপারে দেখতে

না পাওয়া দুস্তর পারাবারে। ঘুড়ি উড়বে কি করে আকাশে, কেউ যদি না ধরে লাটাই ?

খুলে যায় বন্ধদ্বার! অন্ধচোখে এসে পড়ে আলো! পথ আর কতদূর!

সেবারে আলেয়াকে মনে করেছিলো আলো; এবারে আবার আলো-কে সন্দেহ হয় আলেয়া বলে। সুদূর মানস-সরোবরে পেয়েছেন তাঁর ধ্যানের ধন, গুরুকে। স্মরণ করলেই, শরণ নিলেই তিনি এসে পড়েন। কারণ 'যোগক্ষেম বহাম্যহং'—কেবল জগদগুরুর কথাই নয়; জগতের সমস্ত সৎ গুরুর কথাও তাই। গুরু-র উদয়েও সন্দেহের উদয় যায় না অস্ত! জিজ্ঞেস করেন বিজয়কৃষ্ণ! অনিমা, লঘিমা, শাস্ত্রোক্তি সত্য ?

শিষ্যের হাত ধরে গুরু নিয়ে যান সন্দেহের অতীত লোকে। বিজয়কৃষ্ণের সত্তলব্ধ গুরু মানসসরোবরের পরমহংসজী তাঁকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন পাহাড়-পার দুর্গম অরণ্যে পড়ে থাকা, একটি মৃতদেহ; সূক্ষ্মস্বত্বায় প্রবেশ করলেন বিজয়কৃষ্ণের গুরু সেই মৃতদেহে। সংগে সংগে নড়ে উঠলো অনড়; মৃতদেহ-হলো 'অমৃত'-দেহ আবার। বিজয়কৃষ্ণ কেন সন্দেহ করেছিলেন নিঃসন্দেহকে কে জানে! কারণ বিজয়কৃষ্ণের নিজের ক্ষেত্রেই এর চেয়ে অনেক, অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেছে; আবার অনেক ঘটনা-অঘটনের নায়ক স্বয়ং বিজয়কৃষ্ণেরই হবার পরমসৌভাগ্য হয়েছে।

বিজয়কৃষ্ণ সেদিন ঢাকায়; শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে। ঈশ্বরধ্যান-নিমগ্ন বিজয়কৃষ্ণের সামনে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন দক্ষিণেশ্বরের সাধক। বিজয়কৃষ্ণ তখনও সন্দেহ করছেন। স্বপ্ন দেখছেন না তো। সন্দেহ নিরসনের জন্যে রামকৃষ্ণ মূর্তিকে স্পর্শ করলেন বিজয়কৃষ্ণ; টিপে টিপে দেখলেন। না সন্দেহের নেই; রামকৃষ্ণ-দেহেরই উপস্থিতি ঘটেছে সেখানে।

কিন্তু এই একবার কি জীবনে কতবার? বারবার অঘটন ঘটন পটিয়সীর লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন; মরদেহে অমরদেহীর লীলা।

নিজেও ঘটিয়েছেন কতবার অঘটন; বাঁচিয়েছেন শিষ্যকে কত দুর্ঘটনের দুরন্ত বিপদ থেকে। যখন সাধনা করতে করতে সিদ্ধ হয়ে গেছেন প্রভুপাদ। যিনি না কি গুরুতে বিশ্বাস করতেন না একদা, সেই তিনি যখন নিজেই দীক্ষা দিচ্ছেন গুরু-চালিত হয়ে, তখন একদিন বিজয়কৃষ্ণের এক শিষ্য,—মহেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর নাম বিজয়-নির্দেশেই কলকাতায় যান। সারাদিন রৌদ্ররুক্ষ রাজপথে ভ্রমণরত ক্লান্ত ক্ষুধিত শিষ্যের সম্বল চারটি পয়সা। দুধ কিনে খাবেন পয়সা দিয়ে,—এমন সময় প্রার্থী এসে হাত পাতে। চারটি পয়সা, শেষ সম্বল তুলে দেন তাঁর হাতে।

ঢাকায় ফেরা মাত্র বিজয়-গুরু বলেন মহেন্দ্রনাথকে : দুধখাবার পয়সা চারটি প্রার্থী সাধুকে দিয়েছেন বলেই মহেন্দ্রনাথ বেঁচে গেলেন; কারণ যে দুধ তিনি খেতে যাচ্ছিলেন, সে দুধ তাঁর মৃত্যু পীড়ার বীজ বহন করছিলো!

মহেন্দ্রনাথ বুঝলেন এসাধু কোন সাধুর নির্দেশে সেদিন হাত পেতেছিলো তাঁর কাছে! হাত পাতেনি সেই সাধু। স্বয়ং শ্রীগুরু বিজয়কৃষ্ণ বুক পেতে দিয়েছিলেন বহুদূরে থেকেও মৃত্যুদূতের পথরোধ করতে। মৃত্যু দূত ফিরে গিয়েছিলো ভগবানের দূতকে দেখে।

এহ বাহ্য! আরও কতবার! সতীশ কাঁপছেন কামভাবে। যৌবনের নানা রঙের দিনে কামনার রঙীনপাখা তাঁর পুড়েছে কতবার রূপের আগুণে; তারপর অপরূপের অনলে শোধন করছেন তাঁকে সদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণ কেমন করে সে ঘটনা লেখা যায়। কিন্তু উপলব্ধি করা যায় না। সাধনায় অনেকদূর অগ্রসর হয়েও দেহ-বাসনায় অস্থির হয় সতীশ। রমনীয়ের ধ্যানচিন্তার আসনে আসে রমণের কালচিন্তা; উত্তেজনায় উঠে পড়েন সতীশ। অভিমানে প্রতিজ্ঞা করেন : 'আর সাধন করিব না, গোঁসাইয়ের কাছেও আর যাইব না।' সংগে সংগে নদীর অভিমানের উত্তরে উড্ডীন হয় সমুদ্রের সুনীল উত্তরীয়। হতাশার চরম মুহূর্তেই তো আশার আশ্চর্য আলো আকাশে জাগে। দ্রৌপদী যতক্ষণ কাপড়ের খুঁট চেপে ধরে আছে

ততক্ষণ নয় ; যখনই কাপড় ছেড়ে হাত তুলে দিয়েছে ওপরে, 'হা কৃষ্ণ' বলে, তখনই তো লজ্জা নিবারণ করতে বস্ত্রহরণ করেছিলো যে গোপীদের করেছিলো লজ্জাহরণ, সে আসে এবার বস্ত্রবিতরণ করতে। রামকৃষ্ণ যখন রামপ্রসাদ যাঁর দেখা পেয়েছিলেন দেখা না পেয়ে তুলে নেন খড়্গ,—মরবেন বলে, তখনই তো জগদম্বা ধরবেন সেই আত্মহত্যার উদ্যত হাতকে। 'আত্ম'-হত্যা থেকে 'আত্ম'-জ্ঞানে। যাঁকে খুঁজছো তুমি, 'তুমি'-ই 'সে'-ই, সাধনের রাস্তায় এসেই কেউ একথা বলতে পারে না। পুঁথিতে নয়, শাস্ত্রে নয়, প্রণামে নয়, প্রাণায়ামে নয়, ; রাগের উত্তর আসে অনুরাগে ! মাকে সে কাঁদায়, —বলে, হয় তোমাকে পাব নয় তো মাকে-ই দেব প্রাণ। চলতে চলতে, নদীর নৃত্য যখন থেমে আসে, পাথরের বুক চিরে রৌদ্ররুক্ষ মাটির বুক ধনধান্যে ভরে দিয়ে, তলিয়ে দিয়ে বসুন্ধরা, অতল থেকে তুলে এনে নতুন জনপদ, তারওপরে যখন ক্লান্ত নদী বলে না আর, চলে না আর অনংগ চরণ তার, তখনই সিন্ধুর ডাক আসে দুয়ার হতে অদূরে !

সতীশ যেই প্রতিজ্ঞা করেন, গোঁসায়ের কাছেও আর যাবেন না তিনি, তখনই গোঁসাই-এর ভংগ হয় কঠোরতর প্রতিজ্ঞা। সতীশ কাছে আসতেই বলেন : সতীশ, আমার মাথায় একটু তেল ঘষে দাও ; সতীশের অন্তর বাহির পুড়ে যাচ্ছে আগুণে, আর গোঁসাই চাইছেন স্নিগ্ধ হতে। সন্দিগ্ধ সতীশ নিঃসন্দিগ্ধ স্বরে বলেন : না ; পারব না। হাসেন বিজয়কৃষ্ণ। সেই হাসি,—বারবার সে হাসি হাসেন ভগবানের দূতেরা ; 'পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে, সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে' ! সে হাসি বলে : পারব না বললে, আমি পারব কেন ?

তেল দেয় মাথায় গোঁসায়ের অনুরোধে, একান্ত অনিচ্ছায় সতীশ। আর সংগে সংগে চোখের সামনে আবির্ভূত হয়, যাদের পাবার ইচ্ছায় কামোন্মত্ত হয়েছিলেন সতীশ সেই রূপসীর দল। তারা উলংগ কামের স্থূল মূর্তি ধরে এসে দাঁড়ায় সতীশের সামনে।

না। দাঁড়াল না। চলে যায় পাশ কাটিয়ে একের পর এক। সব তেল শুষে নিলে বিজয়কৃষ্ণের মস্তক, তিনি বলেন ঃ তাহলে যাও।

তেল নয় খেল। সতীশের কাম শুষে নিলেন বিজয়কৃষ্ণ। গণ্ডুষে শুষে নিলেন কামনার সিন্ধু। এই খেল রাম এবং কৃষ্ণ থেকে সুরু করে রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণ এসেও সারা হয়নি। কাশী, কাঞ্চী, কোথায় এই খেলা আজও নয় অব্যাহত! [শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ ঃ খণ্ড ১ ঃ পৃঃ ১১৯-১২০]

রামকৃষ্ণও বলেছিলেন, কামের মুখ ঘুরিয়ে দে; কামে দেখ 'মা'-কে!

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কেবল মানুষের মধ্যে অলৌকিক লীলা দেখেননি। স্থানের মধ্যেও দেখেছিলেন; দেখিয়েছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন বটগাছ। বৃন্দাবনের নিত্যলীলার সাক্ষী সেই বৃক্ষ; লীলাসংগী সে। সেই বৃক্ষমাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ বলছেন, রাধাবাগে একটি গাছের নীচে একদিন বসে আছি; এমন সময় অদ্ভুত শব্দে আকৃষ্ট হয়ে দেখি, গাছ নয় ভক্ত বৈষ্ণব দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, তিনি বৃক্ষরূপে আছেন এখানে অনেককাল।

কেবল বৃক্ষের মধ্যে বোধিকে নয়। কৃষ্ণের জীবের মধ্যে কৃষ্ণকে দেখেছিলেন শ্রীবিজয়কৃষ্ণ।

শান্তিপুরের সন্নিকট বাকলা। সেইখানে সংকীর্তনে বেরিয়েছেন বিজয়কৃষ্ণ; সংগে চলেছে গৃহপালিত কুকুর, কেলে। ধর্ম স্বয়ং চলেছেন ধর্মসংকীর্তনে। ধর্মরাজ ছিলেন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের শেষ যাত্রার সঙ্গী। গোঁসাইজীর ধর্মসংকীর্তন-যাত্রায় সংগী হলেন ভক্তরাজ কেলে। একজায়গায় এসে কেলে মাটি আঁচড়ায় কেবলি। গোস্বামী প্রভু সে জায়গায় তৎক্ষণাৎ খোঁড়ালেন। এবং মাটির অন্ধকার গর্ভ থেকে উঠে এলো শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নামযুক্ত খড়ম। খড়ম মাথায় করে বিজয়কৃষ্ণ আবার সংকীর্তনমত্ত হলেন। সংকীর্তন শেষে দেখা গেল ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ জ্ঞানহারা; কুকুর কেলেও নিঃস্পন্দ। ভক্তের কাণে

ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে করতে প্রভুপাদ বললেন : তোমার কাজ শেষ ! এবার অশেষকে লাভ কর ; গঙ্গা লাভ কর তুমি।

পরেরদিন সকালে দেখা গেল ভক্তরাজ কেলে গংগার কোলে ভাসছেন ; ঠিক যখন সংশয়ের তিমির অন্ধকার সাঁতরে, পূর্বদিগন্তে অপূর্ব আলোয় উদ্ভাসিত করে উঠে আসছেন জবাকুসুমসংকাশ মহাদ্যুতি দিবাকর।

বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্ম না হিন্দু, বিজয়কৃষ্ণ রামকৃষ্ণের কাছে নত হয়ে ছিলেন, না, রামকৃষ্ণের চেয়ে তিনি বড়,—এই অসার অন্তঃসারশূন্য বাক্-বিতণ্ডায় যারা বাদ প্রতিবাদের কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের ভূমিকায় অবতীর্ণ তাদের ধিক। এর চেয়ে অধিক অসম্মান রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণের করা অসম্ভব ! আলো এবং বাতাস, কে বলবে এর মধ্যে কে বড় ? আকাশ আর মাটি, কে বলবে এর মধ্যে কাকে নাহলে অচল, বসুন্ধরা-জননী সিন্ধু আর বসুন্ধরার প্রহরী আকাশস্পর্শী পর্বত, কে বলবে কার কাছে আছে অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্তর। ব্রাহ্ম আর হিন্দু, মুসলমান আর খ্রীশ্চান তো নদীর নাম মাত্র ; গংগা আর যমুনা, সিন্ধু আর টেম্‌স ! উত্তরন তো সকলেরই সেই মহাসাগরে,— যেখানে পাবার পাথেয় হোক যত আলাদা। সিন্ধু থেকে উৎসারিত সিন্ধুগামী কেউ গেছে সোজা, কেউ বেঁকা, কেউ মরুভূমি বুঁজিয়ে, কেউ চড়াই উজিয়ে। সিন্ধুতে গিয়ে শেষ হয়েছে যাত্রা। সুরুতে আর সারাতে বিজয়কৃষ্ণ আর রামকৃষ্ণে কোনও তফাৎ নেই। মাঝখানে কেউ দক্ষিণেশ্বরে বিলিয়েছেন নিজেকে, কেউ শান্তিপুরে টেনেছেন অন্যকে। যেখানে শেষ সেখানে রাম নেই ; বিজয় নেই ; আছেন কেবল কৃষ্ণ !

বিজয় আর রাম নয় ; বলো, জয় কৃষ্ণ ! জয় কৃষ্ণ !

মাটি আর পাথর। চুন আর সুরকি। বালি আর সিমেণ্ট। লোহা আর ইট দিয়ে গড়া,—এই যদি দেখো কাশীকে, তবে কাশীতে, একাশিতে মারা গেলেও শিবলোকে যাবে না ; যাবে 'শিবা' লোকে। জন্মাবে আবার ! আবার শেয়ালকুকুর কাঁদবে তোমার দুঃখে।

ইঁট আর কাঠ; কাজ করা কবাট,—কাশীর মাহাত্ম্য সেজন্যে নয়। কাশী যে কেবল আরেকটি প্রদেশ মাত্র নয়, বিপ্রদেশ, সে ওই শংকর আর তৈলংগের জন্যে; হরিশ্চন্দ্রের কারণে! ভারতাত্মা কাশী! ভারতবর্ষের এমন কোনও মহাত্মা নেই যাঁকে না যেতে হয়েছে কাশীতে! কারণ কাশী কেবল তীর্থক্ষেত্র নয়; জীবনযোগী তৈলংগ থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত, তাঁদের আগে এবং তাঁদের পরে, সকল মুক্তপুরুষের সতীর্থক্ষেত্র কাশী!

জুহুরী না হলে যদি জহর থেকে যায় অচেনা, তবে তীর্থের মহিমা বুঝবে কে, তীর্থংকর ছাড়া!

বৃন্দাবনের মাটিতে মাহাত্ম্যের সন্ধান না পেয়ে দুঃখিত একজন, ম্রিয়মান। গোস্বামী বললেনঃ কৃষ্ণ নাম করে গড়াগড়ি করুন ভূমিতে, একবার; তারপর দেখুন আপনার উপলব্ধি হয় কি না, যে এ মাটি, মাটি নয়; স্বয়ং 'মা'-টিই এ মাটি। প্রভুপাদের কথায় লুটিয়ে পড়েন বিশ্বাসী ব্রজভূমে! চোখে আসে জল; বুকে থামে বন্ধুর রথ! ভূমি যে ভূমা,—এবিশ্বাস সনাতন, সৃষ্টির ঊষাকালে উদ্ভূত ভারতের; আর ভারতীয় সাধকের।

প্রাচীন ভারত বলেছে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মধু ক্ষরিত হচ্ছে আকাশে, বাতাসে, আলোয়, অন্ধকারে। শুধু পৃথিবীতে ধুলি, তৃণ, বৃক্ষ, সমুদ্র নয় মধুময়, নবীন ভারতের সাধকের দিব্যতনু দিয়েও সেই মধু ক্ষরণ, সেই মধুর ক্ষরণ ঘটেছে ভাগ্যবানদের চোখের সামনে। বিজয়কৃষ্ণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিচ্ছেন কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। বলেছেন, মধুলোভী মৌমাছির দল ঠাকুরের দিব্যদেহকানন জুড়ে গুণগুণ করছে, অলস অপরাহ্ণ বেলায়। পিঠ মুছিয়ে দিতে দিতে বিস্মিত বিস্ফারিতদৃষ্টি কুলদানন্দের স্বীকৃতিঃ 'মানুষের শরীরে ঘর্মাকারে মধু বাহির হয়—কোথাও শুনি নাই, কোনও পুস্তকে পড়ি নাই।'

'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো'! বিষয় চিন্তায় লোভ, লালসা, স্বার্থে কুটিল, তর্কে জটিল ধরণী যখন মরুভূমির

মতো ধূ-ধূ-ময়, তখন এসো, রাম আর কৃষ্ণ! রামকৃষ্ণ আর বিজয়কৃষ্ণ !,—তোমরা যারা মধুময় !

কিন্তু অন্তরের সুধায় যাঁরা বসুধায় দেন ভরে, তাঁরা নিজেরা পান করেন গরল। হিন্দুর যিনি দেবাদিদেব,—তিনি অমৃত বিলোন ; পান করেন বিষ। যাঁর ঘরণী অন্নপূর্ণা ; অন্নভিক্ষা করেন তিনি। মুহূর্তে যিনি ইন্দ্র, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য, চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারেন, তিনি বাস করেন শ্মশানে। যাঁর কণ্ঠে মাল্য দিয়েছেন উমা, তাঁর গলায় জড়িয়ে আছে সাপ ; আর সাপের বিষে কণ্ঠ হয়েছে নীল। জীবন্ত শঙ্কর ভাষ্য হচ্ছে এই ভারতবর্ষ। এই ভাষ্য, যে বুঝতে পারেনি, শঙ্করের ভাষার গ্রহণ করতে পারেনি মর্ম সে বোঝেনি শঙ্কর ক্ষেত্র কাশীকে। যিনি বুঝেছেন, তিনি, কেবল তিনিই বলতে পেরেছেন, যে ভোলানাথ প্রতিদিনের তুচ্ছ সুখের কাঙাল নন ; প্রত্যহের অতীত আনন্দের অধিকারী। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য সবাই ব্যস্ত সিংহাসন রক্ষায়। স্বর্গ, মর্তলোকে কেউ সাধনায় বসলেই তাই কাঁপতে থাকে ইন্দ্রের বুক : যদি টলে যায় ইন্দ্রের আসন! তাই আসে অপ্সরী লোভের বেশে ; ভয়ের ছদ্মবেশে দেখা দেয় মার! যাতে,—সাধনায় বিঘ্ন ঘটে ; নিরাপদে থাকে ইন্দ্রের আসন। কিন্তু সব দেবের মধ্যে যিনি আদি দেব, তাঁকে দেখো একবার। তাঁকে ডাকো একবার বেলপাতা মাথায় দিয়ে বলো : যার মাথায় হাত দেব, তার মাথা তখনই চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে,—আশীর্বাদ দাও এই !

সংগে সংগে মঞ্জুর করেছেন তোমার প্রার্থনা আশুতোষ। খেয়াল নেই যে এই অসুরহস্তস্পর্শে জটাজালজড়িত ধূর্জটিমস্তকও ধূলিসাৎ হবে মুহূর্তে ; কারণ এহাত তাঁর বরে বরীয়ান !

ইনিই সেই কাল্ যাঁর মন্দিরা দুহাতে বাজে। ফুলে বাজে কাঁটায় বাজে, সুখে বাজে, দুখে বাজে। আলোছায়ার জোয়ার-ভাটায় সকাল সাজে ভালোয়মন্দে আশায় শঙ্কায় বাজে তাঁর ডমরু। কাশী সেই মহাকালের আবাসস্থল সেখানে ষণ্ড, পাষণ্ড, ভণ্ডের

সঙ্গে আছেন এমন সাধু যিনি চোখের পলক পড়বার আগে লণ্ডভণ্ড করতে পারেন সৃষ্টি। সতীর সংগে পতিতা, জন্ম হবে না যার তার সংগে জন্মের ঠিক নেই যার, সে, এই কাশীর গলিতে আছে গলাগলি করে কোন্ অনাদিকাল থেকে তা জানেন ওই দেবাদিদেব কাল! কাশী কেবল শঙ্করভূমি নয়; শঙ্কর ভূমিও বটে!

কেবল শঙ্কর নন, শঙ্করভূমি এই ভারতে এসেছেন যাঁরা ভগবানের দূত, তাঁরাও গ্রহণ করেছেন গরল; বিলিয়েছেন অমৃত। কেবল এদেশে নয়! কোনদেশে নয়? যীশু রক্তাক্ত হয়েছেন তাদের হতেই যাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন: Forgive them! সক্রেতিশ বিষপাত্র গলাধঃকরণ করতে করতে বলেছেন: যাদের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ, আমাকে হত্যা করাই তাদের যুক্তিযুক্ত! অতএব এ আমার পুরস্কার। রামকৃষ্ণর গলায় যদি ক্যান্সার না হয় তাহলে আমাদের ক্ষত নিরাময় হবে কেন? সার-বস্তু বিলোতে পারেন তিনিই, ক্যান্সার যার দেহকে মৃত করে; বসুন্ধরাকে করে অমৃত!

রাম আর কৃষ্ণ! রামকৃষ্ণ আর বিজয়কৃষ্ণ সকলেই হাস্যমুখে অদৃষ্টের পরিহাস করেন বারবার! জগন্নাথক্ষেত্রে ঘনিয়ে আসে জীবনের সন্ধ্যা বিজকৃষ্ণের। সেই বিজয়কৃষ্ণ যাঁকে হনুমানের মতো বুক চিরে দেখাতে হয়নি ইষ্টদেবতাকে। ইষ্টদেবতা যাঁর বুকের ওপরেই হয়েছেন আবির্ভূত। পুরীর সমুদ্রতীরে যেতে অসমর্থ বিজয়কৃষ্ণ বসে থাকেন ঘরে; বাইরে থেকে লোক ঘরে এসে দেখে,—বিজয়কৃষ্ণের জটা দিয়ে জল ঝরছে সমুদ্রের!

[বিজয়]-কৃষ্ণের ডাকে যদি সিন্ধু ঘরে না আসে তাহলে কৃষ্ণের নাম হবে কেন কৃপাসিন্ধু?

এই পুরীতেই, জগন্নাথক্ষেত্রেই, জগতের যত অনাথের উদ্ধারকল্পে, কৃষ্ণের কথা: সম্ভবামি যুগে যুগে';—রাখতে এসেছিলেন যে বিজয়কৃষ্ণ, তাঁকে ঈর্ষ্যাতুর সত্য-ভীত কাপুরুষরা তুলে দেয়, বিষ-মিশ্রিত প্রসাদী নাড়ু। অন্তর্যামী বিজয়কৃষ্ণ, হেসে, ভালোবেসে মুখে তুলে দেন সেই গরল। গরল নয়; প্রসাদ! মুখে তুলে নেন

সেই প্রসাদ সকলের সম্মুখে বিজয়কৃষ্ণ! ইষ্ট যাঁর সহায় তাঁর দেহের অনিষ্ট করতে পারে বিষ; কিন্তু তাঁর অমৃত বিনষ্ট করে কে?

সকালবেলার ভৈরবী যেমন, সন্ধ্যাবেলার এই পুরবীও তেমনি সুরভিতে ভরে দেয় জীবনের অশেষ সন্ধ্যাকে।

রাম যান; আসেন কৃষ্ণ! রাম-কৃষ্ণ দুই যান; আসেন রাম-কৃষ্ণ! রামকৃষ্ণ যান; আসেন বিজয়কৃষ্ণ। বিজয়কৃষ্ণ যান; কিন্তু-কৃষ্ণ-বিজয় আজও অব্যাহত এই ভারতভূমিতে! কারণ বিজয়কৃষ্ণের মুখে কৃষ্ণের কথাই পুনরুক্তি: সম্ভবামি যুগে যুগে!

॥ ইতি বার্দ্ধক্যে বারাণসী, প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥

